ফ্রান্‌জ্‌ হাল্‌স্‌ : মাল্‌ বাব্‌ বা হার্লেমের ডাইনি

ব্রাণ্ট : সিংহ

রেমব্রাণ্ট : জ্যুইশ নবপরিণীতা

রেমব্রাণ্ট : দা স্টালমীস্টাস

রেমব্রাণ্ট : রাতের পাহারা

অশোক মিত্র
পশ্চিম ইওরোপের
চিত্রকলা

ডিউরর : শিশুখৃষ্টকে সেণ্ট ক্রীস্টোফর নিয়ে যাচ্ছেন (এচিং)

ডিউরর : দুটি কাঠবেড়ালী

ডিউরর : নিজের ছবি

পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা

অশোক মিত্র

স্বাক্ষর

১১।বি, চৌরঙ্গি টেরেস, কলকাতা—২০

হান্‌স্‌ হোলবাইন : জর্জ গীজ

প্রকাশক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
স্বাক্ষর লিঃ, ১১-বি, চৌরঙ্গি টেরেস, কলকাতা—২০

মুদ্রাকর : (ক) ছবির ফর্মা—ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার,
কলকাতা—১৩
(খ) লেখার ফর্মা—নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বপ্না প্রেস লিঃ, ৮।১, লালবাজার স্ট্রীট,
কলকাতা—১

ব্লক : হীরালাল সেন, স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোঃ
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা।

বাধাই : ওরিএন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস,
১০০, বৈঠকখানা রোড্, কলকাতা—৯

দাম চার টাকা

ভের্মেয়ার : ভর্জিনালের পাশে দাঁড়ানো মহিলা

আমার মেয়ে জয়ন্তীর জন্যে

এল্ গ্রেকো : লাওকুন

ভূমিকা

যে সব বই, অ্যাল্‌বাম আর প্রকাশকের কাছে এই সামান্য বইটি লেখার জন্যে আমি ঋণী তাদের পুরো তালিকা আমার পক্ষে এখানে দেয়া সম্ভব নয়, দিলেও অবান্তর হবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেগুলি পড়া আর দেখা ছিলো বলে আমি দুটি ছোট বই থেকে সবচেয়ে বেশী নিতে পেরেছি; একটি হচ্ছে ভি-এম-হিলিয়ার আর ই-জি-হুয়ের লেখা 'এ চাইল্ড্‌স্‌ হিস্টরি অভ্‌ আর্ট' আর অন্যটি টমাস ক্রেভ্‌নের লেখা 'দা স্টোরি অভ্‌ পেন্টিং'। প্রথম বইটির থেকে আমি অনেক সাহায্য নিয়েছি, তাও ভাল করে নিতে পারিনি ব'লে লজ্জিত

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বারবার না বললে লেখা হতো না, তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীমতী আভা মিত্র, শ্রীসমর সেন, শ্রীমতী মায়া সরকার ধৈর্য ধরে পাণ্ডুলিপি পড়ে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমি ঋণী। যে সব ত্রুটি এখনো থেকে গেলো তার জন্যে আমি দায়ী। লিখতে লিখতে কোন ছবি দেখে আসা যায় না, এ কম বড় আক্ষেপের কথা নয়। প্রুফ সংশোধনের জন্যে শ্রীঅশোক ঘোষকে ধন্যবাদ জানাই।

স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলার সাধারণ পরিচয় ও শিক্ষার জন্যে বইটি লেখা।

কলকাতা — অশোক মিত্র

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৫৫

ভেলাস্কেথ : মেড্‌স্‌ অভ অনার
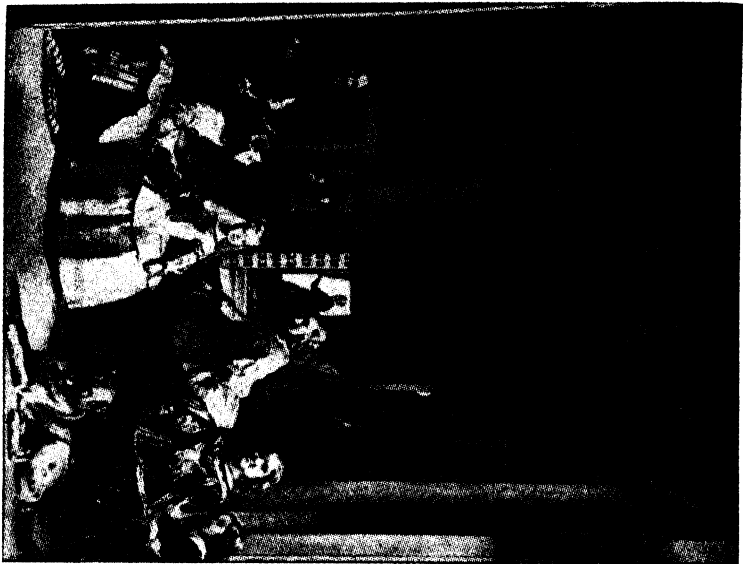
ভেলাস্কেথ : একটি বামন

সূচী

প্রথম অধ্যায় ॥ আদি যুগ

সবচেয়ে পুরানো ছবি ১
ছবিটাতে কি ভুল আছে বলো তো? ৪
রাজবাড়ীতে ধাঁধাঁর ছবি ৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ গ্রীক চিত্রকলা

বোকাবানানো ছবি ১৩
ঘড়া, গাড়ু, কলসী ১৭

তৃতীয় অধ্যায় ॥ প্রথম যুগের খৃষ্টিয়ান ছবি

যীশুখৃষ্ট ও তাঁর অনুচরদের ছবি ২০

চতুর্থ অধ্যায় ॥ রেনেসাঁসের আগের যুগ

রাখাল শিল্পী ২৩
দেবদূতের মত ভাই ২৭

পঞ্চম অধ্যায় ॥ ছোট রেনেসাঁস

আবার জন্মানো শিল্পীরা ৩১

ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ বড় রেনেসাঁস

পাপ আর প্রচার ৩৫
উত্তম গুরু আর তাঁর 'শ্রেষ্ঠ' ছাত্র ৪০
যিনি আসলে ভাস্কর ছিলেন, অথচ বিরাট চিত্রশিল্পীও ছিলেন ... ৪৩
লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি ৪৭
ভেনিসের ছয়জন শিল্পী ৫৩
একদর্জির ছেলে আর এক আলোর রাজা ৫৮

মুরীল্লো : তরমুজ খাওয়া

সপ্তম অধ্যায় ॥ রনেসাঁস যুগে ইওরোপের অন্যদেশের শিল্পীরা

ফ্লেমিং ... ১২১
দুজন ডাচ্ শিল্পী ... ১২৭
দুজন জার্মান শিল্পী ১৩২
ভুলে যাওয়া, ফের ফিরে পাওয়া ১৩৭
স্পেনের শিল্পীদের কথা ১৪০

অষ্টম অধ্যায় ॥ রনেসাঁসের পরে দু'শ বছর

ফরাসী শিল্পী ১৪৭
দেরীতে শুরু ১৫৫
আরও তিনজন ইংরেজ শিল্পী ... ১৬০

নবম অধ্যায় ॥ উনিশ শতকের শিল্পীরা

কয়েকজন অতি-গরীব শিল্পী ... ১৬৫
সর্বপ্রধান লোক ১৭০
ইম্‌প্রেশনিজ্‌মের পরে : পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্ ১৭৬

দশম অধ্যায় ॥ বিশ শতকের শিল্পীরা

কিউবিজ্‌ম্ ১৮৩

প্রধান প্রধান ইওরোপীয় শিল্পীদের জন্মমৃত্যুর তারিখ ১৯৩
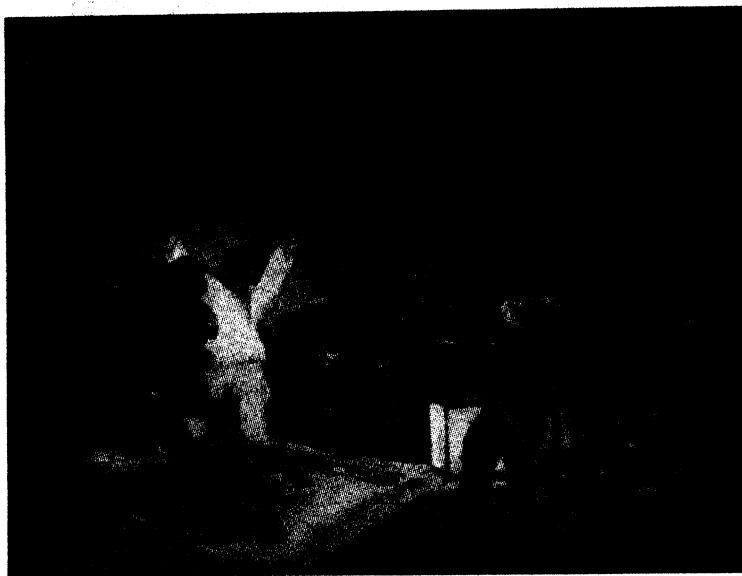
গোইয়া : মাদ্রিদে ১৮০৮ সালের ৩রা মে বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড বহাল

গোইয়া : বরফের ঝড়

প্রথম অধ্যায়

আদি যুগ

সবচেয়ে পুরানো ছবি

এমন কোন ছেলে বা মেয়ে নেই যে জীবনে কোনদিন ছবি আঁকেনি। তুমি আঁকোনি? নিশ্চয় এঁকেছো, হয় ঘোড়া না হয় বাড়ী, না হয় জাহাজ বা মোটরগাড়ী, কুকুর কিংবা বেড়াল। হয়তো কুকুরটা দেখে লোকে মনে করেছে বক কিংবা বকচ্ছপ। কিন্তু এও মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর অসাধ্য।

এমন কি, বহুযুগ আগে মানুষ যখন বন্য ছিলো, যখন তার না ছিলো বাড়ী, যখন প্রায় বুনো পশুর মতই থাকতো, গায়ে ছিলো লম্বা লম্বা লোম, আশ্রয় নিতো পাহাড়ের গুহায়, তখনও মানুষ আঁকতো। তখন না ছিলো কাগজ, না ছিলো পেন্সিল। আঁকতো গুহার গায়ে। ছবিগুলি ফ্রেম করাও হতো না, দেয়ালে ঘটা করে টাঙানোও হতো না, স্রেফ গুহার ভিতরের গায়ে মানুষ ছবি আঁকতো, ভিতরকার ছাদেও আঁকতো।

ওরই মধ্যে কখনও ছবিগুলি দেয়ালে কয়েকটি আঁচড় ছাড়া কিছু হতো না। কখনও হয়তো খোদাই করা হতো, তার পরে হয়তো রঙ দিয়ে দিতো। তখনকার রঙ মানে রঙীন মাটিতে চর্বি মেশানো, রঙ সাধারণত হতো লাল না হয় হলদে, যেমন আমাদের চীনে সিঁদুর আর মেটে সিঁদুর। কখনও রক্তই হতো রঙ, প্রথমে লাল, তার পরে হয়ে যেতো কালো। কোন কোনটা দেখে মনে হয় যেন পোড়া কাঠের ডগা দিয়ে, অর্থাৎ চেলা কাঠের মুখের কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা। অনেক সময়ে হাড়ে ছবি খোদাই করতো—হরিণের শিঙে অথবা হাতীর দাঁতে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কাঠকয়লার কালি আর মাটির লাল দিয়ে আঁকা ছবিতে রঙ এমনভাবে পড়তো যে ছবিতে এক অদ্ভুত গভীরত্ব আসতো, এমন কি, পরে যাকে বলবো পর্স্পেক্টিভ, তাও আসতো।

ক্লোদ লরেন : প্রাকৃতিক দৃশ্য, সমুখে গাছ

আর বইএর শেষের দিকে যাকে বলবো আধুনিক যুগের জ্যামিতিক চিত্র তারও হদিস গুহাচিত্রে পাওয়া যায়।

এইসব গুহার লোকেরা কিসের ছবি আঁকতো বলো তো? ধরো তোমাকে যদি আমি বলি, যা হয় একটা কিছু আঁকো, যা তোমার খুসী। এখনই একবার চেষ্টা করে দেখো দেখি কি আঁকলে? আমার মনে হয় এই পাঁচটার মধ্যে একটা না একটা নিশ্চয়ই আঁকবে। হয় একটা বেড়াল, না হয় একটা পাল্‌তোলা নৌকো, বা গাড়ী, না হয় একটা বাড়ী, না হয় একটা গাছ বা ফুল, সবশেষে হয়তো একটা মানুষ। না কি এসব কিছুই নয়, অন্য কিছু?

গুহার মানুষরা কিন্তু শুধু এক ধরণের ছবিই এঁকে গেছে। আর তা মানুষও নয়, গাছপালা, ফুলফল, প্রাকৃতিক দৃশ্যও নয়। তারা এঁকে গেছে শুধু জন্তুজানোয়ার। বলো তো কি ধরণের জন্তুজানোয়ার? কুকুর? না, কুকুর নয়। তবে ঘোড়া? না, ঘোড়াও নয়। তাহলে সিংহ? না, সিংহও নয়। তারা এঁকেছে প্রায় সবই অদ্ভুত, অতিকায় জন্তু। কিন্তু আঁকতো ভাল, ছবি থেকে বোঝা যেতো জন্তুগুলি কিরকম দেখতে ছিলো। ধরো যেমন নিচের এই প্রথম ছবিটা, হাজার হাজার বছর আগে একটা গুহায় আঁকা।

ওয়াতো : একটি নিগ্রো মাথার তিনটি ছবি
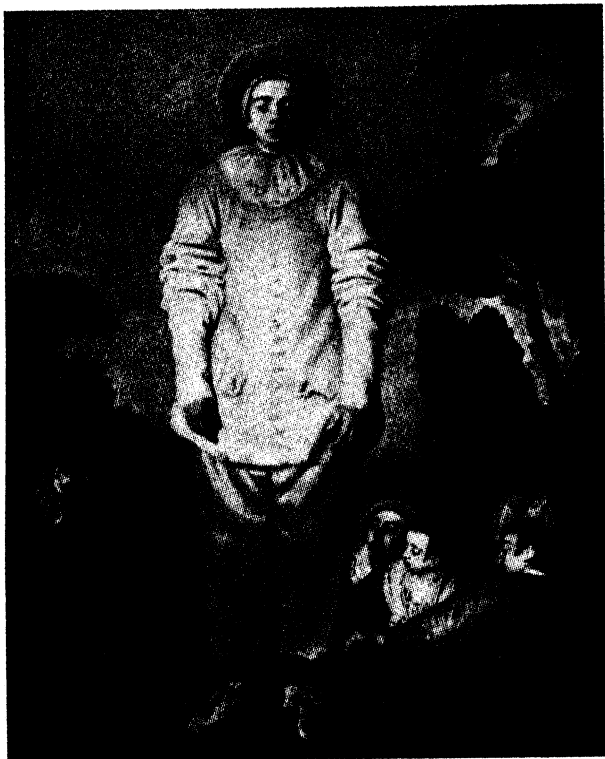
ওয়াতো : একজন নট

দেখেই বোঝা যায় একটা বড় জন্তু, বকও নয় বকচ্ছপও নয়। এ এমন কোন জন্তু যা সে যুগে ছিলো নিশ্চয়। দেখতে খানিকটা হাতীর মত। হাতীই বটে, কিন্তু অতিকায় হাতী। তার কানগুলো এখনকার হাতীর মত বড় নয়, গায়েও মস্ত মস্ত লোম হতো। এখনকার হাতীর গায়ে লোম নেই বললেই হয়। এ ধরণের জন্তুকে আমরা বলি ম্যামথ। তাদের লম্বা লম্বা লোম ছিলো কারণ সেযুগে দেশটা ছিলো আরও ঠাণ্ডা, লোমের দরকার হতো। আর তারা আমাদের হাতীর চেয়ে অনেক, অনেক বড় হতো।

এখন আর জ্যান্ত ম্যামথ পাওয়া যায় না, কিন্তু মানুষ মরা ম্যামথের হাড়গোড় খুঁজে বার করে, জোড়াতাড়া দিয়ে তার কঙ্কাল খাড়া করেছে। সত্যিই অতিকায় কঙ্কাল বটে। কোন কিছু বিরাট হলেই আমরা বলি, ম্যামথ। পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা দেবেন, দশ লাখ লোক ময়দানে জমলে, খবরের কাগজে লেখে 'ম্যামথ' ভীড়।

গুহার মানুষরা ম্যামথ ছাড়াও অন্যান্য জীবজন্তু আঁকতো। যেমন আঁকতো বাইসন্। বাইসন্ জানো বোধ হয়, বড় বুনো মোষের মত। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিংএ পাওয়া যায়। দেখতে রাগী মোষের মত। একটি ছোট্ট মেয়ে তার বাবার সঙ্গে স্পেনের একটা গুহায় বেড়াতে গিয়েছিলো। গুহার নাম 'আল্‌তামিরা'। বাবা গুহার মধ্যে তীরের ফলা খুঁজতে ব্যস্ত, মাটি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। মেঝেতে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছেন বাবা, আর মেয়ে চেয়ে আছে ছাতের দিকে কারণ মেঝেটা অন্ধকার, ভয় করছে, ছাতের দিকটা তবু আলো পড়েছে। ছাতে একদল ষাঁড়ের মত বাইসন্ আঁকা। হঠাৎ মেয়ে চীৎকার করে উঠলো 'বাবা, বাবা, ষাঁড়ের পাল'। বাবা মনে করলেন, সত্যিই বুঝি ষাঁড় ঢুকেছে, বললেন 'কোথায়, কোথায়'?

আরও জীবজন্তুর ছবি তারা আঁকতো, যেমন বল্গা হরিণ, মস্ত মস্ত শিংওলা হরিণ (আমরা বলি সাম্ভার), ভাল্লুক, নেকড়ে বাঘ।

অন্ধকার গুহার মধ্যে ছবি এঁকে যাওয়া শক্ত কাজ। ভেবে দেখো, কোন জানালা ছিলো না, আলো জ্বালাবার ভাল ব্যবস্থাও ছিলো না। বড় জোর ছিলো, প্রচুর-ধোঁয়া-ছাড়া একটি মশাল। তবে তারা ছবি আঁকতো কিসের ঝোঁকে, কিসের লোভে, কিসের তাড়ায়? নিশ্চয় ঘর সাজাবার লালসায় নয়? তুমি ঘর সাজাও, ছবি টাঙাও তার কারণ তোমার ঘর

শার্দাঁ : খাবার আগে প্রার্থনা

আর বইএর শেষের দিকে যাকে বলবো আধুনিক যুগের জ্যামিতিক চিত্র তারও হদিস গুহাচিত্রে পাওয়া যায়।

এইসব গুহার লোকেরা কিসের ছবি আঁকতো বলো তো? ধরো তোমাকে যদি আমি বলি, যা হয় একটা কিছু আঁকো, যা তোমার খুসী। এখনই একবার চেষ্টা করে দেখো দেখি কি আঁকলে? আমার মনে হয় এই পাঁচটার মধ্যে একটা না একটা নিশ্চয়ই আঁকবে। হয় একটা বেড়াল, না হয় একটা পালতোলা নৌকো, বা গাড়ী, না হয় একটা বাড়ী, না হয় একটা গাছ বা ফুল, সবশেষে হয়তো একটা মানুষ। না কি এসব কিছুই নয়, অন্য কিছু?

গুহার মানুষরা কিন্তু শুধু এক ধরণের ছবিই এঁকে গেছে। আর তা মানুষও নয়, গাছপালা, ফুলফল, প্রাকৃতিক দৃশ্যও নয়। তারা এঁকে গেছে শুধু জন্তুজানোয়ার। বলো তো কি ধরণের জন্তুজানোয়ার? কুকুর? না, কুকুর নয়। তবে ঘোড়া? না, ঘোড়াও নয়। তাহলে সিংহ? না, সিংহও নয়। তারা এঁকেছে প্রায় সবই অদ্ভুত, অতিকায় জন্তু। কিন্তু আঁকতো ভাল, ছবি থেকে বোঝা যেতো জন্তুগুলি কিরকম দেখতে ছিলো। ধরো যেমন নিচের এই প্রথম ছবিটা, হাজার হাজার বছর আগে একটা গুহায় আঁকা।

দাভিদ মাদাম রেকামিয়ে

দেখেই বোঝা যায় একটা বড় জন্তু, বকও নয় বকচ্ছপও নয়। এ এমন কোন জন্তু যা সে যুগে ছিলো নিশ্চয়। দেখতে খানিকটা হাতীর মত। হাতীই বটে, কিন্তু অতিকায় হাতী। তার কানগুলো এখনকার হাতীর মত বড় নয়, গায়েও মস্ত মস্ত লোম হতো। এখনকার হাতীর গায়ে লোম নেই বললেই হয়। এ ধরণের জন্তুকে আমরা বলি ম্যামথ। তাদের লম্বা লম্বা লোম ছিলো কারণ সেযুগে দেশটা ছিলো আরও ঠাণ্ডা, লোমের দরকার হতো। আর তারা আমাদের হাতীর চেয়ে অনেক, অনেক বড় হতো।

এখন আর জ্যান্ত ম্যামথ পাওয়া যায় না, কিন্তু মানুষ মরা ম্যামথের হাড়গোড় খুঁজে বার করে, জোড়াতাড়া দিয়ে তার কঙ্কাল খাড়া করেছে। সত্যিই অতিকায় কঙ্কাল বটে। কোন কিছু বিরাট হলেই আমরা বলি, ম্যামথ। পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা দেবেন, দশ লাখ লোক ময়দানে জমলে, খবরের কাগজে লেখে 'ম্যামথ' ভীড়।

গুহার মানুষরা ম্যামথ ছাড়াও অন্যান্য জীবজন্তু আঁকতো। যেমন আঁকতো বাইসন্। বাইসন্ জানো বোধ হয়, বড় বুনো মোষের মত। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিংএ পাওয়া যায়। দেখতে রাগী মোষের মত। একটি ছোট্ট মেয়ে তার বাবার সঙ্গে স্পেনের একটা গুহায় বেড়াতে গিয়েছিলো। গুহার নাম 'আল্‌তামিরা'। বাবা গুহার মধ্যে তীরের ফলা খুঁজতে ব্যস্ত, মাটি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। মেঝেতে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছেন বাবা, আর মেয়ে চেয়ে আছে ছাতের দিকে কারণ মেঝেটা অন্ধকার, ভয় করছে, ছাতের দিকটা তবু আলো পড়েছে। ছাতে একদল ষাঁড়ের মত বাইসন্ আঁকা। হঠাৎ মেয়ে চীৎকার করে উঠলো 'বাবা, বাবা, ষাঁড়ের পাল'। বাবা মনে করলেন, সত্যিই বুঝি ষাঁড় ঢুকেছে, বললেন 'কোথায়, কোথায়'?

আরও জীবজন্তুর ছবি তারা আঁকতো, যেমন বল্গা হরিণ, মস্ত মস্ত শিংওলা হরিণ (আমরা বলি সাম্ভার), ভাল্লুক, নেকড়ে বাঘ।

অন্ধকার গুহার মধ্যে ছবি এঁকে যাওয়া শক্ত কাজ। ভেবে দেখো, কোন জানালা ছিলো না, আলো জ্বালাবার ভাল ব্যবস্থাও ছিলো না। বড় জোর ছিলো, প্রচুর-ধোঁয়া-ছাড়া একটি মশাল। তবে তারা ছবি আঁকতো কিসের ঝোঁকে, কিসের লোভে, কিসের তাড়ায়? নিশ্চয় ঘর সাজাবার লালসায় নয়? তুমি ঘর সাজাও, ছবি টাঙাও তার কারণ তোমার ঘর

দেলাক্রোয়া : স্কিয়সের হত্যাকাণ্ড

বলে জিনিস আছে, তাতে আলো আসে। কিন্তু গুহায়? কুপকুপে অন্ধকারে? কেউ কেউ মনে করেন, এসব ছবি আঁকা হতো অদৃষ্টকে প্রসন্ন রাখতে, যেমন অনেকে ঘরের সমুখে 'শ্রী'র আল্পনা আঁকেন। কিংবা হয়তো গল্প এঁকে রাখা হতো, কি করে কোন জানোয়ার মেরেছে তারই ইতিবৃত্ত। কিংবা হয়তো, গুহার লোকরা নিছক আঁকার তাগিদেই আঁকতো, যেমন এখনও আঁকে ছেলেমেয়েরা, পেন্সিল হাতে পেলেই, এঁকে যায় পরের পাঁচিলে, নিজেদের বাড়ীর দেয়ালে, এমন কি স্কুলের ডেস্কে।

এই বন্য, লোমদাড়িওলা গুহার মানুষদের ছবি পৃথিবীতে সবচেয়ে পুরানো ছবি। যারা আঁকতো হাজার হাজার বছর আগে তারা মরে ভূত হয়ে গেছে। কিন্তু ছবি এখনও রয়েছে। এখন ভেবে দেখো তুমি কি করতে পারো, যা অত দিন বাঁচবে।

ছবিটাতে কি ভুল আছে বলো তো?

গুহার লোকেরা তো না হয় গুহার গায়ে আর ছাতে ছবি আঁকতো। কিন্তু মিশরদেশের লোকরা (ঈজিপ্‌শন্‌রা) তো আর গুহায় থাকতো না, তারা কোথায় ছবি আঁকতো বলো তো? ভাল কথা। মিশর দেশটা কোথায়? ঈজিপশন্ কাদের বলে?

ম্যাপের বই খোলো। আফ্রিকা মহাদেশ বার করো। আফ্রিকার উত্তরপূব কোণে প্রকাণ্ড নদী, নীল নদ। এই নীল নদের উৎপত্তিস্থানের কাছাকাছি দুটি শাখা আছে, একটি সাদা নীল, অন্যটি নীল নীল। ঘুরতে ঘুরতে নীল নদ কায়রো শহর পেরিয়ে ভূমধ্যসাগরে মোহানা করে পড়েছে। এই নীল নদের দুপাশের দেশকে বলে মিশর বা ঈজিপ্ট। পুরাকালেও বলতো, এখনও বলে। আর এই দেশের লোকদের নাম ঈজিপ্‌শন্।

ঈজিপ্‌শন্‌রা মাটির দেয়ালের বাড়ীতে থাকতো, যেমন বাংলাদেশের গ্রামে আমরা থাকি। কিন্তু তাদের মাটির বাড়ীগুলি অত ভাল হতো না, সাধারণ লোক গরীবও হতো খুব। বাড়ীতে তারা খুব কমই ছবি আঁকতো, যদি বা এঁকে থাকে সেরকম বাড়ী এখন একটাও নেই। নিজেদের বাড়ীতে ছবি এঁকে আলো করার উৎসাহ কতটুকু ছিলো জানি

হোগার্থ : গ্রেহাম পরিবারের ছেলেমেয়ে

না, কিন্তু আরেকটা ব্যাপারে তাদের উৎসাহ ছিলো প্রচুর, আর তারই জন্যে প্রাচীন ঈজিপ্‌শন্‌দের আঁকা ছবি আমরা এখনও দেখতে পাই। তাদের উৎসাহ ছিলো মৃত বা মরাদের বাড়ী সম্বন্ধে, অর্থাৎ কবরস্থানে, বা দেবতাদের মন্দিরে।

আজকাল কবর প্রায় মাটির তলায় হয়। কিন্তু লোককে মাটির তলায় কবর দেয়া ঈজিপ্‌শন্‌দের ধাতে পোষাতো না। তাছাড়া, নীল নদের জলে সারা দেশ বছরের অর্ধেক তো প্রায় জলের তলায় থাকে, কারণ প্রতি বছর, নীল নদে বান আসে, বান না আসলে দেশ বাঁচে না। আর বান হলে কবর ভাল থাকে না।

ঈজিপ্‌শন্‌দের ধর্মবিশ্বাস ছিলো হাজার হাজার বছর পরে একদিন যে যেখানে মরে পড়ে আছে, আবার তাদের প্রাণ ফিরে আসবে। ঠিক খৃষ্টীয়ানরা যেমন 'শেষ বিচারের দিনে' বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের বলে ঈজিপ্‌শন্‌দের মধ্যে যারা বড়মানুষ হতো, রাজা-উজির ধরনের, তারা টাকা খরচ করে, বেঁচে থাকতে থাকতেই নিজের নিজের বিরাট কবর তৈরি করে রাখতো। খানিকটা আমাদের দেশের মোগল-পাঠান বাদশা-বেগমদের কবরের মত আর কি। আর এই সব কবর হতো এক একটি বিরাট পোক্ত জিনিস; কাঠ বা মাটির নয় যা তুদিনে নষ্ট হয়ে যাবে। হতো পাথর বা ইট দিয়ে তৈরি। আজকাল ব্যাঙ্কে যেমন টাকা থাকে লোহার ঘরে, সেই রকম করে মৃতদেহটা রাখার ব্যবস্থা হতো। যখন মারা যেতো, দেহটা ওষুধপত্র দিয়ে রাখা হতো, যাতে গলে পচে বিকৃত না হয়। একে বলে 'এম্‌বাম্‌' করা।

এইসব এম্‌বাম-করা দেহকে আমরা বলি 'মামি'। মামিদের আবার শরীরের মাপে-তৈরি কফিন করে তার মধ্যে রাখা হতো। এই কফিন বা মামির বাক্সের উপর, কবরের দেয়ালে, মন্দিরে ঈজিপ্‌শন্‌রা ছবি আঁকতো। হাজার হাজার ছবি, সবটুকু জায়গা ছবি দিয়ে ভরাতো, একটুও ফাঁক রাখতো না। বলেছি তো, মরার আগেই এসব ব্যবস্থা সাঙ্গ করা হতো।

এসব ছবি গুহার ছবির মত জীবজন্তুর নয়। কিছু কিছু জীবজন্তু অবশ্য থাকতো, কিন্তু বুনো, অতিকায় নয়। অধিকাংশ ছবিই হতো লোকের—পুরুষ, নারী, রাজা, রানী, দেব, দেবীর।

ছোট ছেলেমেয়েদের মোটামুটি কত বয়স, তাদের না জিগ্‌গেস করেই

টার্নার : দা ফাইটিং টেমেরেয়ার

এক ধরনের পরীক্ষা করে বলে দেয়া যায়। এই পরীক্ষা হচ্ছে তাদের সমুখে তিনটি মুখের ছবি ধরা, যার প্রত্যেকটাতেই একটা না একটা অঙ্গ বাদ পড়েছে। প্রথম ছবিতে চোখ নেই, দ্বিতীয়তে মুখ অর্থাৎ ঠোঁট আঁকা নেই, তৃতীয়টিতে নাক নেই। তারপর জিগ্‌গেস করা হয়, কী বাদ পড়েছে বলো? তুমি মনে করবে এ বলা আর কি? সোজাই তো। কিন্তু তা নয়। যতক্ষণ ছেলেমেয়ের বয়স ছয় না হয় ততক্ষণ তারা বলতে পারে না কি বাদ পড়েছে। বলতে না পারলে বুঝতে হবে তাদের বয়স ছয় হয়নি।

এই দেখো একটি ঈজিপ্‌শন্‌ ছবি, এর মধ্যে কিছু ভুল আছে। একটি লোক হাঁটু গেড়ে বসে বর্শা তৈরি করছে—বর্শাকারক। এখন দেখি তোমার বয়স কত? বলো তো, ছবিটাতে কি কি ভুল আছে?

ভাল করে চেয়ে দেখো, আমাকে যেন বলে দিতে না হয়। যদি অবশ্য বলতে না পারো তবে লজ্জার কিছু নেই, কারণ এসব ভুল ঘাট

বর্শাকারক
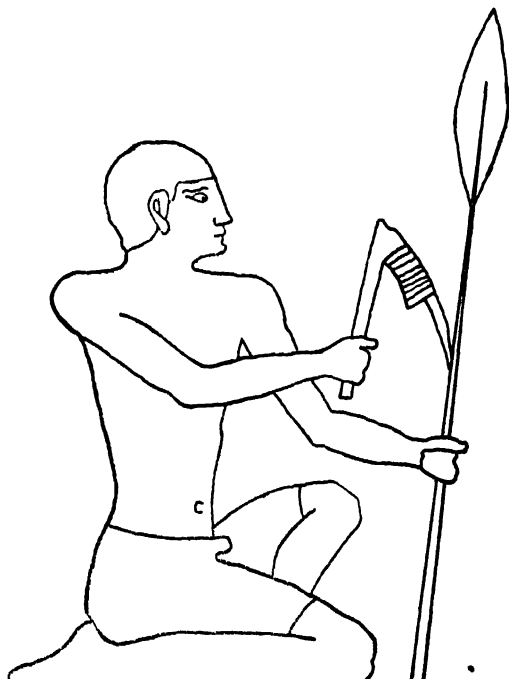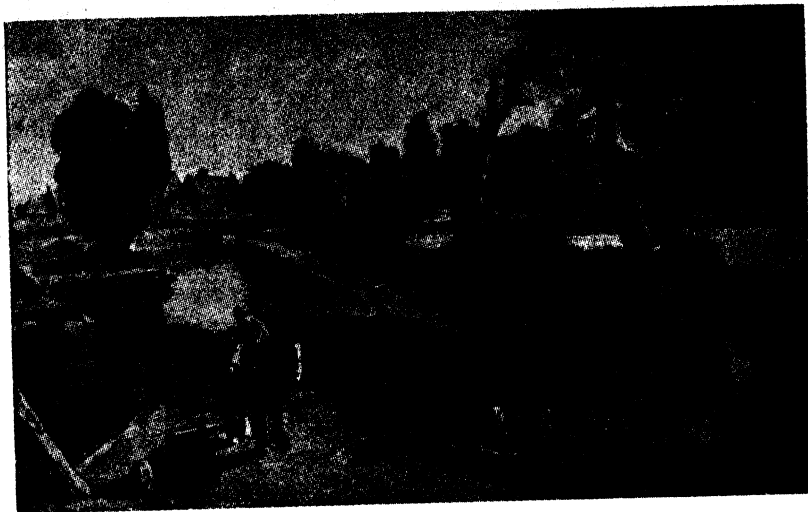
কন্‌স্টেব্‌ল্ : ফ্ল্যাটফোর্ড মিল

কোরো : ঝিল

বছরের বুড়োরাও সময়ে সময়ে ধরতে পারে না। এইসব ভুল বার করতে চোখ তৈরি থাকা দরকার। যেন একটা ধাঁধা। এখন বলো।

ভুলটা এই : চোখটা এমনভাবে আঁকা যা শুধু আমরা মুখটা সোজা থাকলে দেখতে পাই, অর্থাৎ চোখটা মুখোমুখি দেখে আঁকা। অথচ মুখটা আঁকা পাশ থেকে। অর্থাৎ মুখটা একপাশ থেকে দেখে আঁকা অথচ তার মধ্যে চোখ সমুখ থেকে দেখে এঁকে বসানো হয়েছে।

ছবিতে আরেকটা মজার জিনিস এই যে শরীরটা মোচড়ানো। কাঁধ দুটি ঠিক পুরোপুরি সমুখে, অথচ কোমর, উরু, পা, পায়ের চেটো, পাশ করা, অর্থাৎ পাশ থেকে দেখে আঁকা। পুরাকালে ঈজিপ্টে এই-ভাবে মানুষের ছবি আঁকতো। শিল্পীদের এইভাবে ছবি আঁকতে শেখাতো—একপেশে মুখে সমুখের চোখ, কাঁধ দুটি পুরোপুরি সমুখে, অথচ কোমরের তলা থেকে একপাশ করে আঁকা।

মাসিক পত্রিকার মলাটে ছবি দেখেছো তো? কোনটা হয়তো সুন্দর মেয়ের, কোনটা ফুলের। কোন ছবি থেকে একটা গল্পের আভাস পাওয়া যায়। কোন কোন ছবির তলায় লেখা থাকে, ছবির মানে কি, কোনটাতে হয়তো থাকে না। কোন কোন ছবির গল্প এতই স্পষ্ট যে লেখার দরকার হয় না। এ ধরণের ছবিকে আমরা বলি গল্প-বলা ছবি, ইংরেজিতে বলে ইলাস্‌ট্রেশন্।

ঈজিপ্‌শন্‌দের অধিকাংশ ছবিই গল্প-বলা ছবি। কখনও লেখা থাকতো, কখনও থাকতো না। মৃত রাজা, রানী, তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ, শীকার, কুচ-কাওয়াজ ইত্যাদির ছবি। উপরে, নীচে, বা পাশে কখনও ঈজিপ্‌শন্ ভাষায় ছবির ব্যাখ্যা থাকতো। মজা এমন, এই ভাষার হরফও হতো ছবি। এই লেখা যেন ছবি লেখা। আমাদের দেশে আমরা এখনও অনেক জায়গায় ছবি-আঁকা না বলে বলি ছবি-লেখা। ছবির সংস্কৃত নাম আলেখ্য। ঈজিপ্‌শন্‌দের ভাষাব হরফ ছিলো ছবি, ইংরেজিতে বলে হাইঅরোগ্লিফিক।

ঈজিপ্‌শন্‌রা যখন সাধারণলোকপরিবৃত রাজার ছবি আঁকতো, তখন রাজাকে আঁকতো খুব বড় করে, আর সাধারণ লোককে আঁকতো খুব ছোট করে। রাজার চেহারা হতো দৈত্যের মত—সাধা-রণ লোকের চেয়ে আকারে দু-তিন গুণ বড়—যাতে বোঝা যায় কত বড় লোকই না ছিলো এই রাজা।

মীলে : মাদাম সাঁসিয়ে

মীলে : খেতকুড়োনী

অনেক লোকের ভিড়ের ছবি যখন আঁকতে হতো তখন ঈজিপ্‌শন্‌রা আমাদের মত আঁকতো না। আমরা এখন করি কি, ভিড়ের লোকদের ছোট করে আঁকি আর তাদের ছবির উপরের দিকে তুলে দি। এই ভাবে এঁকে, ছবিতে তাদের "পিছনের" দিকে ঠেলে দিই। ঈজিপ্‌শন্‌রা এই রীতিটা জানতো না। সামনে যারা আছে, তাদের সাইজেই, পিছনে যারা থাকবে, তাদের ছবি ঈজিপ্‌শন্‌রা আঁকতো, সাইজ ছোট করতো না। তাহলে তারা পিছনে অর্থাৎ দূরে আছে এটা বোঝাতো কি রকম করে? বোঝাতো একটা মজা করে। 'দূরের' লোকদের ছোট করে এঁকে নয়, 'সামনের' লোকদের মাথার উপরে আরেকটা সার বেঁধে তাদের বসিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিতো যে তারা গৌণ, তারা 'পিছনে' বা দূরে। সামনে নয়।

এখন আমরা শত শত রঙ-বেরঙ বার করেছি, তাদের নানান রকম-ফের, নানা পর্দা। কিন্তু ঈজিপ্‌শনদের মাত্র চারটি জোরালো রঙ ছিলো—লাল, হলদে, সবুজ, নীল। তাছাড়া ছিলো কাল, সাদা, বাদামী বা ব্রাউন। তাদের রঙ টিকতোও খুব, প্রায় চিরস্থায়ী, পাকা। ফিকে হয়ে উঠে যাবে না এমন রঙ আমরা আজকাল খুঁজে খুঁজে হয়রান। পর্দা বলো, চেয়ারের ঢাকনা বলো, পোশাক বলো, সবই রঙ জ্বলে যায়। কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে আঁকা ঈজিপ্‌শন্‌দের ছবি আজও যেন সদ্য আঁকা, জ্বলজ্বল করছে। তার কারণ দুটো; পাকা রঙে ছবিগুলি আঁকা হতো, আর যেসব জায়গায় আঁকা থাকতো সেখানে সূর্যের আলো ঢুকতো না। পলেস্তারা বা প্লাস্টার-করা দেয়ালে আঁকা রঙগুলি হতো খুব জ্বলজ্বলে, জোরালো—ঠিক প্রাকৃতিক রঙের মত নরম নয়। তা ছাড়া, একটা জিনিসের স্বাভাবিক যে রঙ, ঈজিপ্‌শন্ ছবিতে সে রঙের বালাই রাখা হতো না। যে রঙে ভাল দেখাতো সেই রঙ দেয়া হতো। এমন কি মানুষের মুখ আঁকা হতো কখনও টকটকে লাল, কখনও জ্বলজ্বলে সবুজ!

এই সব ছবি তো মানুষে রোজ দেখবে বলে আঁকা হতো না, কারণ এসব তো কবরখানায় হতো? তোমাদের নিশ্চয় মনে হতে পারে, তবে তারা আঁকতো কেন? ব্যাপারটা কি?

ধরো আজকাল যখন একটা বড়ো মন্দিরের বা ইস্কুল-কলেজের ভিত পোঁতা হয়, তখন ভিতের তলায় একটা ফাঁপা পাথর বসানো হয় তাকে

ত্তমিয়ে : সুরুয়া খাওয়া

ত্তমিয়ে : তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী

আমরা বলি কোণের পাথর, ইংরেজিতে কর্ণার স্টোন। সেই ফাঁপা পাথ-রের ভিতরে একটি বোতলে থাকে যেদিন ভিত পোতা হয় সেদিনের খবরের কাগজ, সেই সময়ে জীবিত লোকজনের ছবি, সেই বছরের টাকা ইত্যাদি। কেন করা হয়? তার কারণ, সকলে আশা করে যে বাড়ীটা বহুদিন থাকবে, যতদিন না ভেঙে পড়ে যাবে, কর্ণার স্টোনটি কেউ খুলে দেখতে পাবে না। কেন এরকম করে? আমরা কি এই রীতিটা ইজিপ্‌শন্‌দের কাছে ধার করেছি? কে জানে!

রাজবাড়ীতে ধাঁধাঁর ছবি

ম্যাপ বইতে ঈজিপ্ট থেকে মাত্র এক ইঞ্চি পূবে, কিন্তু আসলে প্রায় হাজার মাইল পূবে ছিলো আর একটা,—না, একটা কেন, অনেকগুলি —দেশ। তাদের নামগুলো ছিলো বেজায় খটমটে। তোমরা যখন বড়ো হয়ে জেনফন্‌ বা থিউসিডিডিজ পড়বে, তখন নামগুলো বারবার পড়তে হবে। ঈজিপ্ট এক-নদীর দেশ। কিন্তু হাজার মাইল পূবে, এই দেশগুলির ছিলো তুটি নদী। এক কাজ করা যাক। এখানকার সব রাজ্যগুলোকে মিলিয়ে আমরা এখন তাদের বলি তুই-নদীর দেশ। এই তুই নদীর নাম টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিজ। এই তুই নদীর মাঝখানের রাজ্যগুলির নাম একবার বলবো কি? তাদের নাম মেসপটেমিয়া, ক্যালডিয়া, ব্যাবিলোনিয়া আর অসিরিয়া।

পুরাণের ঈডেন উদ্যান বা স্বর্গ-কানন এইখানেই ছিলো, এই লোকের কল্পনা। এক-নদীর দেশ আর তুই-নদীর দেশ, পৃথিবীতে এরাই সবচেয়ে পুরানো দেশের মধ্যে পড়ে। বলা শক্ত, কোনটা বেশি প্রাচীন।

হাজার হাজার বছর আগে এই তুই-নদীর দেশেই ছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বড়ো শহর—বোধ হয় এখনকার লণ্ডন, নিউইয়র্কের চেয়েও বড়ো—আর তাতে রাজত্ব করতো মহাপ্রতাপশালী নিষ্ঠুর রাজার দল। এই সব নগরের এখন একটাও নেই। তার কারণ, এই সব শহর পাথর দিয়ে তৈরি হয়নি, তুই-নদীর দেশে পাথর পাওয়া যেতো না। ঠিক যেমন নদীর দেশ বাংলাদেশে বহুপ্রাচীন চিহ্ন খুব কম আছে। বাড়ী, ঘর, প্রাসাদ তৈরি হতো কাদার ইটের গাঁথুনিতে, পাঁজায় পোড়ানো ইটেও নয়, রোদ্দুরে শুকোনো কাঁচা ইটে। ঈজিপ্‌শনরা কিন্তু পাঁজা

মানে : একটি নহিলা আর টিয়াপাখি
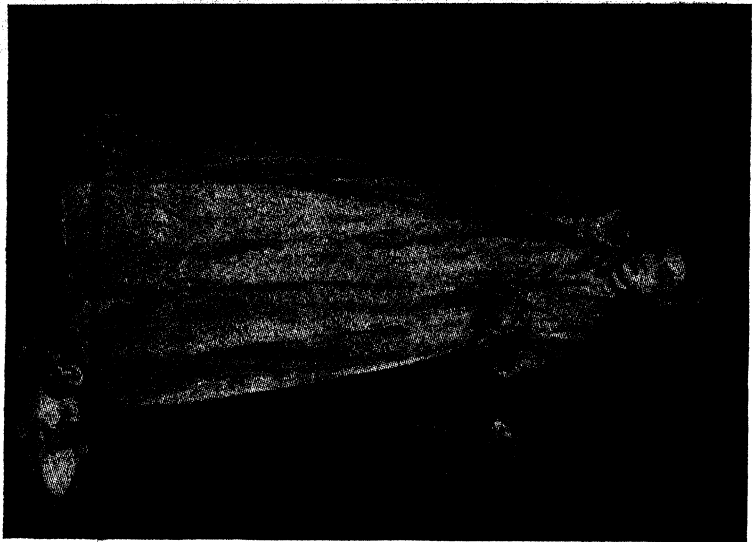
ক্লোদ মনে : রুয়েঁা ক্যাথিড্রাল
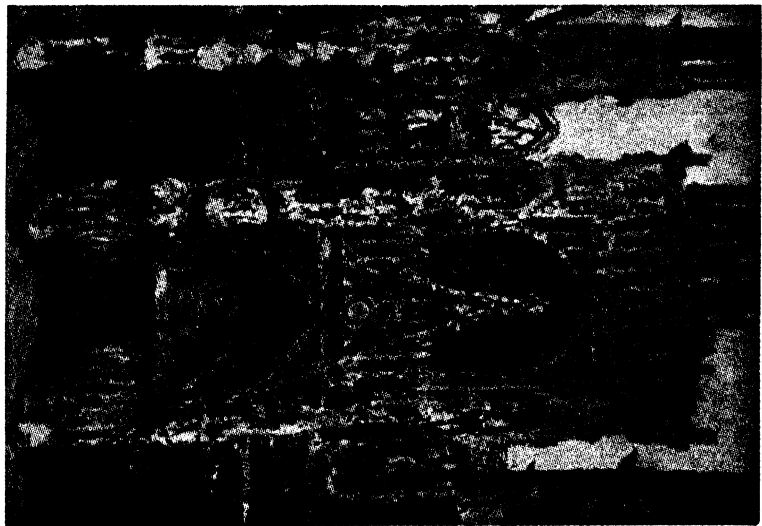
করে ইঁট পোড়াতো। তাতেই মনে হয় হয়তো দুই-নদীর দেশের শহর-গুলো ঈজিপ্টের শহরের চেয়ে প্রাচীন। রোদে-শুকোনো মাটি আর কদিন থাকে বলো! কাজে কাজেই এসব শহর বহুদিন ভেঙে ধসে গেছে, এখন শুধু মাঝে মাঝে দেখা যায় বিরাট বিরাট ঢিপি, ঠিক স্বাভাবিক পাহাড়ের মতো।

ইঁট না পোড়ানোর আর একটা কারণ থাকতে পারে। তখন তো কয়লা আবিষ্কার করেনি, কাঠের জ্বালেই সব কিছু হতো। এখনও যেমন মাঝে মাঝে বাংলা পাঁজা কাঠের জ্বালে পোড়ানো হয়। কিন্তু দুই-নদীর দেশে বনজঙ্গল ছিলো কম, কাঠ বেশি জুটতো না, ফলে পাঁজা পোড়ানো চলতো না। ওরই মধ্যে লোকে কিছু কিছু ইঁটে রঙচঙ করে ছবি এঁকে, কাঁচের মত একটা পালিশ লাগাতো। একে আমরা মিনে-করা, ইংরেজিতে গ্লেজ করা বলি। এই পালিশ লাগানোর পর আগুনে পুড়িয়ে রঙীন টালি (ইংরেজিতে টাইল) তৈরি হতো। পুরোনো শহরের ঢিপি খুঁড়ে খুঁড়ে লোকে এখনও মাঝে মাঝে এই ধরনের টালি বার করে।

আগে বলেছি ঈজিপ্টে মৃতেরা যাতে দেখতে পায় মুখ্যত তাদের জন্যেই লোকে ছবি আঁকতো। দুই-নদীর দেশে কিন্তু শিল্পীরা মৃতদের বিশেষ তোয়াক্কা করতো না। তারা আঁকতো যারা বেঁচে আছে বা থাকবে তাদের জন্যে ছবি।

রাজারা নিজেদের কবরখানা তৈরির দিকে মন দিতো না। মরার পরে তাদের কী অবস্থা হবে তার জন্যে চিন্তা ছিলো না। বরং, তারা বেঁচে থেকে কী করে বিরাট রাজপুরীতে ঐশ্বর্যে থাকতে পারে, তারই ব্যবস্থা করতো, আর দেবতাদেরও থাকার ব্যবস্থা করতো বিরাট বিরাট মন্দির করে। এই সব প্রাসাদ আর মন্দির তৈরি হতো কাঁচা ইঁটে। কাঁচা ইঁট তো দেখতে সুদৃশ্য নয়। অতএব রঙ দিয়ে আঁকা ছবি দিয়ে আগা-গোড়া মুড়ে কাঁচা ইঁট ঢাকার ব্যবস্থা হতো। এই ছবি আঁকা হতো অ্যালাবাস্টার বলে চুনে-পাথরের ছোটো-বড়ো পাটায় বা পোড়া টালিতে।

অ্যালাবাস্টার হচ্ছে সাদাটে ধরনের পাথর, খুব নরম, সহজে কাটা যায়। পুরীতে কারিগররা বিক্রির জন্যে যে-পাথরে ছোটো ছোটো মন্দির তৈরি করে প্রায় সেই ধরণের পাথর। দুই-নদীর শিল্পীরা করতো কি অ্যালাবাস্টারে ছবি খোদাই করতো, তার পরে রঙ বুলিয়ে দিতো ঈজিপ্‌শন্‌দের মতো।

দেগা : রঙ্গমঞ্চে বালে নর্তকী

দেগা : মাদাম হের্তেল

বুঝতেই পারছো ছোটো ছোটো টালিতে তো আর বড়ো ছবি হয় না। সুতরাং যে-কোন টালিতে বড়ো ছবির সামান্য একটি অংশ আঁকা সম্ভব হতো। তার পরে টুকরো টুকরো ছবির টালি মিলিয়ে তৈরি হতো একটা বড়ো ছবি ; ঠিক যেমন আজকাল খেলনা বেরিয়েছে, একটা বড়ো ছবির টুকরো অংশগুলি সাজিয়ে বড়ো ছবি তৈরি করা। ঠিক যেন একটা ধাঁধাঁ। একধরনের ছবি হয়, জানো কিনা জানি না; নানা রঙের ছোটো ছোটো পাথর সাজিয়ে এগুলি হয় তৈরি। নানা রঙের পাথর দিয়ে সাজানো ছবিকে বলে মজেইক। দুই-নদীর দেশের শিল্পীরাই প্রথম মজেইক সৃষ্টি করে।

ঈজিপ্টে যেসব ছবি কবরের ভিতরের দেয়ালে বা মন্দিরের দেয়ালে আঁকা ছিলো সেসব এখনও স্বস্থানেই আছে। কেউ নড়ায়নি। কিন্তু মামির বাক্সে যেসব ছবি পাওয়া গেছে সেসব নানাদেশের জাদুঘরে (মিউ-জিয়মে) রাখা হয়েছে। দুই-নদীর দেশের মাটি খুঁড়ে অ্যালাবাস্টার বা টালিতে আঁকা যেসব ছবি বেরিয়েছে সেগুলোও জাদুঘরে রাখা হয়েছে। এই সব ছবি রাজা আর তাঁদের অমাত্য পরিষদদের বিষয়ে আঁকা। তাঁরা আবার দুটো জিনিস খুব ভালবাসতেন, শীকার খেলা, আর যুদ্ধ করা। সুতরাং অধিকাংশ ছবিই হয় শীকার, না হয় যুদ্ধের।

এই দুই-নদীর দেশের শিল্পীদের আঁকার রীতি আর ঈজিপ্‌শন্‌দের আঁকার রীতি অনেক বিষয়েই একরকম ছিলো। যেমন এক-নদীর দেশে, তেমনই এই দুই-নদীর দেশেও, পাশ থেকে দেখা মুখে সমুখ থেকে দেখা চোখ আঁকা হতো, কিন্তু কাঁধ দুটো আঁকা হতো যেন পাশ থেকে দেখা কাঁধ। যখন কোন শিল্পী একদল লোকের পিছনে আরেক দল দল লোক এঁকে দেখাতে চাইতেন, তখন ঈজিপ্‌শন্‌দের মতোই পিছনের দলটিকে সরাসরি লাইন করে সমুখের দলটির উপরে তুলে দিতেন। ওরই মধ্যে আবার দুই-নদীর দেশের কোনো কোনো শিল্পী একটা সম্পূর্ণ নতুন রীতি আনতেন : করতেন কি, পিছনের লোকগুলিকে ছোটো করে আঁকতেন, আর উপরের দিকে একটু তুলে দিতেন, আবার সেই সঙ্গে পিছনের লোকগুলির তলার খানিকটা সমুখের লোকগুলির আড়ালে ঢাকা দিতেন। এইভাবে বা রীতিতে ছবি আঁকলে যে-একটা অনুমানের সৃষ্টি হয় তাকে ছবির ভাষায় বলে পরিপ্রেক্ষিত, ইংরেজিতে পর্‌স্পেক্টিভ্‌, এই গুণটি ছবিতে থাকলে ছবির মধ্যে যেসব জিনিস আঁকা থাকে তাদের

রেনোয়ার : মল্যাঁ দ্য লা গালেত

মধ্যে পরস্পরের দূরত্ব, গভীরত্ব, আগে, পরে, বোঝা যায় বা আন্দাজ হয়।

দুই-নদীর দেশের শিল্পীরা যেসব লোকের ছবি আঁকতেন সেসব লোক এক-নদীর দেশের শিল্পীরা যাদের ছবি আঁকতেন তাদের থেকে অনেক তফাত। দুই-নদীর শিল্পীদের আরাধ্য ছিলো প্রতাপ আর প্রতাপশালী লোক; তাঁরা ভাবতেন সব শক্তিমান পুরুষেরই থাকবে লম্বা চুল আর প্রকাণ্ড দাড়ি। তাই তাঁরা যেসব রাজার ছবি আঁকতেন তাঁদের করতেন ভীষণ বলিষ্ঠ, হাতপায়ের পেশী যেন ফুলে ফেটে পড়ছে, লম্বা চুল, প্রকাণ্ড দাড়ি, আর চুলগুলি কী যত্নে কোঁকড়ানো। যেন হালফ্যাশানের মেয়েদের চুল-কোঁকড়ানো যন্ত্র দিয়ে কোঁকড়ানো হয়েছে। জন্তুজানোয়ারের যেসব ছবি আঁকতেন, সেসব ঈজিপ্শন্দের চেয়েও দেখতে স্বাভাবিক হতো। তাঁরা সিংহ আর ষাঁড় আকতেই বেশি ভালবাসতেন, কারণ দুটি জন্তুই শক্তির প্রতীক।

দুই নদীর শিল্পীরা আরেক ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, সেটা হচ্ছে, আল্পনা আর পাড়ের কারুকার্য করতে। একটি আল্পনা তাঁদের সময় থেকে এখনও চলে আসছে, কখনও পুরানো হয় না, তার নাম রোজেট্: এটির মাঝখানে একটি ফুটকি, আর তাকে ঘিরে একটি ছোট্ট চাকার মত গোল। আরেকটি চিত্র তাদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, তার নাম গীলোশ্। এই গীলোশ্ বা রোজেট এখনও আমরা স্নানঘরের টালিতে বা বড়ো বড়ো বাড়ীর হলঘরে ব্যবহার করি।

দুই-নদীর শিল্পীদের আরেকটি ছবি যুগে যুগে নানা দেশের শিল্পীরা ব্যবহার করেছেন। এটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত গাছের ছবি—তার নাম প্রাণবৃক্ষ। এটা পৃথিবীর কোন গাছের মতই দেখতে নয়। এতে একই গাছে একই সময়ে নানা ধরনের ডালপালা, নানা ধরনের পাতা, নানা ধরনের ফলফুল আঁকা। এই গাছ প্রায়ই কার্পেটের নক্সায় ব্যবহার হয়। আমাদের বাংলাদেশের কাঁথায় এই প্রাণবৃক্ষ প্রায়ই ছুঁচে তোলা হয়। জানি না কেন একে প্রাণবৃক্ষ বলা হয়, কী এর মানে, কেনই বা এর উদ্ভাবন। তোমরাও একবার ভেবে দেখো। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ায় মিচুরিন বলে এক বৈজ্ঞানিক এমন সব অদ্ভুত ধরণের গাছ সৃষ্টি করে গেছেন, যার এক-একটিতে বহুরকমের ডালপালা, পাতা ফলফুল হয়। মর্ত্যের প্রকৃতিতে বোধহয় দুই-নদীর শিল্পীর কল্পনার প্রাণবৃক্ষ তিনিই প্রথম আনলেন।

পল সেজান :   তাস খেলা

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রীক চিত্রকলা

বোকাবানানো ছবি

আমাদের একটা বেড়াল ছিলো, তাকে আমরা প্রায়ই ক্ষেপাতুম আয়নার সামনে তুলে ধরে। আয়নাতে নিজের মূর্তি দেখে বোকাটা মনে করতো এ আরেকটা বেড়াল, আর অমনি পিঠ ধনুকের মত বেঁকিয়ে ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করতো। খুব মজা লাগতো আমার। কিন্তু আশ্চর্য, বেড়ালকে যদি আরেকটা বেড়ালের ছবি দেখাও, বেড়াল কিছুই বলবে না, সে ছবির-বেড়াল দেখতেই পায় না। কুকুরদের বেলাও তাই। আয়নায় নিজেকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করবে, কিন্তু অন্য কুকুরের ছবি দেখালে দেখতেই পাবে না। চোখ থাকতেও জন্তুজানোয়ার ছবি দেখতে পায় না, আঁকতে তো পারেই না।

কিছু কিছু লোকও ঠিক ওই রকম। ছবির দিকে তাকিয়ে আছে অথচ দেখছে না। ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা আর ছবি দেখা এক নয়।

ছেলেবেলায় একটা দোকানে বিস্কুট কিনতে যেতুম, দোকানটার শো-কেসের ঢাকনার উপর একটা টাকা আঁকা ছিলো। এমন নিখুঁতভাবে আঁকা যে অনেকে ভুল করে সেটা তুলে দোকানদারকে দিতে যেতো। আমার অবাক লাগতো, মনে হতো কী আশ্চর্য সেই শিল্পী যে ওই টাকাটি এঁকেছে।

ছেলেবেলায় বাবা একবার একটা ছবির প্রদর্শনীতে নিয়ে গেছলেন। সেখানে একটা ছবি আমাব সবচেয়ে ভাল লেগেছিলো। আমার কাছে তা ছিলো পরমাশ্চর্য জিনিষ। ছবিটাতে দুটি দরজা আঁকা, তার একটি আধখোলা, আর আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে একটি মহিলা উঁকি মারছেন। প্রথমে দেখলে থতমত খেতেই হবে, ঠিক মনে হবে যেন সত্যিই রক্তমাংসের এক মহিলা দরজার আড়াল থেকে উঁকি মারছেন। ছবিটা এত জলজ্যান্ত যে বিশ্বাসই হবে না যে

পল সেজান : স্টিল-লাইফ

ভান গখ : প্রতিকৃতি

ওটা নিছক ছবি, সত্যি কিছু নয়। তখন আমার মনে হতো শিল্পের চূড়ান্ত হচ্ছে এই ধরনের ছবি—এমন স্বাভাবিক, এমন জলজ্যান্তভাবে আঁকা যে, যে দেখবে সে বোকা বনে যাবে, মনে করবে এ ছবি নয়, সত্যিকারের মানুষ। পয়লা এপ্রেল তারিখে বন্ধুবান্ধবকে হয়তো তোমরা ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাও। এইসব ছবি সেই এপ্রেল -ফুল-করা বোকা-বানানো ছবি।

আশ্চর্যের কথা এই যে গ্রীস দেশের শিল্পীরাও যেন ঠিক আমার মত ভাবতেন। গ্রীস কোথায় বলো তো? গ্রীস হচ্ছে ঈজিপ্টের উত্তরে, ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে, ইওরোপের দক্ষিণপূবে। তোমরা জানো কিনা জানি না, গ্রীকরা সবচেয়ে ভাল মূর্তি গড়তে পারতেন, আর স্থাপত্যে ছিলেন অদ্বিতীয়। কিন্তু ছবি আঁকার হাত তাঁদের ভাল ছিলো না। তাঁদের ছবি অধিকাংশই এই এপ্রেল-ফুল-করা, অর্থাৎ বোকা-বানানো ধাঁচের ছবি। তাঁরা এমন ছবি আঁকতে ভালবাসতেন, যাতে লোক বোকা বনে মনে করে যে ছবিটা ছবি নয়, জলজ্যান্ত মানুষ বা প্রকৃতি।

ঈজিপ্ট বা অসিরিয়ার ছবি আমরা জানি, দেখি, কিন্তু শিল্পীর নাম জানি না। গ্রীক ছবির বেলায় শিল্পীর নাম আমরা পাই, কিন্তু ছবির চিহ্ন নেই। জানাশোনার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন শিল্পীর নাম আমরা জানতে পেরেছি। তিনি ছিলেন একজন গ্রীক। নামটা শক্ত। অধিকাংশ গ্রীক নামই খটমটে। কিন্তু যেহেতু তাঁকে গ্রীকচিত্রকলার আদিপুরুষ বলা হয়, সেহেতু নামটা জেনে রাখা ভাল। তাঁর নাম পলিগ্নোটাস্। তাঁর সমসাময়িক লেখকরা বলে গেছেন, পলিগ্নোটাস্ ছিলেন আশ্চর্য শিল্পী। কিন্তু তাঁর একটা ছবিও আজ নেই। অতএব পরের মুখে ঝাল খেয়েই খুসী থাকতে হবে।

খুব কম গ্রীক ছবিই এখনও আছে। তার একটা কারণ যে গ্রীক ছবি দেয়ালে আঁকা হতো না; এখন যেমন, তেমনি তখনও এমন জিনিসে ছবি আঁকা হতো যা এক জায়গা থেকে অন্যত্র বয়ে বেড়ানো যায়। ফলে ঠাঁই নাড়ানাড়ি করতে করতে ছবি যায় নষ্ট হয়ে, হারিয়ে। এইভাবেই প্রায় সব গ্রীক ছবি নষ্ট হয়ে গেছে।

এই এপ্রেল-ফুল, বোকাবানানো শিল্পীদের সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি ছিলেন তাঁর নাম ছিলো জিউক্সিস। তিনি ছিলেন গ্রীক, খ্রীষ্ট জন্মের চার শ

গোগ্যাঁ :   তাহিতির মেয়ে

বছর আগে বেঁচেছিলেন। প্রবাদ আছে তিনি একটা ছবি আঁকলেন, তাতে একটি ছেলে একথোকা আঙুর নিয়ে যাচ্ছে। এমন জলজ্যান্ত ছবি যে পাখী এসে ছবির আঙুর ঠুকরে খেতে যেতো। এই ছবিটা তিনি একটা প্রতিযোগিতায় দিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন আরেক শিল্পী, নাম পারাসিআস্। খুব জোর লড়াই। সকলেই ভাবলো জিউক্সিসই জিতবেন। সোজা কথা! ছবিতে এমন আঙুর এঁকেছেন যে পাখীও ভুল করে ঠুকরে খেতে যায়! পারাসিআস ছবি নিয়ে এলেন। ছবির সমুখে একটা পর্দা টানা।

জিউক্সিস নিজের ছবি দেখালেন, তার পর পারাসিআসকে বললেন, 'এখন পর্দা টেনে আপনার ছবি সকলকে দেখান।'

পারাসিআস বললেন 'পর্দাটাই তো আমার ছবি। তার পিছনে তো ছবি নেই। তুমি এত বুদ্ধিমান লোক, এত তীক্ষ্ণ তোমার চোখ, আর তুমি এই ভুল করলে? তাহলে আমিই জিতলুম। তুমি পাখীকে বোকা বানিয়েছো, আর আমি বোকা বানিয়েছি তোমাকে। তা ছাড়া ভেবে দেখো, ছবিতে যে ছেলেটিকে তুমি এঁকেছো সেটি ঠিক জলজ্যান্ত হয়নি। তা যদি হতো, তাহলে জ্যান্ত ছেলের হাত থেকে কি পাখী আঙুর ঠুকরে নিয়ে যেতে সাহস পেতো?

কিন্তু সবচেয়ে ভালই বলো আর খারাপই বলো, গ্রীসের সবচেয়ে বিখ্যাত চিত্রশালা ছিলো একটি বিখ্যাত হলের মেঝে। এই মেঝে ভর্তি ছিলো ছবি, সেসব ছবি ফলের খোসা, আঁস, খাবারের উচ্ছিষ্ট দিয়ে আঁকা। এই হলের নাম ছিলো 'ঝাঁট-না-পড়া দালান'। গ্রীকরা এর গর্বে আত্মহারা। কি করে তাঁদের এরকম গর্ব করা সম্ভব তা আমাদের মাথায় ঢোকে না।

গ্রীকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর নাম অপেলিজ। তিনি ছিলেন সম্রাট আলেকজাণ্ডারের বিশেষ বন্ধু। তিনি আলেক্‌জাণ্ডারের ছবি এঁকেছিলেন। কিন্তু ছবির জন্যে তিনি আজ যত না বিখ্যাত, তার চেয়ে তাঁর খ্যাতি তাঁর সম্বন্ধে ছুটো-তিনটে গল্পে।

অপেলিজ্ একটা ছবি আঁকলেন সেই ছবিতে পায়ের জুতো দেখে এক মুচি বললো ঠিক হয়নি। নিজের কাজ ভাল বোঝে এমন একজন লোকের কাছে সদুপদেশ পেয়ে অপেলিজ্, মুচির কথামত, ছবিটা শুধরে ঠিক করে দিলেন। পরের দিন মুচি লাই পেয়ে ছবির

অঁরি মাতিস্ : ছবি

আরেকটা অংশের ভুল ধরতে গেলো। কিন্তু এবারে অপেলিজের পছন্দ হলো না, কারণ তিনি জানতেন মুচি যে বিষয়ে জানে না সে বিষয়ে কপচাচ্ছে। অপেলিজ্ রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন 'মুচি তোমার লাশ দেখো গে'। অর্থাৎ নিজের চরকায় তেল দাও গে, যা জানো শুধু তা নিয়েই কথা বলো। লাশ হচ্ছে জুতো মাপে রাখার কাঠ। অর্থাৎ যা জানো না, তা নিয়ে কথা বোলো না।

অপেলিজ্ অসম্ভব খাটতেন : তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল প্রতি দিনই কিছু-না-কিছু কাজের মত কাজ করবেনই। তিনি বলতেন 'লাইন নেই, দিন নেই।' অর্থাৎ এমন দিন যাবে না যেদিন আমি একটিও ভাল লাইন আঁকতে পারবো না। দু হাজার বছরের উপর হয়ে গেলো, আমরা এখনও তাঁর এই সব কথা বলি। এসব কথা প্রবাদ হয়ে গেছে। কথাগুলি থেকে গেছে, ছবি একটিও নেই। কিন্তু জীবদ্দশায় তাঁর খ্যাতি ছিলো অসীম।

তাঁর সূক্ষ্ম কাজের আরেকটি গল্প প্রবাদ হিসেবে চলিত আছে। এতে বোঝা যায় তুলি ধরায় অপেলিজ্ কত ওস্তাদ ছিলেন। গল্প আছে, তিনি একদিন এক শিল্পী-বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন। বন্ধু বাড়ীতে ছিলেন না। তাই অপেলিজ্ তাঁর তুলি তুলে নিয়ে সেটি রঙে ডুবিয়ে তাঁর আঁকার ইজেলে খুব সূক্ষ্ম একটি লাইন শুধু এঁকে রেখে চলে গেলেন। ইচ্ছেটা দেখা বন্ধুর নজরে পড়ে কিনা, এবং লাইনটা দেখে তিনি বুঝতে পারেন কিনা কে এসেছিলো। বন্ধু পরে ফিরে এলেন, রেখাটা তাঁর নজরে পড়লো, আর চেঁচিয়ে উঠলেন—

'অপেলিজ্ এসেছিলেন। আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ তাঁর মত এত সূক্ষ্ম রেখা আঁকতে পারে না।'

তখন তিনি অপেলিজের রেখা ধরে, তার তলা টেনে তুলির ডগায় সেই রেখাটি চিরে দুটি সূক্ষ্মতর রেখা করলেন। অপেলিজ্ আবার এলেন। এসে যখন দেখলেন তাঁর রেখাটি টেনে দুভাগ করা হয়েছে, তখন তিনি আবার সেই দুভাগের প্রত্যেক ভাগটি টেনে আরও সূক্ষ্ম দুভাগ করলেন, তাদেরও আবার তুলি দিয়ে টেনে প্রত্যেকটিকে আরও সূক্ষ্ম দুভাগ করলেন। বার বার করে 'চুল চেরা' আর কি!

বড় দুঃখের কথা গ্রীকদের এমন একটা ছবি নেই যা এইখানে ছেপে দেখানো যায়। থাকলে বোঝা যেতো তাঁরা কী দরের শিল্পী ছিলেন।

পাব্‌লো পিকাসো : মাদোনা

এক ধরনের গ্রীক ছবি কিন্তু আমরা এখনও প্রচুর দেখতে পাই। সেগুলি হচ্ছে সেকালের মাটির পাত্রের গায়ে আঁকা ছবি। যে ধরনের পাত্রের কথা বলছি, তাকে ইংরেজিত সাধারণভাবে বলে ভাস্ বা ভাজ্, বাংলাতেও একথাটি চলিত হয়ে গেছে।

আজকাল ভাজ্ তৈরি হয় কাঁচের, চীনেমাটির, বা তামার ; উদ্দেশ্য ফুল রাখা। বাইরেটা প্রায়ই সাদা থাকে, ফুল, লতা, পাতা আঁকার রেওয়াজ কমে যাচ্ছে। গ্রীক ভাজ্ কিন্তু সবই মাটির হতো ; ফুল রাখার জন্যে নয়, তরল পদার্থ রাখার জন্যে—যেমন জল, মদ, তেল, গন্ধদ্রব্য, মলম ইত্যাদি, যা আমরা আজকাল বোয়েম বা কানাতোলা কুঁজো, বা শিশি, জামবাটি, বাটি, কেট্‌লি, ঘড়া, কলসী বা টিনে রাখি। এই সব বোয়েম, জগের খুব সুন্দর সুন্দর গড়ন হতো। কোনটা লম্বা আর সরু, তন্বী। কোনটা বেঁটে, মোটা. স্থূলাঙ্গী। কোনটার একটি মাত্র হাতল, কোনটার বা দুটো। আমরা এখনও পুরানো গ্রীক ভাজের গড়ন অজান্তে নকল করে থাকি। পুরানোর সঙ্গে সাদৃশ্য, মাটির বাসনে বিশেষ করে, এখনও প্রচুর। শুধু মাটির বাসনে কেন আমরা কাঁচ, চীনেমাটি, পিতল, তামার জিনিসে গ্রীক গড়নের নকল করি। গ্রীকভাষায় প্রত্যেকটি বিভিন্ন গড়নের আলাদা নাম ছিলো। নামগুলো সব গ্রীক নামের মতই খটমটে। কিন্তু কয়েকটা শিখে রাখতে পারো, বন্ধুবান্ধবের বাড়ী গিয়ে তাদের ভাজ্ দেখে দু-একটা গ্রীকনামের বোলচাল দিতে মন্দ লাগবে না।

কাইলিক্স হচ্ছে চ্যাপ্‌টা ভাজ্, নীচু, অনেকটা আজকালকার ফলরাখার ডিশের মত।

এস্‌কস্ হচ্ছে একটু নীচু ভাজ্, নলের মত মুখ আছে, উপরদিকটা সবটা জুড়ে তার হাতল, সেটা গেছে পিছন থেকে মুখের নল পর্যন্ত। এস্‌কসে বাড়ীর প্রদীপের জন্যে তেল রাখা হতো, অর্থাৎ মাটির তৈলাধার পাত্র।

এ্যাম্‌ফোরা হচ্ছে বেশ মোটা বড় ভাজ, তার কোমর থেকে দুটি হাতল গলায় এসে লেগেছে।

ওইনোকোই হচ্ছে একটা ঘড়ার গড়নে ভাজ্।

পাব্‌লো পিকাসো : আয়নার সমুখে ছোট মেয়ে

লেকিথস্ হচ্ছে লম্বা, সরু, অনেকটা মোটা শিশির আকার, একটি-মাত্র হাতল আছে।

ভাল ভাল গ্রীক ভাজ্ সবই বাইরে চিত্র করা হতো। কিসের চিত্র বলো তো? রাজারানীর নয়। রাজারানীর ছবির চলন ছিলো ঈজিপ্টে। অসিরিয়ায় ছিলো রাজা, অমাত্য, পারিষদের ছবির চলন। কিন্তু গ্রীকদের রাজা ছিলো না, সুতরাং তারা রাজারানীর তোয়াক্কা করতো না। তাই তারা গ্রীক দেবদেবীর ছবি আঁকতো তাদের ভাজে, অথবা গ্রীক বীরদের কথা, অথবা রূপকথা। প্রায় সব ছবিই এত সুন্দর যে চোখ জুড়িয়ে যায়, ঠিক যেন বইএর ছবি, এত সুন্দর, এত তাদের শ্রী। তাদের ধরন গ্রীক চিত্রকলার ঠিক উল্টো। গ্রীক ছবির উদ্দেশ্য ছিলো আগে যা বলেছি, বোকাবানানো। কিন্তু গ্রীক ভাজের ছবির উদ্দেশ্য মোটেই তা ছিলো না। সে সব ছবি শুধুই ছবি, ছবি হিসেবেই তাদের উৎকর্ষ, দেখে মনে হবে না এই বুঝি জ্যান্ত জিনিস হাত পা নিয়ে ভাজের গা থেকে কিলবিল করে বেরিয়ে আসবে। তাছাড়া বোকাবানানো ছবিতে একটা জিনিস দরকার, তা হচ্ছে ছবির মধ্যের লোকজন, ফুল, পাখী প্রমাণ-সাইজ না হলে অসুবিধা হয়। আর এসব ভাজ্ তো প্রায়ই মানুষের চেয়ে অনেক ছোট হতো!

ছবিগুলি প্রায়ই দুই ধরনের হতো। প্রথম ধরনে, লাল্‌চে বা মেটে রঙের জমির উপর কালো বা কাল্‌চে ধরনের ছবি আঁকা হতো। দ্বিতীয় ধরনে, জমিটা হতো কালো, আর ছবিগুলি হতো লালচে বা মেটে রঙের; দেখে মনে হয় যেন পুরো ভাজটা আগে কালো রঙ করা হয়েছিলো, তার পর গা চেঁচে চেঁচে ছবিটি ভাজের গা থেকে আসল মাটির রঙে ফুটিয়ে বার করা হয়েছে।

ওইনোকোই
এ্যাম্‌ফোরা
এস্‌কস্‌
লোকথস্‌
কাইলিক্স

তৃতীয় অধ্যায়
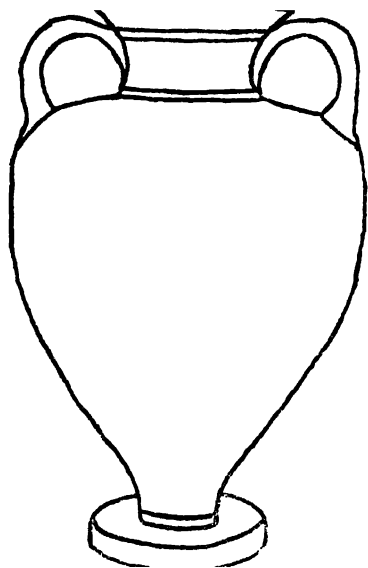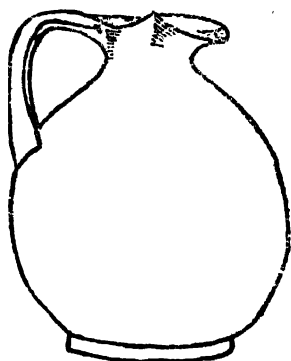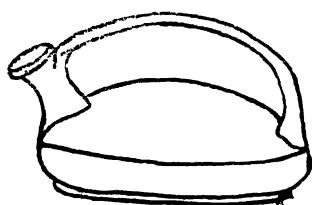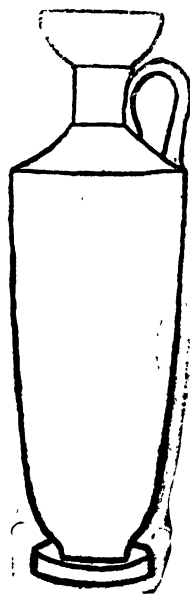
প্রথম যুগের খৃষ্টিয়ান ছবি

যীশুখৃষ্ট ও তাঁর অনুচরদের ছবি

যীশুখ্রীষ্টের নাম যত লোক জানে এমন বোধ হয় বুদ্ধ, বা মহম্মদ, বা অন্য কারোর নাম জানে না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কেউ জানে না তিনি কেমন দেখতে ছিলেন। অথচ যীশুর ছবি যত আঁকা হয়েছে, আর কোন লোকের ছবি তত নেই, আর সবগুলিই কি মনগড়া! আহা, যদি সত্যিই তাঁর একটা ছবি আজ থাকতো, তাহলে বোধহয় পৃথিবীর সব ধনরত্ন দিয়েও লোকে তা কিনতে পারতো না, এতই তা অমূল্য হতো! যীশুর সবচেয়ে পুরানো যে ছবির কথা আমরা শুনতে পাই, তাও তাঁর মারা যাবার বহু পরে আঁকা। যাঁরা এঁকেছিলেন তাঁরা কখনও যীশুকে স্বচক্ষে দেখেন নি, সুতরাং তাঁদেরও দেখা কল্পনার দেখা।

যীশুর সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান শহর ছিল ইতালির রোম। তাই শীঘ্রই রোমে যত খ্রীষ্টিয়ান গিয়ে জুটলো তত খ্রীষ্টিয়ান, যীশুর নিজের দেশেও ছিলো কিনা সন্দেহ। তখনকার খ্রীষ্টিয়ানরা একটি গুহ্য বা গুপ্ত সম্প্রদায় ছিলেন। তাঁদের লুকিয়ে লুকিয়ে মাটির তলায় থাকতে হতো, কারণ রোমের রাজারা খ্রীষ্টিয়ানদের ভীষণ বিপ্লবী মনে করতেন, আর ধরতে পেলেই নানা রকম যন্ত্রণা, অত্যাচার করে মেরে ফেলতেন। তখনকার দিনে খ্রীষ্টিয়ানরা সত্যিই বিপ্লবের বাণী এনেছিলেন কারণ তারাই তখন খ্রীষ্টিয়ান হতো যারা সর্বহারা, দরিদ্র, নানাভাবে নিপীড়িত, সরকারের অত্যাচারে জর্জরিত।

রোমের খ্রীষ্টিয়ান সমাজ তাই মাটির তলায় লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হতো; মাটির তলায় সুড়ঙ্গ কেটে ছোট ছোট গুহার মত হাজার হাজার ঘর করে। সবই মাটির তলায়। সেসব ঘরে তাঁদের জীবনযাপন, বৈঠক, সাধনভজন হতো। আজকাল যেসব রাজনৈতিক

দলকে সরকার অপছন্দ ক'রে বে-আইনি করে দেন, তারা যেমন লুকিয়ে পড়ে, ধরা দিতে চায় না, ইংরেজিতে তাদের বলে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেছে, অর্থাৎ মাটির তলায় চলে গেছে, খ্রীষ্টিয়ানরাও তেমন সত্যিই মাটির তলায় থাকতেন। এখনকার রাজনৈতিক 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' কথাটা খ্রীষ্টিয়ানদের কাছ থেকে ধার করা। এখানেই তাঁদের কবর দেয়া হতো, দেয়ালের মধ্যে গর্ত কেটে কেটে। এই সব অন্ধকার সঁ্যাতসেঁতে গুহা, যাতে কোন কোন সময়ে শুধু টিম টিম করে প্রদীপ জ্বলতো, তাদের বলতো ক্যাটাকোম। এইসব ক্যাটাকোমের দেয়ালে, ছাতে খ্রীষ্টিয়ানরা খ্রীষ্টের ছবি আঁকতেন। একটা ছবি প্রায়ই আঁকতেন, সেটা 'খ্রীষ্ট শ্রেষ্ঠ মেষপালক', কাঁধে তাঁর একটি মেষশিশু। খ্রীষ্টের মুখ তাঁরা কি করে পেলেন বলো তো? খ্রীষ্টের মুখ তাঁরা একটি গ্রীক দেবতার মুখ থেকে বেমালুম ধার করে নিয়েছিলেন।

আরও যে সব ছবি তাঁর আঁকতেন তাদের অধিকাংশের বিষয় ছিলো, সিংহের গুহায় ড্যানিয়েল, জোনা আর তিমি মাছ, অথবা গ্রীক দেবতা অরফিউস তাঁর বাঁশী বাজিয়ে সব বন্যজন্তুকে মন্ত্রমুগ্ধ করছেন।

কিন্তু এসব ছবির কোনটাই পুরোপুরি ছবি বলতে যা বোঝায় তা ছিলো না। এসব ছিলো অধিকাংশই দেয়াল-ভরানো ব্যাপার কিন্তু এমন চিত্র দিয়ে ভরানো যা খ্রীষ্টিয়ানদের মনে ভক্তির উদ্রেক করে। যেমন তাঁরা অজস্র ক্রৌঞ্চের ছবি আঁকতেন, এই ক্রৌঞ্চ হতো ভগবান বা হোলি গোস্টের প্রতীক, ভগবান এইরূপে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতেন। আজকালও এই ক্রৌঞ্চ পৃথিবীতে সর্বত্র শান্তির প্রতীক। তাঁরা মোরগ আঁকতেন, অর্থাৎ পীটার যখন যীশুর পরিচয় অস্বীকার করেন, তখন যে মোরগ ডেকে উঠেছিলো, সেই মোরগের কথা ভেবে। তাঁরা নোঙরের ছবি আঁকতেন। ঝড়-তুফান যখন ওঠে তখন সমুদ্রে নোঙরই জাহাজকে বাঁচায়, যাতে জাহাজ এলোমেলো ভাবে ছুটে গিয়ে পাথরে ঘা খেয়ে না ডুবে যায়। সুতরাং নোঙর যীশুর রক্ষাকবচের প্রতীক। তাঁরা মাছ আঁকতেন, কারণ গ্রীকভাষায় মাছের যা বানান তার প্রথম দু অক্ষর আর যীশুর নামের দু অক্ষর এক। তাঁরা আঙুর গাছ আঁকতেন, কারণ যীশু বলেছিলেন, 'আমি আঙুর গাছ'। ইত্যাদি।

খ্রীষ্টের মৃত্যুর প্রায় তিন শ বছর পরে, কন্‌স্ট্যান্‌টাইন বলে একটি রোমান সম্রাট সর্বপ্রথম খ্রীষ্টিয়ান হলেন। এই সর্বপ্রথম খ্রীষ্টিয়ান সমাজকে আর মাটির তলায় লুকিয়ে থাকতে হলো না। তাঁরা উপরে এলেন। মাটির উপরে এসে তাঁরা গির্জা বানাতে শুরু করে দিলেন। আর সেই সব গির্জার গা, দেয়াল, ছবি আর মজেইক দিয়ে মুড়ে দিতে শুরু করলেন। তারপর থেকে শুরু হলো হাজার বছর ধরে কেবল বাইব্‌ল থেকে ঘটনা টেনে নিয়ে ছবি আঁকা।

গ্রীকরা যখন স্ত্রীপুরুষের ছবি আঁকতেন তখন তাদের কাপড় পরাতেন না, তাঁরা মনে করতেন মানুষের দেহ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস, তাকে কাপড় দিয়ে ঢাকা অন্যায়। খ্রীষ্টিয়ান শিল্পীরা কিন্তু এটা খুব অপছন্দ করতেন, অশ্লীল ভাবতেন, তাই ছবিতে শরীরের সবটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতেন; শুধু মুখ, হাত, পা বেরিয়ে থাকতো। যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন মুখে স্বর্গীয়, পবিত্র ভাব আনতে, যা শুধুই সুন্দর নয়। প্রায়ই পিছনের দিকটা সোনালি হতো। কখনও কখনও রঙ দিয়ে ছবি না এঁকে, রঙীন পাথরের টুকরো দিয়ে মজেইক্ করা হতো। আস্তর-দেয়া বা প্লাস্টারকরা দেয়ালে ছবি আঁকলে, আস্তর পরে খসে খসে পড়তে পারে, লোনা লাগতে পারে, খোসা ওঠার মত হতে পারে, কিন্তু মজেইক চিরস্থায়ী হয়। গির্জাগুলির মেঝেতে প্রায়ই মজেইক করে ছবি আঁকা হতো, কারণ মজেইকই একমাত্র জিনিস যা অসংখ্য পায়ের ছাপ খেয়েও ঠিক থাকবে, ক্ষয়ে যাবে না, মুছে যাবে না।

কিন্তু প্রথম যুগের খ্রীষ্টিয়ানদের সবচেয়ে বড় চিত্রশিল্প ছিলো বাইব্‌ল্ বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের জন্যে ছোট্ট ছোট্ট নানা রঙীন ছবি আঁকা। এদের মধ্যে কোন কোনটা হয়তো বা ডাকটিকিটের চেয়ে বড় হতো না। সবই আঁকতেন সন্ন্যাসীরা, ধার্মিক পুরুষরা, যারা খ্রীষ্ট ধর্মের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতেন। সব বইই হাতে-লেখা পুঁথি হতো, কারণ তখনও ছাপাখানা আবিষ্কার হয় নি। এইসব ছবিকে বলা হতো উদ্ভাস, ইংরেজিতে ইলিউমিনেশন, সোনার পাতা আর নানা জ্বলজ্বলে রঙ দিয়ে এসব আঁকা হতো, আর সেগুলি গির্জার দেয়াল বা ছাতের বড় বড় ছবির চেয়ে অনেক সুন্দর হতো।

চতুর্থ অধ্যায়

রেনেসাঁসের আগের যুগ

রাখাল শিল্পী

সত্যিকারের বিখ্যাত ছবি, যে ছবি কোন জগদ্বিখ্যাত শিল্পী এঁকেছেন, দেখেছো কি? দেখা মুশকিল, কারণ আমাদের দেশে এ ধরনের ছবি এত কম আছে বলা যায় না। অধিকাংশ ছবিই ইউরোপে বললে ভুল হয় না। তবে আমাদের দেশেই এক বিরাট চিত্রশিল্পী আমাদের পরম সৌভাগ্যবশে এখনও জীবিত আছেন, এই কলকাতাতেই থাকেন, বালিগঞ্জের ১৮ নং ডিহি শ্রীরামপুর লেনে। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে যদি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে বলো, ছবি দেখবো, তাহলে কত আহ্লাদ করে তিনি একের পর এক ছবি দেখিয়ে যাবেন, একটুও বিরক্ত হবেন না। ছবি দেখে মনে হবে কোন রাজার দৌলতখানায় এলুম!

আমরা সাধারণত আসল ছবির ছোট ছোট প্রতিকৃতি দেখি। আর তা দেখাও যা দার্জিলিংএ গিয়ে কাঞ্চনজংঘা স্বচক্ষে না দেখে তার বদলে কাঞ্চনজংঘার ছবি পিক্‌চার পোষ্টকার্ডে দেখাও তা। যারা কাঞ্চনজংঘা দেখেছি তারা পোষ্টকার্ডের ছবি দেখে কিছুটা বুঝতে পারি: যারা আসল বিখ্যাত ছবি দেখেছি তারা ছোট নকল দেখে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু দুটোর মধ্যে তো আসলে আকাশ পাতাল তফাত থেকেই যায়! কীসে আর কিসে! সুতরাং একটা বিখ্যাত ছবির যখন সাদাকালো ছোট্ট ফটো দেখো তখন ছবিটা নিজের আসল রঙে কী অদ্ভুত সুন্দর, তা শুধু কল্পনা করা ছাড়া আর কোনমতেই ভেবে পাওয়া যায় না।

গ্রীক চিত্রকলার আদিপুরুষ কে মনে আছে? পলিগ্নোটাস। পলিগ্নোটাসের দু হাজার বছর পরে ইটালিতে একজন লোক জন্মালেন, তাঁকে ইটালিয়ান চিত্রকলার আদিপুরুষ বলা চলে। তাঁর নাম হচ্ছে চীমাবুয়ে। চীমাবুয়ে ফ্লরেন্সে থাকতেন—ফ্লরেন্স মানে ফুলের শহর।

ইটালি দেশের ঠিক মাঝখানে। তাঁর আঁকা ছবি এখন খুব কমই আছে, আর তার মধ্যে হয়তো দু-একটা তাঁর নামে চললেও সত্যিই তাঁর আঁকা নয়। আর কিছু ছবি এত খারাপ হয়ে গেছে যে দেখে সহসা বোঝা যাবে না, কী জন্যে তাঁর এত নাম।

হয়তো এখন যদি চীমাবুয়ে বেঁচে থাকতেন আর তখন যেমন আঁকছিলেন, সে রকম আঁকতে শুরু করতেন, তাহলে আহা মরি করার কিছু পেতে না। কিন্তু তাঁর কালে তাঁকে সবাই অতি বিরাট শিল্পী বলে মানতো, তার কারণ তাঁর সমসাময়িক শিল্পীদের তুলনায় তিনি ছিলেন বিরাট পুরুষ, তাঁর মত ছবি তাঁর আগে হাজার বছর ধরে কেউ আঁকেনি। প্রবাদ আছে তিনি যখন যীশুর মা কুমারী মেরি, ইংরেজিতে ভর্জিন্ মেরির একটি বড় ছবি শেষ করলেন, ফ্লরেন্সের লোকরা তা দেখে আনন্দে এত আত্মহারা হলো যে তারা একটা শোভাযাত্রা করলো। নানা রকম বাদ্যযন্ত্র, ঢাক ঢোল, পতাকা উড়িয়ে তারা রাজপথে রাজপথে ছবিটি মাথায় করে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ালো, শেষে যে গির্জায় সেটা থাকবে, সেখানে সযত্নে রেখে দিলো।

চীমাবুয়ে আরেকটা ছবি আঁকলেন, এটি একজন মহাপুরুষের ছবি— সেন্ট ফ্রান্সিস। সেন্ট ফ্রান্সিস ছিলেন এক সন্ন্যাসী, মাঙ্ক, পরে সিদ্ধপুরুষ হন। মাঙ্করা সাধুসন্ত লোক, সেবাই তাঁদের ধর্ম। সেন্ট ফ্রান্সিস এক সাধুসঙ্ঘের প্রবর্তন করেন, তার নাম ফ্রান্সিস্কান সংঘ। যাঁরা এই সংঘে যোগ দিতেন তাঁদের প্রতিজ্ঞা করতে হতো যীশুখৃষ্টের মত জীবন যাপন করতে হবে। তাঁদের টাকা পয়সা থাকতে পাবে না, কোন সম্পত্তিই থাকতে পাবে না। তাঁরা বিয়ে করতে পাবেন না। সারাক্ষণ পরের সেবা করতে হবে। শুধু প্রাণধারণের জন্যে সামান্য রুটি আর মাথা গোঁজবার সামান্য কুঁড়ে তাঁরা আশা করতে পারবেন। তাঁদের মাথার চাঁদি কামিয়ে ফেলতে হতো, ব্রহ্মতালুটি একটি ছোট্ট টাকের মত দেখাতো। এটুকু জায়গা কামিয়ে কামিয়ে চকচকে টাকের মত রাখতে হতো, যাতে দেখে লোকে বুঝতে পারে সন্ন্যাসী। এই ছোট্ট কামানো গোল জায়গাটিকে বলে টনসার। খুব মোটা কাপড়ের তৈরী ব্রাউন রঙের মাথার ঘোমটা শুদ্ধ আলখাল্লা পরতে হতো, আলখাল্লাটি কোমরে বাঁধতে হতো একটা মোটা দড়ি দিয়ে, প্রায় কাছি বললেই হয়। মাথার ঘোমটাকে বলতো হুড।

সাবধান করে দিই। ছবিটা যখন দেখবে তখন আশা করা খুব অন্যায় হবে যে এটা খুব 'সুন্দর' ছবি অর্থাৎ সুন্দর লোকের সুন্দর ছবি, যা দেখলেই 'চোখ জুড়িয়ে' যায়। এটা সে রকম ছবি মোটেই নয়। বরং আমার ভয় হচ্ছে, তুমি হয়তো চেঁচিয়ে উঠবে, 'কী বিশ্রী দেখতে একটা বুড়ো!' সেণ্ট ফ্রান্সিসের মাথার চারদিকের যে গোলটি তাকে বলে হেলো বা জ্যোতি। সিদ্ধপুরুষদের ছবি আঁকার সময়ে তাঁদের মাথার চারিদিকে এই হেলো এঁকে দেয়া হতো, এতেই বোঝানো হতো যে তাঁরা সিদ্ধ-পুরুষ। ছবিটা ভাল করে দেখো। হাতে যে দাগগুলি দেখবে, সেগুলি ভুল করে দাগ করে দেয়া নয়। প্রবাদ আছে যে সেণ্ট ফ্রান্সিস এত তদগতভাবে যীশুর ধ্যান করতেন যে এক স্বর্গদূত এসে তাঁর হাতে, পায়ে পেরেক মারার দাগ বসিয়ে দিয়ে গেছলেন, যেমন দাগ পড়েছিলো যীশুকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয় তাঁর হাতে-পায়ে। এই পেরেকের দাগকে বলে ষ্টিগমাটা।

শুধু যে নিজে বিরাট শিল্পী ছিলেন বলেই চীমাবুয়ের খ্যাতি তা নয়। তাঁর নাম নিজের ছবির জন্যে তো বটেই, কিন্তু তাঁর চেয়েও বেশী তিনি এক অতি মহৎ শিল্পীর গুরু ছিলেন বলে। প্রবাদ আছে একদিন চীমাবুয়ে ফ্লরেন্স থেকে অল্প দূরে প্রান্তরে বেড়াচ্ছেন, এমন সময়ে দেখলেন একটি রাখাল ভেড়ার পাল চরাচ্ছে। ভেড়া চড়ছে আর রাখাল একটি শ্লেটে পাথরের টুকরো দিয়ে ভেড়ার ছবি আঁকছে। চীমাবুয়ের কৌতূহল হলো, রাখাল ছেলের ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি মেরে ছবি দেখে তাঁর আর চোখ ফেরে না। নাম জিজ্ঞেস করলেন। ছেলেটি বললো 'জত্তো', আসল নাম অ্যাম্ব্রোজত্তো।

চীমাবুয়ের ভাল লাগলো। জত্তোকে ধরলেন, বললেন, চলো ফ্লরেন্সে যাবে, ছবি আঁকা শিখবে। ছেলেটি মহা খুসী। বাপের কাছে অনুমতি নিয়ে চীমাবুয়ের কাছে চলে গেলো। বড় হয়ে জত্তো যীশুর বহু বিখ্যাত বিখ্যাত ছবি আঁকেন; কুমারী মেরি, সেণ্ট ফ্রান্সিস এঁদের ছবিও আঁকেন। গুরুও সেণ্ট ফ্রান্সিসের ছবি এঁকেছিলেন, তিনিও আঁকলেন।

সেণ্ট ফ্রান্সিস ফ্লরেন্সের কাছে একটি ছোট শহরে থাকতেন, তার নাম অসিজি। তাঁর নামে অসিজিতে একটি গির্জা আছে। আসলে দুটো গির্জা আছে, একটির উপরে আরেকটি। উপরকার গির্জার

দেয়ালগুলিতে সেণ্ট ফ্রান্সিসের জীবন নিয়ে জত্তো একসার ছবি আঁকেন। নানা রকম অলৌকিক কাজের মধ্যে সেণ্ট ফ্রান্সিস একটি কাজ করতেন; পাখীদের মধ্যে ধর্মালোচনা করতেন, আর পাখীর দল উড়ে এসে তাঁর চারদিকে ভিড় করে বসে শুনতো।

আমরা এখন যেসব রঙ ব্যবহার করি, সেকালে সেসব রঙের প্রচলন তখন একেবারেই হয়নি। লোকে সেসব রঙ জানতো না। এখন ছবির রঙ তৈরি হয় রঙীন গুঁড়োর সঙ্গে তেল মিশিয়ে। আমরা বলি তেল-রঙ। শিল্পীরা পাট বা সুতোর চটে, অর্থাৎ ক্যান্‌ভাসে সেই তেল-রঙ দিয়ে আঁকে। কিন্তু জত্তোর যুগে তেল দিয়ে রঙ হতো না, আর ক্যানভাসে কেউ ছবি আঁকতো না। শিল্পীরা তখন রঙের গুঁড়ো জলে মেশাতেন, আর সত্য আস্তর বা প্লাস্টার-করা ভিজে দেয়ালে সেই জল-মেশানো গুঁড়ো রঙ দিয়ে ছবি আঁকতেন। আবার কখনও কখনও রঙের গুঁড়োর সঙ্গে আঠা মেশাতেন, যেমন গঁদ, বা ফলের বিচির কষ, বা ডিম, আর সেই রঙ দিয়ে দেয়ালের শুকনো আস্তর বা প্লাস্টারে ছবি আঁকতেন, অথবা কাঠে, কিংবা তামার পাতে।

প্রথম ধরনের আঁকাকে বলতো ফ্রেস্কো, অর্থাৎ যে ছবি দেয়ালের সত্য-করা ভিজে আস্তর বা প্লাস্টারে জলে-গোলা রঙ দিয়ে আঁকা। ফ্রেস্কো কথাটা ফ্রেশ্‌ থেকে এসেছে, ফ্রেশ মানে সত্য করা। অর্থাৎ যে দেয়ালের নতুন-করা আস্তর এখনও শুকোয়নি। দ্বিতীয় ধরনের আঁকাকে বলতো টেম্পেরা। টেম্পেরা মানে মিশ্রিত, অর্থাৎ নানারকম জিনিস মিশিয়ে আঁকা। আমাদের দেশের যামিনী রায় তাঁর অনেক বিখ্যাত ছবি টেম্পেরায় এঁকেছেন। তাঁর বাড়ীতে অনেক টেম্পেরায় আঁকা ছবি আছে, গিয়ে দেখে এসো।

প্রবাদ আছে ক্যাথলিক ধর্মের সর্বপ্রধান পুরোহিত, যাঁকে বলে পোপ, তাঁর শখ হলো জত্তোকে দিয়ে ছবি আঁকাবেন। লোক পাঠালেন জত্তোর কাছে, তাঁর কাজের নমুনা চেয়ে পাঠিয়ে। জত্তো রঙে তুলি ডুবিয়ে এক টুকরো কাঠে এক টানে নিখুঁত একটি বৃত্ত আঁকলেন, সেটি নমুনা স্বরূপ পোপকে পাঠিয়ে দিলেন। কম্পাস না নিয়ে পেন্সিল দিয়ে নিখুত বৃত্ত আঁকতে পারো? চেষ্টা করে দেখো দেখি? তারপরে তুলি দিয়ে চেষ্টা করো দেখি!

হয়তো পারবে, কিন্তু তবুও তার মানে এ হয় না যে তুমি মহৎ

শিল্পী। কোন জিনিসের উপর কাগজ ফেলে নকল করা সহজ। একটা ছবি দেখে তার উপর কাগজ না ফেলে নকল করাও এমন খুব শক্ত কাজ নয়। বহু লোকেই এক ঝুড়ি ফল দেখে আঁকতে পারে, কিংবা এক ফুলদানি ভর্তি ফুল, কিংবা সমুদ্র বা প্রকৃতির ছবি। সেসব নেহাতই নকল। বহু লোকেই কোন বড় শিল্পীর আঁকা ছবি এমন নিখুঁত ভাবে নকল করতে পারে যা দেখে বলা শক্ত কোনটা আসল, কোনটা নকল। কিন্তু তাতে খুব বাহাদুরি নেই। কিন্তু পৃথিবীতে খুব কম লোকই মাথা থেকে একটা ছবি বার করে আঁকতে পারে, যদিই বা বার করে আঁকে, সেটা ছবি হিসেবে সুন্দর হয়ে উৎরানো আরও শক্ত। তার জন্যে দরকার প্রতিভার।

জভান্নি চীমাবুয়ে বেঁচে ছিলেন ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩০২ সাল পর্যন্ত। দি বন্দন জত্তো জন্মান ১২৭৬ সালে, মারা যান ১৩৩৭ সালে।

দেবদূতের মত ভাই

মাঙ্ক বা সন্ন্যাসীরা যেখানে থাকতেন তাকে বলতো মনাস্টারি, বাংলায় মঠ। মাঙ্কদের বলতো 'ভাই', কারণ তাঁরা ভাইএর মত মিলেমিশে থাকতেন, আর অন্য সকলকে ভাইএর চোখে দেখতেন। কোন কোন জায়গায় সন্ন্যাসিনীরা আলাদা মঠে থাকতেন বা থাকেন, তাঁদের বলে নান্, তাঁদের 'বোন' সম্বোধন করা হতো, এখনও হয়।

ফুলের শহর ফ্লরেন্সে সেণ্ট মার্কস্ বলে একটি মনাস্টারি ছিল। সেণ্টমার্ক বাইব্‌লের নিউ টেস্টামেণ্টের দ্বিতীয় পুস্তক লেখেন, তাঁরই নামে এই মনাস্টারি। এখানে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, অতি সাধু লোক। লোকে তাই তাঁর নাম দিয়েছিলো 'দেবদূতের মত ভাই'। তাঁর ভাষায়, অর্থাৎ ইতালিয়ানে, দেবদূতোপম ভাই। এঁর নাম ছিলো ফ্রা আঞ্জেলিকো; ফ্রা মানে ভাই, আঞ্জেলিকো মানে স্বর্গদূতের মত। একটু অদ্ভুত লাগে ভাবতে যে একজন মাঙ্ক জগদ্বিখ্যাত শিল্পী হলেন, কিন্তু ফ্রা আঞ্জেলিকোর আঁকার হাত, রঙ দেবার হাত ছিলো খুব পাকা, আর সেই হাতে তিনি মনাস্টারির ঘরের দেওয়ালে দেয়ালে বাইব্‌লের ছবি এঁকে যেতেন।

যে সব ঘরে মাঙ্করা শুতেন তাদের বলতো সেল্। ঘরগুলি হতো একেবারে আসবাবপত্রবর্জিত, কোন শৌখিন বা আরামের জিনিস রাখা বারণ, প্রায় জেলখানার ছোট একা থাকার কুঠুরির মত। সেণ্ট মার্কস্ মনাস্টারিতে প্রায় চল্লিশটা এই রকম সেল ছিলো আর ফ্রা আঞ্জেলিকো সারা জীবন ধরে সেই সব সেলের দেয়ালে দেয়ালে ছবি এঁকে কাটালেন, যাতে মাঙ্করা নিজের ঘরে বসে বাইবেলের কাহিনী আঁকা দেখতে পান, আর তারই ধ্যানে সময় কাটান। এই সব ছবি অবশ্য ফ্রেস্কোয় আঁকা। এ ছাড়াও ফ্রা আঞ্জেলিকো কাঠের পাটায় টেম্পেরায় ছবি আঁকতেন, পাটাগুলি এঘর থেকে ওঘরে, এখান থেকে ওখানে নিয়ে যাওয়া যেতো। টেম্পেরা কী মনে আছে তো? ডিম বা গঁদ, বা কষ ধরনের আঠার সঙ্গে রঙ মিশিয়ে, সেই রঙে যে ছবি হয় তাকে বলে টেম্পেরা। টেম্পেরা মানে মেশানো, মিশ্র।

ফ্রা আঞ্জেলিকো জন্মান ইতালির ফিয়েজোল বলে জায়গায়, ১৩৮৭ সালে। মারা যান রোমে, ১৪৫৫ সালে। অর্থাৎ জত্তোর প্রায় একশ বছর পরে তিনি আঁকতে শুরু করেন। কিন্তু এতদিন পরে জন্মেও তিনি জত্তোর প্রভাবমুক্ত হতে পারেন নি। জত্তোর ধাঁচেই প্রায় আঁকতেন। এতই বিরাট শিল্পী ছিলেন জত্তো। যেমন ধরো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাভাষায় এত বিরাট লেখক ছিলেন, যে আন্দাজ করা যায়, এক-শ দু-শ বছর পরেও বাংলাভাষার গদ্য বা কাব্য রীতিতে তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট থাকবে। প্রবাদ আছে কোন ছবি আঁকার আগে ফ্রা আঞ্জেলিকো অনেকক্ষণ ধরে একাগ্র মনে প্রার্থনা করতেন, তারপর ছবি আঁকতে বসতেন। আর যা আঁকতেন তা কখনও মুছতেন না বা বদলাতেন না। যে রেখা বা রঙটি যেমন প্রথম এলো সেটিই রাখতেন। বিশ্বাস করতেন, যে তিনি নিজের ইচ্ছেয় আঁকছেন না, ঈশ্বর তাঁর হাতকে চালিত করছেন, সুতরাং কোন কিছু বদলানো অপরাধ হবে। এত যিনি ধর্মভীরু লোক, বলাই বাহুল্য তিনি ধর্মসম্বন্ধীয় ছবি ছাড়া আর কিছু আঁকেন নি। সে সব ছবি সাধু সিদ্ধপুরুষদের, স্বর্গদূতদের। বলা অবান্তর, যে ছবি আঁকার জন্যে তিনি কখনও কানাকড়িও পাননি।

তখনকার দিনের চিত্রশিল্পীদের একটী বিশেষ বিষয়বস্তু বড় প্রিয়, বড় আরাধনার সামগ্রী ছিল। তাকে বলতো ,অনান্সিয়েশন। জানো

বোধ হয় বাইবলে লেখা আছে, খৃষ্ট জন্মানোর আগে কুমারী মেরির কাছে স্বর্গদূত এসে বলেন যে তাঁর গর্ভে যে ছেলে হবে, তিনি যীশুখ্রীষ্ট, সাক্ষাৎ ঈশ্বরপুত্র। একে বলে অনান্সিয়েশন্—অর্থাৎ মেরিকে প্রকাশ করে বলা (ইংরেজিতে 'অনাউন্স' করা) যে তিনি ভগবান যীশুর মা হবেন। ফ্রা আঞ্জেলিকো অনান্সিয়েশনেরও একটি ছবি আঁকেন, সেটি এখনও বর্তমান। এত সুন্দর, পবিত্র, ধর্মভাবভরা ছবি খুব কমই আছে। ছবিতে কুমারী মেরি তাঁর বাড়ীর বাইরের ঢাকা বারান্দায় একটা টুলে বসে আছেন, হাতদুটি বুকে ভাঁজ করা। স্বর্গ থেকে নেমে একটি স্বর্গদূত মেরিকে জানাচ্ছে যে তাঁর গর্ভে ভগবান জন্ম নেবেন।

সেণ্ট মার্কসের মাঙ্কদের মধ্যে একটা নিয়ম ছিলো যে বিশেষ একটি সময় ছাড়া পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা চলবে না। প্রায় সর্বদাই সবাইকে মুখ বুজে কাটাতে হতো। গান্ধীজি সপ্তাহে একদিন কথা না বলে থাকতেন। ভেবে দেখো একটা পুরো দিন তুমি কথা না বলে আছো, এমন কি, এক ঘণ্টা কথা না বলে আছো, অথচ আশেপাশে কথা বলার লোক রয়েছে। নিজে থেকে কথা না বলো সে এক হয়, কিন্তু অপরের বারণে কথা বলতে না হলে! কিছুদিন আগে আমার এক বিশেষ বন্ধু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এমনিতে তিনি যে খুব কথা বলেন তা নয়, হাসপাতালে বিশেষ বন্ধুও হয়নি। কিন্তু একবার ডাক্তার হুকুম দিলেন পনেরো ঘণ্টা তাঁকে কথা না বলে থাকতে হবে, কিসের একটা পরীক্ষা হবে তাঁর রক্ত নিয়ে। মৌন ভাঙার পরের দিন তিনি আমাকে চিঠি লিখলেন যে চুপ করে থাকার কষ্ট থেকে তিনি তখনও সামলে ওঠেন নি! হাসপাতালের বন্ধুটি হয়তো চুপ করে আমাদের কথা ভাবছিলেন, কিন্তু মনাস্টারিতে চুপ করে থাকার নিয়ম ছিলো এই উদ্দেশ্যে যে মাঙ্করা মুখ বুজে ভগবানের চিন্তা করবেন, ধর্মচিন্তা করবেন, বৃথা গালগল্প করে আত্মার অবমাননা করবেন না। সেই কথাটা বোঝাবার জন্যে ফ্রা আঞ্জেলিকো করলেন কি মনাস্টারির একটা বড় দরজার উপরে সেণ্ট পীটরের ছবি আঁকলেন, তাঁর ঠোঁটে তর্জনী রাখা, অর্থাৎ মাঙ্কদের অহরহ মনে করিয়ে দেয়া যে কথা বলা বারণ।

সেণ্ট মার্কের মনাস্টারিকে ফ্রা আঞ্জেলিকোর চিত্রশালা করে

সযত্নে রাখা হয়েছে। এতে তাঁর টেম্পেরায় আঁকা সরানো-নড়ানো-যায় ছবিগুলিও আছে, আর সেলের দেয়ালের ফ্রেস্কোগুলিও আছে। এই মনাস্টারিতেই ফ্রা আঞ্জেলিকোর একটি টেম্পেরা ছবি আছে, তার বিষয় হচ্ছে শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে কুমারী মেরি বসে আছেন। এই অবস্থায় আঁকা কুমারী মেরিকে ইংরেজিতে বলে 'মাই লেডি', ইতালিয়ানে বলে 'মাদোনা'। ফ্রা আঞ্জেলিকোর ছবিটির তাই নাম 'মাদোনা'।

শত শত বছর ধরে হাজার হাজার 'মাদোনা' আঁকা হয়েছে। মা আর শিশুকে আঁকার যে চিরন্তন ইচ্ছে তা বোধ হয় এই মাদোনা আঁকার মধ্যে দিয়ে শিল্পীরা মেটান। বললে অত্যুক্তি হয়না, এমন কোন শিল্পী নেই যিনি এক বা একাধিক 'মাদোনা' আঁকেন নি। আমাদের দেশের যামিনী রায় বিখ্যাত বিখ্যাত কয়েকটি 'মাদোনা' এঁকেছেন। প্রত্যেক গির্জাতে একাধিক 'মাদোনা' থাকতেই হবে। ছাপা ছবি কেনার পয়সা আছে এমন পরিবার মাত্রেই একটি করে মা-শিশুর ছবি কেনে, যেমন একটু পয়সা থাকলেই লোকে ঘরে একটা রামায়ণ রাখে, খ্রীষ্টিয়ানরা রাখে বাইবেল্।

ফ্রা আঞ্জেলিকো যে 'মাদোনা' এঁকেছিলেন তার একটি চওড়া সোনালি ফ্রেম আছে। সাধারণ ফ্রেম ফ্রেমই মাত্র হয়, তার নিজস্ব কোন বিশেষ সৌন্দর্য থাকে না, সে একটা বেড়া, যা দিয়ে একটা ছবি দেয়াল থেকে, বা দেয়ালের অন্যান্য জিনিস থেকে আলাদা করে রাখা হয়। কিন্তু এই ফ্রেমটির বৈশিষ্ট্য আছে। এতে ফ্রা আঞ্জেলিকো বারোটি স্বর্গদূত চারধারে আঁকেন, বারোটি স্বর্গদূত বারোরকম বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। অনেকটা উড়িষ্যার কোণার্ক মন্দিরের ছাতে সুরসুন্দরীদের মত। এই 'মাদোনা'টির হাজারোরকমের ছোট-বড় ছাপা ছবি, পিক্‌চার পোস্টকার্ড আছে। হয়তো তোমাদের কাছেও একটা আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ছোট রনেসাঁস

আবার জন্মানো শিল্পীরা

মনে আছে বোধ হয় পুরাকালের ঈজিপ্‌শানরা বিশ্বাস করতো মরে যাওয়ার হাজার বছর পরে আবার তারা বেঁচে উঠবে। বেচারীরা অবশ্য কোনও দিন বেঁচে উঠলো না। পুরাকালের গ্রীকরা কিন্তু পুনর্জন্মে বিশেষ বিশ্বাস করতো না। কিন্তু বড় বড় গ্রীক শিল্পীরা মারা যাবার হাজার দুয়েক বছর পরে ইটালিতে এমন সব দিক্‌পাল শিল্পীর দল এক এক করে জন্মাতে লাগলেন যে, মনে হলো পুরানো গ্রীক শিল্পীরা এক এক করে ইতালিতে পুনর্জন্ম নিলেন। তাই আমরা ইতালির এই স্বর্ণযুগকে বলি 'আবার জন্মানোর' যুগ অর্থাৎ পুনর্জন্মের যুগ, তার ইওরোপীয় ভাষায় গাল ভরা নাম, রনেসাঁস্, মানে, আবার জন্মেছে।

এই আবার-জন্মানো যুগের প্রথম, সবচেয়ে বড় শিল্পীর একটা বড় বাজে ছেলেমানুষি নাম ছিলো। দুঃখের বিষয় এই নামেই জগতে তিনি পরিচিত হলেন, এই নামই তাঁর কাজে লেগে থাকলো, ভাল, নাম কপালে জুটলো না। ঠিক যেমন এক-একজন লোক বুড়ো বয়স অবধি ডাকনামেই পরিচিত থেকে যান, পোশাকি নাম শেষ পর্যন্ত লোক ভাল করে জানতে পায়না। আজ পর্য্যন্ত তাঁর ভাল নাম লোকে জানে না, অথচ তিনি ছিলেন এক বিরাট শিল্পী, ডাক নাম মাজাচ্চো। আমাদের কানে নামটা হয়তো খারাপ ঠেকবে না, কিন্তু ইতালিয়ানে এর মানে নোংরা পাঁচু। ফ্লরেন্সের কাছে ১৪০১ সালে মাজাচ্চো জন্মান। কবে মারা যান ঠিক জানা নেই।

মাজাচ্চো খুব গরীব ছিলেন—গরীব বলেই বোধ হয় নোংরা ছিলেন—আর অল্প বয়সে মারা যান। যখন মারা যান তখনও যেমন গরীব তেমনি নোংরা। যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন কেউ তাঁকে

বেশী পছন্দ করতো না, তাঁর আঁকা ছবিও ভাল বলতো না। কেউ কেউ বলে তাঁর শত্রুরা তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরেছিলো। কিন্তু মারা যাবার পরে লোক ধন্য ধন্য করতে লাগলো। বড় বড় শিল্পীরা তাঁর নামে অজ্ঞান হয়ে, যেখানে তাঁর ছবি পাওয়া যায়, তীর্থ-যাত্রার মত করে সেখানে ভিড় করে যেতেন, আর তাঁর ছবি নকল করতেন।

যে কারণে শিল্পীরা মাজাচ্চোর ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন আর নকল করতেন সেটা হচ্ছে মাজাচ্চো ছবিতে এমন একটি রীতির প্রবর্তন করেন যা তাঁর আগে আর কেউ করেনি। মাজাচ্চোর ছবিতে সর্বপ্রথম ভাল করে সমুখ-পিছন এলো। অর্থাৎ তাঁর ছবির সবকিছু সমুখদিকে একসারে ভিড় করে সমান বা ফ্ল্যাট হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। ছবির মধ্যেই সমুখে পিছনে, কাছে, দূরে হয়ে আছে, যাতে অনুমান হয় তাদের মধ্যে পরস্পরের দূরত্ব বা ব্যবধান কতো। অর্থাৎ ছবিতে সমুখ থেকে পিছনের দিকে যাতে দৃষ্টি চলে। মনে আছে কি! ছবির ভাষায় এই গুণকে আমরা কি বলি? বলি পরিপ্রেক্ষিত, ইংরাজিতে পরস্পেক্টিভ্।

হাজার হাজার বছর ধরে চিত্রশিল্পীরা ছবিতে কি করে পরস্পেকটিভ্ আনা যায় তারই সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ঘুরেছে কিন্তু সফল হয়নি। তাই রনেসাঁস শিল্পীরা পাগল হয়ে ছুটলেন দেখতে মাজাচ্চো কী করে অসাধ্য সাধন করলেন। মাজাচ্চোর একটি বিখ্যাত ছবি আছে, ঈডেন উদ্যান থেকে একজন স্বর্গদূত অ্যাডাম আর ঈভকে বার করে দিচ্ছেন।

মাজাচ্চোর প্রায় সব ছবিই ফ্রেস্কো, অর্থাৎ সদ্য-আস্তর-দেয়া দেয়ালে জলে-গোলা রঙ দিয়ে আঁকা ছবি। মাজাচ্চোর খুব ভক্ত এক ছাত্র জুটলেন, তিনি একজন মাঙ্ক, নাম ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পি। ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পি ইতালির ফিরেঞ্জেতে জন্মান অনুমান ১৪০৬ সালে, মারা যান স্পলেতোতে ১৪৬৯ সালে। ভাই ফিলিপ্পো কিন্তু আঞ্জেলিকোর মত ধর্ম্মভীরু, সাধু মোটেই ছিলেন না। 'ভাই ফিলিপ্পো' ভাল শিল্পী ছিলেন, কিন্তু দুষ্টু 'ভাই' ছিলেন। প্রবাদ আছে, মনাস্টারিতে থেকে থেকে তাঁর মনটা অল্পদিনেই হাঁপিয়ে উঠলো, ভাল হওয়া তাঁর ধাতে সইলো না। তাই তিনি আশ্রম থেকে পিট্টান দিলেন। নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার পর

তাঁকে বোম্বেটেরা বন্দী করে ক্রীতদাস করে চালান দিলো। ক্রীতদাস থাকার সময়ে একদিন এক টুকরো কাঠকয়লা দিয়ে তাঁর মনিবের এমন সুন্দর ছবি আঁকলেন যে, খুসি হয়ে মনিব তাঁকে মুক্তি দিলেন।

ভাই ফিলিপ্পো ইতালিতে ফিরে এসে এক সন্ন্যাসিনীদের মঠে, ইংরাজিতে বলে কন্‌ভেন্ট, 'মাদোনার' ছবি আঁকার বরাত পেলেন। খ্রীষ্টিয়ান সন্ন্যাসীদের বলে মাঙ্ক, আর সন্ন্যাসিনীদের বলে 'নান্'। নান্‌রা কন্‌ভেণ্টে থাকেন।

এই কন্‌ভেণ্টের একটি অল্পবয়স্ক অতিসুন্দরী নান্, ফিলিপ্পোর মাদোনার জন্যে মড‌ল্ বা আদল হলেন। মাঙ্ক আর নানের কঠোর নিয়মই হচ্ছে কেউ কোন মানুষের প্রেমে পড়তে পারবেন না। কিন্তু যা করা একান্ত বারণ ফিলিপ্পো তাই করলেন, অর্থাৎ নান্‌টিকে ভালবাসলেন আর প্রেম নিবেদন করলেন। তার পর সব নিয়ম জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁরা দুজনে পালিয়ে গেলেন। তাঁদের একটি ছেলে হলো, তার নাম তাঁরা রাখলেন ফিলিপ্পিনো, অর্থাৎ ছোট ফিলিপ্পো। ফিলিপ্পিনো কালে খুব বড় চিত্রশিল্পী হয়েছিলেন, এমনকি বাপের চেয়ে বড় হয়েছিলেন।

এই সময়ে আর একজন শিল্পীর নাম, একটা নাম না, দুটো বললেই হয়, কারণ দুটো নামেই কথাটা কবিতার মিলের মত শোনায়—তাঁর নাম ছিলো বেনজ্‌জো গজ্‌জোলি। বেনজ্‌জো গজ্‌জোলি ইতালির ফিরেঞ্জেতে ১৪২০ সালে জন্মান, আর ইতালিতেই মারা যান ১৪৯৮ সালে।

পিজার বিখ্যাত মিনারের কথা নিশ্চয় মনে আছে, যে মিনারটা সবসময়ে একপাশে হেলে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনও সোজা হয় না। অদ্ভুত মিনার বটে। পিজায় আরেকটি অদ্ভুত জিনিস আছে। সেটা হচ্ছে একটি কবরখানা। এই কবরখানার অদ্ভুত কাণ্ড যেটা, তা হচ্ছে যে এখানকার সমস্ত মাটি জেরুসালেম থেকে বয়ে আনা। উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে জেরুসালেমে যীশুখৃষ্ট বেঁচে ছিলেন, সেখানকার মাটি নিশ্চয় তাঁর পদচিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে, সুতরাং সেখানকার মাটি এনে সেই মাটিতে লোককে কবর দিলে নিশ্চয় খুব বেশী পুণ্য হবে। জেরুসালেম থেকে তাই তিপ্পান্নটা জাহাজভর্তি

এই মাটি বয়ে নিয়ে এসে কবরখানা ভরাট করা হয়েছিলো। এই কবরখানার তাই ইতালিয়ান নাম কাম্পো সান্তো। কাম্পো মানে মাঠ, সান্তো মানে পবিত্র।

কাম্পো সান্তোর চারদিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা, আর এই দেয়ালের ভিতরদিকের গায়ে বেনজ্‌জো গজ্‌জোলি বাইব্‌লের ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে কাহিনী একে একে আঁকলেন—নোয়া আর তাঁর নৌকার গল্প, বেবেল-মিনার, ডেভিড, সলোমন এদের সব ছবি—সবশুদ্ধ বাইশটা ছবি। প্রত্যেকটি ছবিই খুব লোকজনের ভিড় দিয়ে ভরাট করে আঁকা, ছবির পিছনে বাড়ীঘরও আঁকা। ছবির পিছন দিকটার জন্যে (মনে রেখো উল্টো দিকটা নয়) আমরা সচরাচর একটি ইংরাজি কথা ধার করে ব্যবহার করি, তা হচ্ছে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড।

বেনজ্‌জো গজ্‌জোলি বা রনেসাঁসের শিল্পীরা বাইব্‌ল থেকে যে সব কাহিনী নিয়ে ছবি আঁকতেন, তাঁদের ছবির লোকজনদের তাঁরা বাইব্‌লের যুগের কাপড় পোশাক পরাতেন না, নিজেদের যুগের কাপড় পোশাক পরাতেন। তেমনি ছবির বাড়ীঘরদোর বাইব্‌লের যুগের বাড়ীঘরদোরের মত হতো না। শিল্পীরা কখনও বাইব্‌লের দেশে যাননি, বাইব্‌লের সময়ে লোকজন পোশাক জামা কাপড় কিরকম পরতো তাও জানতেন না, সুতরাং তাঁরা বাইব্‌লের ছবিতেও নিজেদের দেশের বাড়ীঘরদোর, নিজেদের সমাজের কাপড় পোশাক বেমালুম লাগিয়ে দিতেন।

তা হলে রনেসাঁস বা আবার-জন্মানো যুগের প্রথম শতকের তিন জন বড় শিল্পীর কথা আরেকবার ঝালিয়ে নেয়া যাক। ১৪০০ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ রনেসাঁসের প্রথম যুগ। পুরাকালের গ্রীকদের সঙ্গে তাদের কি সম্বন্ধ এখনও হয়তো তেমন তোমাদের কাছে তা স্পষ্ট হলো না (খুব যে একটা বেশী সম্বন্ধ আছে তা নয়, তবুও লোকে ইতিহাসের একটা স্বর্ণযুগের নজির টানতে পারলে মনে জোর পায়, মনে করে ইতিহাস আবার জন্মালো); কিন্তু নামগুলি মনে রেখো—নোংরা পাঁচু বা মাজাচ্চো, তুষ্টু ভাই বা ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পি, আর কবরখানার শিল্পী বেনজজো গজ্‌জোলি। তাঁরা তিন জনেই কলম্বাস এমেরিকা আবিষ্কার করার আগে কাজ করে গেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বড় রনেসাঁস

পাপ আর প্রচার

১৪৯২ সালটা প্রত্যেক ছেলেমেয়েকেই মুখস্থ করতে হয়। ঐ সালে কলম্বাস এমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। কলম্বাস ইতালিয়ান ছিলেন, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে তার দেশের লোকের খুব উৎসাহ ছিলো না। তাদের তখন উৎসাহ দুটি জিনিসে। প্রথমত কি করে ভাল খেয়ে পরে নবাবি করে থাকা যায়। দ্বিতীয়ত শিল্পকলায়। গ্রীসের জ্ঞান বিজ্ঞান ললিতকলায় তখন বিশেষ উৎসাহ—নতুন আরেকটা দেশ আবিষ্কার করে কী হবে! এই সময়টা, অর্থাৎ ১৪৯২ সাল নাগাদ যে যুগ আরম্ভ হলো শিল্পজগতে তাকে বড় রনেসাঁসের যুগ বলা যায়। তোমরা যখন বড় হবে তখন একটা বিখ্যাত বই পড়বে, তাতে এই যুগ সম্বন্ধে সব কথা ভাল করে জানতে পারবে। বইটার নাম 'দা সিভিলাইজেশন্ অফ দা রনেসাঁস ইন্ ইটালি'। লেখকের নাম জেকব বুর্খার্ট। বইটি প্রথম বেরোয় ১৮৬০ সালে। এখনও এটি অদ্বিতীয়। আরেকটি মনোমুগ্ধকর বই আছে, সেটি ইতালিয়ান শিল্পী বেনভেনুতো চেল্লিনির আত্মজীবনী ('দা লাইফ অভ বেনভেনুতো চেল্লিনি রিটন্ বাই হিমসেল্‌ফ')। ইনি ফ্লরেন্সে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে জন্মান আর ফ্লরেন্সেই ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁর বইয়ে তাঁর সময়ের সমস্ত ঘটনার খুব সরস বর্ণনা আছে। আরেকটি বিরাট গ্রন্থ আছে, তোমাদের পড়তে ভাল লাগবে। জর্জো ভাসারি বলে একজন চিত্রশিল্পী আর স্থপতি ছিলেন। তিনি ১৫১২ সালে জন্মান, ১৫৭৪ সালে মারা যান। চেল্লিনির সমসাময়িক, যদিও দুজনের খুব সদ্ভাব ছিলো না। তিনি কয়েকখণ্ডে এক বিরাট বই লেখেন তার নাম চিত্রশিল্পীদের জীবনী। এই বইয়ে রনেসাঁসের

প্রথম যুগের সব শিল্পীদের, বড় রনেসাঁস যুগের শিল্পীদেরও বিবরণী আছে।

হাতের কাছে যদি গ্লোব থাকে তাতে ইতালি দেশটা খুঁজে বার করো দেখি। ছোট্ট দেশ, ভূমধ্যসাগরে যেন একটা কড়ে আঙুল ঢুকে গেছে মনে হবে। অথচ এই ছোট্ট কড়ে-আঙুলে দেশটি যেসব শিল্পীর জন্ম দিয়েছে তার তুলনা পৃথিবীতে মেলা ভার। আমরা তাঁদের দিক্‌পাল বা ওল্ড মাস্টার্স বলি। ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে সব কটি বড় শিল্পীই একে একে কয়েক বছরের মধ্যে ইতালির ওই কয়েকমাইল জায়গার মধ্যে জন্মেছেন, কাজ করে গেছেন। একটা কারণ হতে পারে যে ইতালি তখন খৃষ্টধর্মের কেন্দ্র ছিলো, আর এই সময় পর্যন্ত ইতালিয়ান শিল্পীরা শুধু ধর্মসম্বন্ধীয় ছবিই আঁকতেন।

বাইব্‌লের কাহিনী না এঁকে অন্য বিষয়ে প্রায় প্রথম যিনি আঁকতে আরম্ভ করলেন তাঁর নাম বতিচেল্লি। আলেসান্দ্রো দি মারিয়ানো বতিচেল্লি ফিরেঞ্জেতে জন্মান ১৪৪৪ সালে আর সেখানেই মারা যান ১৫১০ সালে। বতিচেল্লি অবশ্য ধর্মবিষয়ক ছবিও আঁকতেন, কিন্তু তাঁর বেশী ভাল লাগতো গ্রীক দেব-দেবীর ছবি আঁকতে, কল্পনা থেকে আঁকতে, কারণ আগেই বলেছি রনেসাঁস যুগে লোকের যা কিছু গ্রীক তার সম্বন্ধে ছিলো অসীম আগ্রহ। বতিচেল্লির নিজস্ব এক অদ্ভুত ধরন ছিলো। তাঁর আঁকা স্ত্রী-পুরুষ দেখলেই বোঝা যায় বতিচেল্লির আঁকা। কবি বিষ্ণু দের একটি বিখ্যাত লাইন আছে—'মুখের ছাঁচ বতিচেল্লি ঘোর'। বতিচেল্লির আঁকা মেয়েরা সাধারণত খুব তন্বী, লম্বা লম্বা কমনীয় পা, আর দেখতে এত হাল্কা, মনে হয় যেন মাটির উপর পা না ফেলেই ঘুরে ফিরে নেচে বা ভেসে বেড়াচ্ছে, ভারী হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, বা আমাদের মত চলছে না। তাদের পরনে খুব পাতলা, প্রায় স্বচ্ছ, জালের মত গাউন, ঠিক যেন মাকড়সার জালের ওড়না, সমস্ত শরীর দেখা যায়, যেন গায়ে কিছু নেই। (এই সময়ে বাংলা দেশের ঢাকা থেকে ইতালিতে বিখ্যাত হাল্কা পাতলা মসলিন প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতো, ইতালিয়ানরা এই মসলিনের খুব তারিফ করতো। ইতালির পাভুয়াতে বিখ্যাত অতি মিহি রেশমের

কাপড় তৈরি হতো, তার নাম ছিলো 'পাছুয়ানয়' ; ইতালিয়ান 'সঙ্ক' মানে সিল্ক, পাছুয়ার সিল্ক)। একটি বিখ্যাত ছবি আছে তার নাম 'দি এ্যালেগরি অভ্ স্প্রিং' বা বসন্তোপাখ্যান।

ঠিক এই সময়ে ফ্লরেন্সে এক মাঙ্ক ছিলেন, তাঁর নাম সাভোনারোলা। অনেকে তাঁকে পাগল বলতো। তবে তিনি এত দৃপ্তিমান প্রচারক ছিলেন, যে, যে তাঁর কথা শুনতো সেই তাঁর কথায় উঠতো বসতো, যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে দিতেন। ফ্লরেন্সের অধিকাংশ লোকই তখন বিলাসব্যসনে মত্ত, দুষ্টুও কম ছিলো না। সারাক্ষণ আমোদ প্রমোদ হলেই যেন হলো। সাভোনারোলা যতরকম পাপের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রচার করতেন, আর বলতেন যারা তাদের পাপের জন্যে অনুতপ্ত নয় তাদের মৃত্যু অবধারিত। জুয়াখেলা, তাসখেলা, মুখে রঙ মাখা, গহনা পরা, নাচানাচি করা, গান গেয়ে বেড়ানো, অধার্মিক বই বা ছবি আঁকা সবের বিরুদ্ধেই তিনি জেহাদ চালালেন। শেষে ফ্লরেন্সবাসীর টনক নড়লো। একদিন করলো কি, যার যা ছিলো, বিলাসব্যসনের জিনিস, গহনা, শখের জিনিস, তাসপাসা, খারাপ বই, সব নিয়ে এসে বাজারের মধ্যে খোলা চাতালে ঢেলে জড়ো করলো আর তাতে ধরিয়ে দিলো আগুন। আগুন উঁচুতে লাফিয়ে উঠলো তিন তলার সমান। অনেক খারাপ জিনিসই পুড়ে ছাই হলো, যা অনেক আগেই পোড়ানো উচিত ছিলো। মাঝে মাঝে এরকম করা মন্দ নয়। আমরা বাড়ীতে কত জঞ্জালই তো মায়া করে জমিয়ে রাখি, বছরে একদিন শীতের সময়ে সে সব জড়ো করে পুড়িয়ে দিয়ে আগুন পোহালে বোধহয় ভালই লাগবে।

সাভোনারোলার বাণী বতিচেল্লিও শুনেছিলেন। তাঁর মনে ধিক্কার এলো। তিনি কিনা ধর্মবিষয়ক ছবি বেশী না এঁকে গ্রীক দেব-দেবীর ছবি, খৃষ্টিয়ান হয়ে পৌত্তলিকদের দেবদেবীর ছবি আঁকছেন! কত পাপ তিনি করেছেন, এই ভেবে শিউরে উঠলেন। তার পর আর কি! বাজারের সেই অগ্নি-উৎসবে যে সব ছবি ধর্মবিষয়ক নয় সেগুলি তিনি একে একে এনে ঢেলে দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি তখনও একেবারে লোপ পায়নি। আগুনের জিভ থেকে অনেকগুলি ছবি তাঁর বন্ধুবান্ধবরা শশব্যস্তে উদ্ধার করলেন, কিন্তু কয়েকটি পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। তবে

বত্তিচেল্লির শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে অর্থাৎ চিত্রাগারে রক্ষিত আছে। মহৎ লোকদের চিহ্নই এই, তাঁরা নিজের কাজকে মুহূর্তের মধ্যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন না।

বত্তিচেল্লির একটি ছবি বইয়ে দিলুম। এটি একটি 'মাদোনা'। এটা একটা গোল ছবি, চৌকো নয়। খানিকটা আমাদের দেশের বিষ্ণুপুরী তাসের মতো। এইরকম গোল ছবিকে ইতালিয়ানে তন্দো বলে, তার মানে গোল।

এই ছবিটার নাম 'দা মাদোনা অভ্ দা করোনেশন', কারণ ছবিতে দুটি স্বর্গদূত মেরির মাথায় মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে, মেরি 'স্বর্গের রানী' হলেন। মেরি খাতায় একটা গান লিখছেন, শিশু যীশু যেন তাঁর হাত ধরে লিখিয়ে দিচ্ছেন। যে-গানটির ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি গির্জায় গাওয়া হয়, তার ল্যাটিন নাম ম্যাগ্নিফিকাট, সেই সূত্রে ছবি-টাকে মাঝে মাঝে 'দা ম্যাগ্নিফিকাট' বলে উল্লেখ করা হয়। পৃথিবীর সব নারীর মধ্যে একমাত্র মেরিই যীশুর মা হলেন বলে ঈশ্বরকে বন্দনা করে এই গানটির রচনা।

যে-ছেলেটি দোয়াত ধরে আছে আর যেটি খাতা ধরে আছে তারা কাল্পনিক নয়। তারা অবশ্য যীশুর সময়ের নয়, বত্তিচেল্লির সময়ের। ভাবতে মজা লাগে যে এইসব দিক্‌পাল শিল্পীরা তাঁদের ছবিতে জীবিত লোকের ছবি ঢুকিয়ে দিতেন। দুটি ছেলেই বড়ো হয়ে 'পোপ' হয়েছিলো, অর্থাৎ ক্যাথলিক ধর্মসমাজে সর্বপ্রধান ধর্মযাজক হয়েছিলো।

সাভোনারোলা সকলকে এতো গালমন্দ করতেন যে শেষকালে লোকে তাঁর ওপর ক্ষেপে গেলো। এমনকি তাঁর অনুচররাও তাঁর ওপর বিগড়ে গেলো। শেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করে, বাজারে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দিয়ে দিলো। ফাঁসি দিয়েও শান্তি নেই, লাসটাকে খাটুলিতে বেঁধে পোড়ালো (খৃষ্টিয়ানদের পোড়াতে নেই, কবর দিতে হয়, তা না হলে শেষ বিচারের দিন তারা উঠবে কি করে?) তাতেও শান্তি নেই; রেগে গিয়ে, শবপোড়া ছাই নদীতে নিয়ে গিয়ে দিলো জলে ফেলে। কিছুদিন আগে ইতালিয়ানরা মুসোলিনিরও প্রায় একই দশা করেছে।

বতিচেল্লির মত, ফ্লরেন্সে আর একটি যুবক শিল্পী ছিলেন। তাঁর পুরো নাম ভেমেত্তো বার্তোলোমেও। কবে জন্মান ঠিক জানা নেই। মারা যান ফ্লরেন্সে ১৫১৭ সালে। তিনিও বতিচেল্লির মত, সাভোনারোলার কথা শুনে, যে সব ছবি ধর্মবিষয়ক নয় সেগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। সাভোনারোলার পরিণাম দেখে তিনি মনে এতো আঘাত পেলেন, যে সংসারত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসী বা মাঙ্ক হয়ে গেলেন। নতুন নাম নিলেন ফ্রা বার্তোলোমেও, ভাই বার্তোলোমেও, সাভানোরোলা যে মনাস্টারিতে থাকতেন সেখানে গিয়ে ভর্তি হলেন। একই মনাস্টারি, অর্থাৎ ফ্লরেন্সের সেণ্ট মার্ক্সে, বহুদিন আগে ফ্রা আঞ্জেলিকোও ছিলেন, মনে আছে বোধ হয়। মাঙ্ক হবার পর ছয় বছর পর্যন্ত ফ্রা বার্তোলোমেও হাতে তুলি ধরেন নি। শুধু বিড়বিড় করে প্রার্থনা করতেন। শেষকালে মঠের সকলে অনুনয় বিনয় করে তাঁকে আবার ছবি আঁকা ধরালো। তখন তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকলেন। সবই অবশ্য ধর্মবিষয়ক। একটা ছবি এঁকেছিলেন সেটা সেণ্ট সিব্যাষ্টিয়ানের। খৃষ্টিয়ান ছিলেন বলে সেণ্ট সিব্যাষ্টিয়ানকে খৃষ্টধর্মের প্রথম যুগে তীরবিদ্ধ করে মারা হয়। ফ্রা বার্তালোমেও সেণ্ট সিব্যাষ্টিয়ানের যে ছবি আঁকলেন, তা নগ্নদেহ, সারা গা তীরে ভর্তি। অন্য মাঙ্কদের এটা পছন্দ হলো না। নগ্ন গা, সে আবার কি? বড় অশ্লীল। ছবিটা মনাস্টারি থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো।

ফ্রা বার্তোলোমেও তাঁর আরাধ্য সাভোনারোলার একটি ছবি আঁকেন। সাভোনারোলা দেখতে মোটেই সুশ্রী ছিলেন না। উল্টে খুব কুৎসিতই বলা চলে, প্রকাণ্ড নাক, দেখতে মোটে ভাল নয়। তাঁর শত্রুরা তাঁর কুরূপ নিয়ে ঠাট্টা করতো। কিন্তু ফ্রা বার্তোলোমেও তাঁর যা ছবি আঁকলেন তাতে এই প্রমাণ হয় যে ছবি 'সুন্দর' না হলেও মহৎ হতে পারে। ফ্রা বার্তোলোমেও সাভোনারোলার মুখাবয়ব একটুও বদলাননি, একটুও 'সুন্দর' করার চেষ্টা করেননি। সাভোনারোলাকে সুপুরুষ করতে যাননি। যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি প্রতিকৃতি আঁকলেন। কিন্তু ছবিটা মহৎ হলো এই কারণে যে তাতে ফুটে উঠলো এমন একজনের মুখ, যিনি, যা সত্য বলে একবার জেনেছেন, তাকে আশ্রয় করতে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করতে পরাঙ্মুখ হননি।

যখন স্ত্রী বা পুরুষ আঁকতে হয় তখন অধিকাংশ শিল্পীই সত্যিকারের স্ত্রী বা পুরুষকে সামনে নানা ভঙ্গীতে বসিয়ে বা দাঁড়িয়ে, দেখে দেখে আঁকেন। আমরা তাদের বলি মড্‌ল্। ফ্রা বার্তোলোমেও তো মাঙ্ক ছিলেন, সুতরাং জীবন্ত স্ত্রী বা পুরুষ মড্‌ল্ হিসেবে ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই তিনি করতেন কি, গাঁটে গাঁটে কব্জা দেয়া কাঠের এক বড় পুতুল করিয়ে তাকে কাপড়চোপড় পরিয়ে নানা ভঙ্গীতে বসাতেন, দাঁড় করাতেন, শোয়াতেন, আর তাই দেখে আন্দাজ করে আঁকতেন। এই রকম কাঠের পুতুলকে শিল্পীরা বলেন 'লে-ফিগর'।

ফ্রা বার্তোলোমেওই সর্বপ্রথম 'মাদোনা'-বিষয়ক ছবির পাদদেশে শিশু স্বর্গদূত এঁকে বসিয়েছিলেন। তাঁর পরের শিল্পীদের এই নতুনত্বটি খুব পছন্দ হলো, এনতার নকল করতে লেগে গেলেন। র‍্যাফেইল তাঁর 'সিস্তিন মাদোনা' চিত্রে শিশু স্বর্গদূতদের এইভাবে ছবির তলায় বসিয়েছেন।

উত্তম গুরু আর তাঁর 'শ্রেষ্ঠ' ছাত্র

বড় বড় লোকের নামে অনেক শহর আছে। কিন্তু শহরের নাম দিয়ে লোকের নাম ইউরোপে বড় একটা হয় না। আমাদের দেশে মাদ্রাজে, বোম্বাইতে অবশ্য হয়। যেমন বরোদার বিখ্যাত গাইয়ে, হীরাবাই বরোদকর।

ইতালিতে পেরুজিয়া বলে একটা শহর আছে। শিল্পী পেরুজীনোর নাম এই পেরুজিয়া থেকে এসেছে। তাঁর আসল নাম অবশ্য পিয়েত্রো ভান্নুচ্চি, জন্ম ১৪৪৬ সালে, মৃত্যু ১৫২৩ সালে, কিন্তু তাঁর আসল নাম এখন কেউ মনে রাখে না। মজার ব্যাপার এই, পেরুজীনো পেরুজিয়াতে জন্মান নি পর্যন্ত ; তাঁর জন্ম পিয়েভে। কিন্তু যেহেতু তিনি ঐ শহরে বাস করতেন, আর সেখানে তাঁর একটা চিত্রকলার স্কুল ছিলো, সেই থেকে তাঁর ঐ নাম।

পরিচিত বন্ধুর যদি চিঠি আসে, খামে তাঁর হাতের লেখা দেখেই বলে দিতে পারবে, কে লিখেছেন। চিঠি খোলবারও দরকার হবে না।

তেমনি, সই না থাকলেও, পেরুজীনোর ছবি কয়েকটা দেখলেই বাকিগুলো অনায়াসে বলে দেয়া যায় পেরুজীনোর আঁকা কিনা। পেরুজীনো বেশীর ভাগ 'মাদোনা' আর সেন্টদের ছবি এঁকে গেছেন। তাদের কয়েকটা দেখলেই, তাঁর আঁকা বাকিগুলো বলে দিতে পারবে। যদিও ঠিক কি কি কারণে তাঁর আঁকা বলে মনে হচ্ছে, তা গুনে গুনে না বলতে পারো। সাধারণত পেরুজীনোর ছবিতে মুখ্য চরিত্রগুলির মাথা বিশেষ এক ভঙ্গীতে একদিকে হেলানো, মুখে ভারী মধুর একটি ভাব, আর সাধারণত প্রত্যেকেরই একটি হাঁটু মোড়া।

পেরুজীনো নিজে অনেক সুন্দর আর বিখ্যাত ছবি এঁকেছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে খ্যাতি তাঁর এক ছাত্রকে নিয়ে। তাঁর নাম র‍্যাফেইল। সান্‌ৎসিও রাফাইল্লোর জন্ম ইতালির উর্বিনোতে ১৪৮৩ সালে, মৃত্যু রোমে ১৫২০ সালে। র‍্যাফেইল পেরুজীনোর কাছে তিন বছর ছবি আঁকা শিখেছিলেন। যখন উনিশ বছর বয়স, পেরুজীনোর যা শেখাবার ছিল সব শেখানো হয়ে গেলো। তখন র‍্যাফেইল নিজেই আঁকতে শুরু করে দিলেন। মারা গেলেন ৩৭ বছর বয়সে। এত অসম্ভব পরিশ্রম করতেন যে ঐ বয়সে প্রায় হাজারের উপর ছবি এঁকেছিলেন। শোনা যায় তিনি অত্যধিক পরিশ্রম করেই মারা যান।

র‍্যাফেইল সপ্তাহে অন্তত একটা করে ছবি আঁকতেন, তার মধ্যে অধিকাংশ ছবিই খুব বড় বড় হতো, আর সবই লোকজনে ভর্তি। তাঁকে তাঁর ছাত্ররা তাঁর কাজে সাহায্য করতেন বলে এত তাড়াতাড়ি ছবি আঁকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো। প্রত্যেক ছবির মুখগুলি তিনি নিজে আঁকতেন, তাঁর ছাত্ররা কাপড়জামা, হাত আর বাকি জিনিস এঁকে দিতো।

র‍্যাফেইলের সব ছবি ছাপাতে গেলে বেশ কখানা মোটা মোটা বই হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে খুব প্রসিদ্ধ একখানার নাম 'লা মাদোনা দেল গ্রান্‌ ডুকা'। এক গ্র্যাণ্ড ড্যুক ছবিটা কিনেছিলেন বলে তাই থেকে এই নাম। ছবিটা তাঁর প্রাণ ছিলো, তাঁর সব ধনরত্নের চেয়েও তিনি এর মূল্য দিতেন বেশী। বলতে কি, তিনি ছবিটা কখনও দেয়ালে টাঙাতে দিতেন না, তোষাখানায় রাখতেন না, পাছে খারাপ হয়ে যায়। চলতেন ফিরতেন আর সঙ্গে সঙ্গে ছবিবরদার ছবি বয়ে বয়ে বেড়াতো।

এমনকি গাড়ী করে বেরোতেন তাও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ভিতরে ছবি চলেছে।

গ্র্যাণ্ড ড্যুক কবে মারা গেছেন, আর তাঁর অত সাধের ছবি এখন ফ্লরেন্সের এক চিত্রশালায় টাঙানো রয়েছে। যে কেউ এসে যতক্ষণ খুসী বসে দাঁড়িয়ে দেখতে পারে, একটি পয়সাও লাগবে না। ফ্লরেন্সে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই হলো। কী মজা ফ্লরেন্সের লোকদের, কী সৌভাগ্য তাদের! কলকাতায় বসে আমি তুমি হয়তো তাই ভাবছি। কিন্তু ফ্লরেন্সে নিশ্চয় বহুলোক আছে যারা একটিবারও ছবিটি দেখেনি। এইরকমই হয়। কেউ কেউ জীবনের সমস্ত সঞ্চয় খুইয়ে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে জিনিস দেখতে যায়, আর কেউ কেউ ঘরের পাশে থেকেও দেখে না। তুমি আমি কয়বার কলকাতার জাদুঘরে বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিতরে গেছি বলো! অথচ সকলেই জানি ওখানে এত ভাল ভাল জিনিস আছে যে বিলেত এমেরিকা থেকে লোকে দেখতে আসে।

র‍্যাফেইল আরেকটা মাদোনা আঁকেন তাকে বলে 'চেয়ারে বসা মাদোনা'। এটি একটি তন্দো। তন্দো কাকে বলে মনে আছে? গোল ছবিকে।

প্রবাদ আছে, র‍্যাফেইল একদিন গ্রামে বেড়াচ্ছেন এমন সময়ে হঠাৎ দেখেন দরজার মুখে একটি অল্পবয়সী মা শিশুকে কোলে করে চেয়ারে বসে আছে।

'কি সুন্দর মাদোনা!' বলে র‍্যাফেইল বললেন, 'আমাকে এখুনি ওকে আঁকতে হবে, এই এখানে দাঁড়িয়ে, মেয়েটি নড়ে চড়ে বসার আগেই।'

কিসের উপর আঁকেন, হাতের কাছে কি আছে, ঘুরে ফিরে দেখে তাঁর চোখ পড়লো একটা মদের ভাঙা পিপের উপর। তাড়াতাড়ি পিপের গোল ঢাকনিটা খুলে নিয়ে তারই উপর পেন্সিল দিয়ে মেয়েটির আর তার শিশুটির ঐ অবস্থায় স্কেচ করে নিলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ী এসেই সেটা এঁকে ফেললেন।

কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি বোধহয় র‍্যাফেইলের আরেকটি 'মাদোনা'। তার নাম 'সিস্‌তিন মাদোনা' বা 'মাদোনা দি সানসিস্তো।' নামটি এসেছে যে গির্জাতে ছবিটি প্রথমে রাখা হয়েছিলো সেই গির্জা

থেকে। কিন্তু বহুদিন হলো ছবিটি সেই গির্জা থেকে সরিয়ে জার্মানির ড্রেসডেনের এক চিত্রশালায় একটি আলাদা ঘরে রাখা ছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ছবিটি সোভিয়েট রাশিয়ায় চলে গেছে।

অধিকাংশ মাদোনা ছবিতেই মেরিকে খুব সুন্দর করে আঁকা হয়, কিন্তু শিশু যীশুকে প্রায়ই অবহেলা করে আঁকা হয়। প্রায়ই যীশুকে দেখায়, হয় বুড়োটে খোকার মত, না হয় একটি ভুঁড়িদাস বাচ্চা, মোটেই ঈশ্বরপুত্রের মত নয়। কিন্তু সিস্তিন মাদোনার যীশু ঈশ্বরপুত্রই বটে। ছবির তলায়, ফ্রেমের উপর ভর দিয়ে আছে দুটি শিশু স্বর্গদূত। এটি ফ্রা বার্তোলোমেওর কাছ থেকে র‍্যাফেইল ধার করেছিলেন। বার্তোলোমেও আর র‍্যাফেইল দুজনে বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ছবিতে আর যে দুটি প্রতিকৃতি আছে তার একজন পোপ সিক্স্টাস্ অন্যজন সেন্ট বার্বারা। তাঁরা যীশুর বন্দনা করছেন। তাঁরা অবশ্য র‍্যাফেইলের বহু যুগ আগে মারা যান। ঠিক যেমন, উল্টোপক্ষে বতিচেল্লি মেরির করোনেশন ছবিতে দুটি জীবন্ত ছেলেকে এঁকে দিলেন।

যিনি আসলে ভাস্কর ছিলেন অথচ বিরাট চিত্রশিল্পীও ছিলেন

রনেসাঁসের যুগে অল্পবয়সী মেয়েরা চুলে বা খোঁপায় সোনার মালা বা হার পরতো, আমাদের দেশে মহিলারা যেমন এখন ফুলের মালা পরেন। গিয়ার-লান্দায়ো বলে একজন স্যাকরা ছিলেন, তিনি এত ভাল করে এই মালা তৈরি করতেন যে তাঁর নামই হয়ে গেল মালাকার। ইতালিয়ানে গিয়ারলান্দায়ো মানে যিনি মালা তৈরি করেন। কিন্তু গিয়ারলান্দায়ো মালা তৈরি করা ছেড়ে ছবি আঁকায় মন দিলেন, আর সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকলেন। দমেনিকো দেল গিয়ারলান্দায়ো ফিরেঞ্জেতে ১৪৪৯ সালে জন্মান আর সেখানেই ১৪৯৪ সালে মারা যান। কিন্তু পৃথিবীকে তাঁর দান নিজের অমূল্য ছবি তো বটেই, তার চেয়েও বড় দান তাঁর ছাত্র মিকেলাঞ্জেলো। মিকেলাঞ্জেলো গিয়ারলান্দায়োর কাছে তিন বছর কাজ করেছিলেন, কিন্তু শুনলে অবাক হবে গুরুই শিষ্যকে মাইনে দিতেন।

গিয়ারলান্দায়ো ছবি আঁকা নিশ্চয় ভালই শেখাতেন, কিন্তু নবীন মিকেলাঞ্জেলো ছবি আঁকার চেয়ে মূর্তিগড়া বেশী পছন্দ করতেন। তাই

তিনি গিয়ারলান্দায়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মূর্তিগড়া শিখতে গেলেন। মিকেলাঞ্জেলো লোকের সঙ্গে তেমন বনিয়ে চলতে পারতেন না। যা মনে আসতো তা বলতে তাঁর বাধতো না, তা লোকে মনে আঘাত পাক আর যাই হোক। একদিন করলেন কি, একটি তরুণ ভাস্করের গড়া মূর্তি দেখে তিনি ধাঁ করে বলে ফেললেন যে সেটা কিছু বিশেষ এমন হয়নি। হয়তো ঠিকই বলেছিলেন, কিন্তু যাকে বললেন তার ভাল লাগবে কেন? সে তো মিকেলাঞ্জেলোর নাকে একটি প্রচণ্ড ঘুঁষি বসিয়ে এর-জবাব দিলো। ফলে মিকেলাঞ্জোলার নাকটি গেলো চিরকালের মত ভেঙে। বিশ্রী ভাঙা নাক নিয়ে ভদ্রলোক বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিলেন।

মিকেলাঞ্জেলো শীঘ্রই মূর্তিগড়ায় খুব নাম কিনলেন। তাঁর পুরো নাম মিকেলাঞ্জেলো বুয়োনারোতি। জন্ম ১৪৭৫ সালে মৃত্যু ১৫৬৪ সালে। ফ্লরেন্স থেকে তিনি গেলেন রোমে। সেখানে তিনি পোপের কাছে কাজ করলেন, তাঁর কাজ পোপের এত পছন্দ হলো যে পোপ বললেন তাঁর কাছেই শুধু কাজ করতে হবে, আর কারুর কাছে যাওয়া চলবে না।

পোপরা রোমে যে প্রাসাদে থাকেন তার নাম ভাতিকান, ইংরাজিতে ভ্যাটিকান। ভাতিকানে ছোট একটি গির্জা আছে, তার নাম সিস্তিন। র‍্যাফেইলের প্রসঙ্গে একটু আগেই তার নাম শুনেছো। পোপ চাইলেন এই সিস্তিনের ছাতে সর্বত্র ছবি আঁকা থাকবে। সিস্তিনের ছাতটি খুব উঁচু আর ধনুকের মতো বাঁকানো। পোপ মিকেলাঞ্জেলোকে বরাত দিলেন ছবি আঁকতে, কিন্তু মিকেলাঞ্জেলো একগুঁয়ে লোক। তিনি বললেন তাঁর ছবি আঁকতে ভাল লাগে না, তিনি চান মূর্তি গড়তে। তাই শুনে তাঁর শত্রুরা রটালো যে ওসব বাজে কথা, আসলে মিকেলাঞ্জেলো ছবি আঁকতে ভাল পারেন না তাই ভয় পেয়ে গিয়ে অজুহাত দিচ্ছেন। এই যেই শোনা মিকেলাঞ্জেলো তো ক্ষেপে আগুন। তখনই ঠিক করলেন, ছবি এঁকে দেখিয়ে দেবেন ছবি আঁকা কাকে বলে। কেন? তিনি কি ছবি আঁকার জন্যে, মূর্তি গড়ার জন্যে, রাতের পর রাত মোমবাতি জ্বালিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে শবদেহ কিনে তাই নিয়ে কাটাকুটি করে দেখেন নি, প্রত্যেকটি পেশী, প্রত্যেকটি হাড় কিভাবে থাকে, কিভাবে কাজ করে? আর তিনি কি সেসবের অগুনতি স্কেচ

করে রাখেন নি? নরনারীর ছবি আঁকার সম্বন্ধে তিনি কী না জানেন!

প্রথমেই তো গির্জার ভিতরে প্রকাণ্ড ভারা বাঁধা হলো। বাড়ী তৈরির সময়ে রাজমিস্ত্রীরা যেমন ভারা বাঁধে তেমনি। ইংরেজিতে একে বলে স্ক্যাফোল্ডিং। কাঠ দিয়ে শক্ত করে ভারা বাঁধা হলো, উপরে ছাতের কাছাকাছি ভারার উপর কাঠের পাটাতন দেয়া হলো, মিকেলাঞ্জেলো ভারা বেয়ে চড়ে পাটাতনে শুয়ে বসে ছবি আঁকবেন।

ব্যাপারটা যদি একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করো তাহলে কল্পনা করতে পারবে ছাতে ছবি আঁকা কত শক্ত। যিনি আঁকবেন তাঁকে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে হবে অত উঁচুতে। ছাতের এত কাছে থাকতে হবে যে তাঁর পক্ষে শুধু নাকের সমুখে যেটুকু দেখা যায় সেটুকুই দেখা সম্ভব। তার বেশী দেখতে হলে সিঁড়ি দিয়ে ভারা বয়ে নেমে দেখতে হবে। সিস্তিন গির্জার ছাতটাও ছিল বেজায় বড় আর উঁচু। সুতরাং এতে ছবি আঁকতে হলে ছবিও এত বড় করতে হয় যাতে মেঝে থেকে মুখ তুলে লোকে প্রত্যেকটি জিনিস ভাল করে দেখতে পায়। ভাবতে পারো, পা দুটো কোথায় আঁকা হবে তা দেখতে পাচ্ছো না, অথচ সেই মানুষের মাথাটা তুমি আঁকছো? যত ভালই শিল্পী হোক না কেন, এ বড় কঠিন সমস্যা। তাছাড়া রঙের সমস্যা তো আছেই। মিকেলা-ঞ্জেলো ধরো ভুলে তুলিতে একটু বেশী রঙ নিয়েছেন, সেটি যেই তুলে আঁকতে গেলেন, আর অমনি বাড়তি রঙটুকু টপ টপ করে পড়ে তাঁর জামাকাপড় ভর্তি হয়ে গেলো! সাধে কি কাজটা তিনি হাতে নিতে চাননি!

কিন্তু এ যে মান-অপমানের কথা। একবার আরম্ভ করে আর তিনি থামলেন না। প্রথম প্রথম সাহায্য করার জন্য কয়েকজন লোক নিলেন, কিন্তু দেখলেন তাদের নিয়ে আরও বিপদ। সবাইকে বিদায় দিয়ে একাই কাজে লেগে গেলেন।

সাড়ে চার বছর তাঁর লেগে গেলো ছাতটি শেষ করতে। তবে কাজ হিসেবে সময় খুব অল্পই লেগেছিলো বলতে হবে। পোপ থেকে থেকে কেবলই তাগাদা করতেন। শেষের দিকে মিকেলাঞ্জেলো গির্জার মধ্যেই শোবার খাট নিয়ে এলেন। সেইখানেই সারাক্ষণ কাজ চলতো, যাতে বাইরে যেতে গিয়ে সময় নষ্ট না হয়। পোপ প্রায়ই এসে

বলতেন এই ছবিটা এইরকম করো, ওটা ঐরকম করো। মিকেলা-ঞ্জেলো এই সব কথায় বড় বিরক্ত হতেন, নিজের কাজ তিনি পোপের চেয়ে ভাল বোঝেন এই তাঁর ধারণা। তাই একদিন পোপ এসে তলায় দাঁড়িয়ে যখন হাঁকডাক করে নির্দেশ দিচ্ছেন, মিকেলাঞ্জেলো ভারা থেকে চুপচাপ একটি বড় হাতুড়ি ফেলে দিলেন। বেশ আন্দাজ করে এমন ফেললেন যে পোপের ঘাড়ে না পড়ে, অথচ এমন কাছে পড়ে যাতে পোপ খুব ভয় পেয়ে যান। তারপর থেকে পোপ মিকেলাঞ্জেলোকে না ঘাঁটানোই সমীচীন বোধ করলেন। আর আসতেন না।

শেষে একদিন ছবির কাজ শেষ হয়ে এলো। মিকেলাঞ্জেলো চাইলেন এখানে ওখানে কিছু সোনার জল করে দিতে, কিন্তু পোপ গির্জাটির দ্বারোদ্‌ঘাটনের জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যে সোনার জল আর দেয়া হয়ে উঠলো না, মিকেলাঞ্জেলা ভারা নামিয়ে নিলেন। সাড়ে চার বছর কাজ করার পর যখন নেমে এলেন, তখন তাঁর ঘাড় অবশ হয়ে গেছে, সারা দেহ ধনুকের মত বেঁকে কুঁজো হয়ে গেছে, দেখে মনে হলো তিনি নিতান্ত পঙ্গু হয়ে পড়েছেন।

রোমের লোক ফেটে পড়লো দেখতে বিখ্যাত ভাস্কর কি রকম ছবি এঁকেছেন। দেখলো ছাতময় বাইব্‌ল থেকে গল্প আঁকা। ছাতের কানা ধরে ধরে সব অবতারদের ছবি যাঁরা যীশুর আগমনের ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছলেন। ছাতের লম্বালম্বি মাঝবরাবর ওল্ড টেস্টামেণ্ট থেকে সব কাহিনী আঁকা—সৃষ্টির প্রথম ছয়দিন, নোয়ার নৌকা, মহাপ্লাবন ইত্যাদি। এত ভাল আঁকা যে লোকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো।

এই সব ছবিতে যে সব নরনারী আঁকা তারা সকলেই দৃপ্ত, বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত। দেখে মনে হয় ছবি নয়, মূর্তি, ওজন আছে। মনে হয় যেন জীবন্ত নরনারী, সামনে, পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে পরিপূর্ণ, ছবির মত সমান বা চ্যাপটা, ফ্ল্যাট নয়। তাই আমরা মিকেলাঞ্জেলোর ছবিকে বলি মূর্তিপ্রতিম অর্থাৎ মূর্তির মত।

বইয়ে একটি ছবি দেয়া হয়েছে, ছাতের সামান্য একটি টুকরো। বিষয়টি হচ্ছে, প্রথম মানবসৃষ্টি। চেয়ে দেখো কি বিপুল অ্যাডামের কাঁধ আর পেশীগুলি।

ছাত আঁকার প্রায় ত্রিশ বছর পরে মিকেলাঞ্জেলোকে বলা হলো সিস্তিনের এক কোণে বেদীর উপরে দেয়ালে একটি ছবি এঁকে দিতে।

এখানে আগে থেকেই পেরুজীনোর একটি ছবি ছিলো, সেটি মুছে ফেলতে হলো। তার জায়গায় মিকেলাঞ্জেলো আঁকলেন 'শেষ বিচার'। এই ছবিটি জগদ্বিখ্যাত, যদিও আমার মনে হয় সিস্তিনের ছাতের ছবিগুলির মত অত ভাল নয়। ছবিটি অসংখ্য নরনারীতে ভর্তি, শেষ বিচারের দিন কবর থেকে উঠে এসেছে।

মিকেলাঞ্জেলো আর খুব কমই ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর আঁকা বলে নিশ্চিত জানা আছে যে ছবিটি সেটি হচ্ছে একটি তন্দো, পূত পবিত্র পরিবারের, অর্থাৎ যোসেফ, মেরি ও যীশুর। ছবিটিতে মাদোনা হাঁটু মুড়ে বসে আছেন, কাঁধের পিছনে শিশু যীশুকে এমনভাবে ধরে যাতে যোসেফ ছেলেকে দেখতে পান। ছবিটি দেখলেই বোঝা যায় যে মিকেলাঞ্জেলো দুমড়ে মুচড়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসা, শরীর আঁকতে বড় ভালবাসতেন।

মিকেলাঞ্জেলো ৮৯ বছর বয়সে মারা যান। বয়স যত বাড়লো ততই তিনি রাগী আর খিটখিটে হলেন। তাঁর সঙ্গে বনিয়ে চলা তত কঠিন হলো। কিন্তু বদ্‌রাগী, খিটখিটে হলেও সকলে তাঁকে অত্যন্ত মান্য করতো, ভক্তি করতো, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে পূজা করতো।

আশ্চর্য সুন্দর কবিতা লিখতেন। মিকেলাঞ্জেলো একশটা চতুর্দশপদী প্রেমের কবিতা লেখেন। কাব্যরসপূর্ণ সে রকম কবিতাও সাহিত্যে দুর্লভ। অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য প্রতিভা।

লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি

এই লাইনটা চট করে পড়ো দেখি? পড়তে পারছো না? আচ্ছা, এবার এটা আয়নার সমুখে ধরো, অমনি পড়তে পারবে

লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির হাতে লেখা খাতা সব যখন লোকের হাতে এলো, তখন তাঁরা দেখেন তাজ্জব ব্যাপার, আগাগোড়া এই রকম উল্টো

করে লেখা। লোকে বাঁ হাতে লেখে, ডানদিক থেকে বাঁদিকেও সময়ে সময়ে লেখে, কিন্তু হরফও সমস্ত উল্টো কী করে হয়? মাথার গোলমাল ছিলো কি?

হাঁ মাথার খুব গোলমাল ছিলো! এত গোলমাল ছিলো যে পৃথিবীতে ওঁর মত একাধারে জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক লোক দ্বিতীয় জন্মেছে কিনা সন্দেহ। তাঁর সঙ্গে নাম করতে হলে লোকে এক গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের নাম করে। অ্যারিস্টট্ল বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ছিলেন, বড় শিল্পী তো ছিলেন না, ভাস্করও ছিলেন না। কিন্তু লেঅনার্দো যে এসব সমস্তই ছিলেন, উপরন্তু আরও অনেক কিছু ছিলেন!

লেঅনার্দো সারা জীবনে যা করে গেছেন তা ভালমত গুছিয়ে সাজিয়ে রাখতে হলে প্রায় একটা বড় রাজবাড়ীর পুরোটা লেগে যাবে। ছবি, মূর্তি, বৈজ্ঞানিক মড্‌ল্, এচিং হস্তলিপি সব মিলিয়ে একটা বড় যাদুঘর হতে পারে।

লেঅনার্দো সম্বন্ধে যত বই লেখা হয়েছে তাতে বড় একটা গ্রন্থাগার হতে পারে। তোমরা যখন বড় হবে তখন তাঁর একটা বই পোড়ো। বইটি ছোট্ট, নাম হচ্ছে সিলেক্‌শন্‌স্ ফ্রম দা নোটবুক্‌স্ অভ্ লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি, সম্পাদিকার নাম ইর্মা রিখ্‌টার। মাত্র ৪৩২ পৃষ্ঠার বই, কিন্তু পড়লে খানিকটা বুঝতে পারবে, লেঅনার্দো কী বিরাট পুরুষ আর অবিনশ্বর প্রতিভা ছিলেন। শুনলে আশ্চর্য হবে যে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে তিনি আধুনিক এরোপ্লেনের মড্‌লের কথা ভাবতেন, ছবি আঁকতেন!

লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি ১৪৫২ সালে ইতালিতে জন্মান, মারা যান ফ্রান্সে ১৫১৯ সালে। ৬৭ বছর বেঁচেছিলেন। তখন ইতালিতে ভরা রনেসাঁসের সময়। র‍্যাফেইলের সমসাময়িক, যদিও র‍্যাফেইল যখন জন্মান, তখন লেঅনার্দোর বয়স ৩১, অর্থাৎ খ্যাতির মধ্যাহ্নসূর্যে। লেঅনার্দো তখনই চিত্রশিল্পী হিসেবে প্রচুর নাম কিনেছেন। অনেকের মতে র‍্যাফেইলও তাঁর মত চিত্রশিল্পী ছিলেন কিনা সন্দেহ। অথচ লেঅনার্দো নানা বিষয়ে এত মেতে থাকতেন যে দীর্ঘ জীবনে খুব অল্পই ছবি এঁকেছিলেন।

লেঅনার্দোর একটি ছবি প্যারিসের একটি চিত্রশালা, লুভ্‌রে আছে। তার নাম মোনা লিসা। ছবিটি লম্বায় তিন ফিট, চওড়ায় দু ফিট চার

ইঞ্চি। হঠাৎ কয়েক বছর আগে ১৯১১ সালে এই বিখ্যাত ছবিটি লুভ্‌রের দেয়াল থেকে বেমালুম চুরি হয়ে যায়। তা নিয়ে সারা জগতের কাগজে কাগজে কি হৈ চৈ। যেন খুব বড় রাজা মরেছে না হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত জাহাজ ডুবেছে। ভাগ্যক্রমে ছবিটা ১৯১৩ সালে ফ্লরেন্সে অটুট অবস্থায় পাওয়া গেলো, আর ফের লুভ্‌রে ফিরে গেলো। একজন ইতালিয়ান ছবিটি চুরি করেন। ধরা পড়াতে তিনি বললেন ছবিটি চুরি করে তিনি একশ' বছর আগের নেপোলিঅনের ইতালি আক্রমণের শোধ নিয়েছেন। কারণ নেপোলিঅন ইতালি থেকে ছবিটি লুঠ করে নিয়ে যান।

মোনা লিসা হচ্ছে একটি ইতালীয় মহিলার ছবি। অনেক সময়ে লা জকোন্দাও বলা হয়। বাংলা মানে কৌতুকময়ী। আসলে স্বামীর নাম ছিলো ফ্রাঞ্চেস্কো জকোন্দো। মুখে অল্প হাসির রেখা। শিল্পী যদি কোন রেখা সামান্যও একটু বদলে দিতেন তাহলে আর হাসিটি থাকতো না। ভারী কুহেলিকাময়, ধাঁধা-লাগানো হাসি। মোনা লিসা যেন এমন কিছু ভেবে হাসছেন যার বিষয়ে কেউ কিছু জানে না।

হাসি ছাড়াও আরও অনেক কিছু লক্ষ্য করার আছে ছবিটিতে। দেখো, মহিলাটিকে কীরকম প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে, যেন শরীরের সমস্ত পরিপূর্ণতা, সমস্ত ওজন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সত্যিই একজন মহিলা দাঁড়িয়ে হাসছেন। মোটেই কার্ডবোর্ডে কাটা ছবি নয়, মোটেই সমান, চ্যাপটা, ফ্ল্যাট নয়। অথচ এটা গ্রীকদের বোকাবানানো ছবি নয়, ফোটোগ্রাফও নয়, এটা নিতান্তই ছবি।

কী করে লেঅনার্দো এই ছবি আঁকলেন? কী করে ছবিতে প্রাণ দিলেন, ওজন দিলেন, সত্যরূপ দিলেন? কারণ, তিনি জানতেন কি করে আলোছায়া ভাল করে ব্যবহার করতে হয়, কি করে আলোর অংশগুলো আস্তে আস্তে ছায়ায় মিলিয়ে দিতে হয়। এমনকি কি করে ছবিতে এক অপার্থিব আলো আনতে হয়। তিনিই প্রথম চিত্র-শিল্পী যিনি এ জিনিসটা খুব ভাল বুঝতেন আর ছবিতে সফলভাবে এনেছিলেন।

তারপরে দেখো ছবির পিছনটা, মহিলাটির পিছনের যে-অংশ সেইটে। ছবিতে যাকে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড বলে। এটি একটি প্রাকৃতিক

দৃশ্য,—একটি নদী, তার পিছনে পাহাড়, তারও পিছনে পর্বতমালা। আমরা যখন সত্যিকারের কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখি তখন কাছের দৃশ্যটির মত দূরের দৃশ্য অত স্পষ্ট দেখতে পাই না। তার কারণ দূর আর কাছের মধ্যস্থলে যে হাওয়ার স্তর থাকে তা আমাদের দৃষ্টিকে খর্ব করে। যদিও আমরা এই হাওয়া দেখতে পাই না, তবুও একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারা যায় হাওয়া কি করে দূরের দৃশ্যকে অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট করে দেয়। আমি মাঝে মাঝে দার্জিলিং, সিকিম, কাশ্মীরের পাহাড়ে চৌদ্দ পনের হাজার ফুট উঁচুতে বেড়িয়েছি, সেখানে হাওয়া এত হাল্কা আর স্বচ্ছ, যে পঞ্চাশ মাইল দূরের পাহাড় মনে হয় যেন বাইশ মাইল দূরে, মাথার উপরে গ্রহতারাগুলি এত বড় এত উজ্জ্বল হয়ে দপ্ দপ্ করে মনে হয় যেন এখুনি মাথার উপরে পড়বে। লেঅনার্দো এই হাওয়ার ব্যাপারটি, তার গুণাগুণ খুব ভাল বুঝতেন। ছবিতে কাছে আর দূরের সম্বন্ধ এমন ফোটাতে পারতেন যাতে দূর বহুদূর মনে হয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য কাছ থেকে দূরে, আরও দূরে, দিকচক্রবালে না ডুবেও, দূরের হাওয়ায় মিশিয়ে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায়। এ বিষয়েও বলতে হবে তিনি সর্বপ্রথম শিল্পী যিনি কি করে ছবিতে এই ধরনের অনুমান আনা যায়, তা নিজে হাতে এঁকে দেখালেন।

লেঅনার্দোর আরেকটা ছবির কথা বলি। এটি কোন চিত্রশালায় রক্ষিত নেই, যেখানে এর বিশেষ যত্ন হতে পারে। এটি আছে ইতালির একটি মনাস্টারির একটা নীচু, স্যাঁতসেঁতে ঘরে, ভিজে থেকে থেকে যার দেয়াল প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। এটি একটি জগদ্বিখ্যাত ছবি, অতি মহৎ ছবি, কিন্তু একে কিছুতেই আর কোন চিত্রশালায় সংরক্ষণ করা যাবে না, কারণ লেঅনার্দো ছবিটি ঘরের দেয়ালে এঁকেছিলেন। ছবিটিকে বলা হয় 'দা লাস্ট সাপার' অর্থাৎ শেষ ভোজন। যীশুখৃষ্ট আর তাঁর বারো জন শিষ্য একটি লম্বা টেবিল ঘিরে বসে আছেন। যীশু বলছেন 'তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে'। লেঅনার্দো ঠিক এই মুহূর্তটি কল্পনা করে ছবিটি এঁকেছেন।

কল্পনা করো দেখি এই ভয়ঙ্কর কথাটি শুনে যীশুর শিষ্যদের মনে কী ভয়, আতঙ্ক, হাহাকার উঠেছিলো! যে বারোজন শিষ্য অত অত্যাচার, নিগ্রহ সহ্য করে, সংসারে সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়ে যীশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, যাঁরা যীশুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের পুত্র বলে জানেন,

তাঁকে, সেই যীশুকে তাঁদেরই মধ্যে একজন ধরিয়ে দেবেন! প্রশ্নের পর প্রশ্ন কী বিষাক্ত বিছের মত তাঁদের বিবেককে দংশন করেছে! জীবনের প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি চাউনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করার সময় এলো যে! লেঅনার্দো তাই দেখালেন। শিষ্যদের ভাবে ভঙ্গীতে, তাঁদের হাত রাখার ভঙ্গীতে, তাঁদের মুখে লেঅনার্দো এই সব বিহ্বলতা, এই সব চিন্তা ফুটিয়ে তুললেন, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভাবে।

মানুষে কী ভাবছে, কী অনুভব করছে, ছবিতে তা ফুটিয়ে তোলা সহজ কথা নয়। চিত্রশিল্পী তো আর ছবিতে মানুষকে দিয়ে কথা বলাতে পারেন না। তাই মানুষ কী অনুভব করছে তাই যদি ছবিতে ফোটাতে হয় তাহলে তাঁকে দেখাতে হবে মানুষ সেটি অনুভব করার সময়ে তাকে কি রকম দেখাচ্ছে। যে কথা বলতে পারে, তার কথার মধ্যে দিয়ে, স্বরের মধ্যে দিয়ে অনুভূতির অনেকখানি প্রকাশ পায়, বাকিটা প্রকাশ হয় মুখের হাবভাবে, চাউনিতে। লেঅনার্দো এটা জানতেন। তাই তিনি চলে যেতেন বোবা কালাদের কাছে, যারা কথা বলতে পারে না, যারা হাবে ভাবে, চোখের চাউনিতে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাত, পা, শরীরের ইসারায় জানিয়ে দেয় তারা কী চায়, কী ভাবে ; তারা ভয় পেয়েছে, না রেগে গেছে, খুসী আছে, না উত্তেজিত আছে, সুখে আছে না দুঃখে আছে। তাদের খুব নিরীক্ষণ করে দেখতেন, যাতে ছবিতে লোককে কথা না বলিয়েও দেখাতে পারেন তারা কি ভাবছে, কি অনুভব করছে। এই সব লক্ষণ নানাভাবে দেখে বিচার করে অসংখ্য স্কেচ্ করতেন, তার পর বড় ছবিতে হাত দিতেন।

যাক্, এখন 'লাস্ট সাপার' ছবিটার কথা বলি। ছবিটা আঁকার কিছুদিনের মধ্যেই ছবির রঙগুলি দেয়ালের আস্তর থেকে পেঁয়াজের খোসার মত উঠে আসতে লাগলো। তার একটা কারণ লেঅনার্দো শুক্‌নো আস্তর বা প্লাস্টারের উপর ছবিটি এঁকেছিলেন। মিকেলাঞ্জেলো বা অন্যান্য শিল্পীরা যাঁরা দেয়ালে ছবি আঁকতেন, তাঁরা সদ্যকরা প্লাস্টার ভিজে থাকতে থাকতে ছবি আঁকতেন। তাতে হতো কি, ছবির রঙ নতুন ভিজে প্লাস্টারের মধ্যে ডুবে যেতো, ঢুকে যেতো, শুষে যেতো, ফলে যতক্ষণ না প্লাস্টার উঠে আসছে ততক্ষণ রঙের পর্দাটি খোসার মত উঠে আসবে না। মনে আছে তো, একে ইতালিয়ানে বলে ফ্রেস্কো, যার

বাংলা মানে তাজা, ইংরেজিতে ফ্রেশ! লেঅনার্দোর সর্বদাই চিন্তা, কি করে, নতুন উপায়ে, নতুন পদ্ধতিতে ছবি আঁকা যায়। তাই তিনি চিরাচরিত কালের ফ্রেস্কো ছেড়ে শুক্‌নো প্লাস্টারে 'লাস্ট সাপার' আঁকলেন। ফলে রঙ উঠে যেতে লাগলো।

যখন নানা জায়গায় রঙ উঠে উঠে গেলো, তখন অন্য শিল্পীরা এসে তাঁদের বিচারমত যেখানে যেমন রঙ লাগানো উচিত, সেরকম তুলি চড়াতে লাগলেন, খোদার উপর খোদকারি চললো। কিছুদিনের মধ্যেই এইসব নিকৃষ্ট শিল্পীদের নিকৃষ্ট তুলির অত্যাচারে ছবির অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেলো। তার পরে যা হলো তা বললে শিউরে উঠবে। মাঙ্করা ঠিক করলেন ঐ দেয়ালেই একটা দরজা ফোটাতে হবে। ছবির তলার দিকটায় মধ্যিখানে, যেখানটা টেবিলের চাদর সেখানে দরজার মাথা বসানো হলো। বলাই বাহুল্য, দরজা বসাতে গিয়ে দেয়ালে শাবল, গাঁইতি, হাতুড়ি, মিস্ত্রীর যা ঠোকাঠুকি হলো তাতে ছবির আরও রঙ উঠে গেলো।

আরও পরে, অর্থাৎ ছবি আঁকার প্রায় তিন শ বছর পরে, নেপোলিয়নের সৈন্যসামন্ত ইতালিতে এলো। তাদের মধ্যে একদল সৈন্য 'লাস্ট সাপারে'র ঘরটিকে করলো ঘোড়ার আস্তাবল। (যেমন নাকি প্রায় ঠিক একই সময়ে ভারতবর্ষে অজন্তার গুহাগুলিকেও ওয়েলেস্‌লির সৈন্যরা একবার আস্তাবল করে নষ্ট করেছিলো।) তাদের মধ্যে যারা বেশী রসিক তারা করতো কি ছবিটির যেখানে জুডস্ ইস্‌ক্যারিয়ট (যিনি যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন) আঁকা আছে সেইদিকে টিপ করে পায়ের বুট খুলে ছুঁড়ে মারতো। বলা বাহুল্য, বুটগুলি সবই যে একই জায়গায় গিয়ে লাগতো তা নয়।

এইরকম করে আস্তে আস্তে ছবিটি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার দশা হলো। শেষে এক ওস্তাদ ইতালিয়ান শিল্পী এসে বহু যত্নে ছবিটা পরিষ্কার করলেন, ক'রে এমন সব স্বচ্ছ আঠার মত জিনিস লাগালেন যাতে ছবিটা আর দেয়াল থেকে উঠে না আসে। তারপর যে সব নিকৃষ্ট শিল্পীরা খেয়ালখুসীমত রঙ লাগিয়েছে এতকাল, সেগুলি তিনি বহু যত্নে ঘষে ঘষে তুললেন। ফলে এখন ছবিটা অনেক ভাল দেখায়।

যেগুলির কথা বললুম সেগুলি ছাড়া লেঅনার্দোর আঁকা আর বোধ হয় গুটি তিন-চার ছবি আছে। তার মধ্যে একটি সকলেরই

পছন্দ, নাম হচ্ছে 'দা ভর্জিন অভ্ দা রক্স্'। মাতা মেরি আর শিশু যীশু মাটিতে বসে, পাশে ছোট্ট সেণ্ট জন্ আর একটি স্বর্গদূত। চারিদিকে গুহা আর কালো কালো পাথর। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে একটা ঝরনার উজ্জ্বল নীল দেখা যাচ্ছে, আর গাছপালার উজ্জ্বল সবুজ।

গাছপালা, ফুল সম্বন্ধে লেঅনার্দোর জ্ঞান ছিল অসাধারণ, তাঁর মত কেউ জানতো না। তাঁর একজন শিষ্য ছিলেন, তাঁর নাম লুইনী। লুইনীর একটি ছবি আছে, তার নাম 'কলম্বাইন'—একটি যুবতী কলম্বাইন ফুল হাতে নিয়ে আছে। লুইনী যে সব মেয়েদের আঁকতেন তাঁদের মুখেও লেঅনার্দোর মত আধো হাসি দিতেন, তবে লেঅনার্দোর প্রতিভা তিনি পাবেন কোথায়!

ভেনিসের ছয়জন শিল্পী

ভেনিসের রাজপথ হচ্ছে জলভরা খাল, মোটরকারে না চড়ে সেখানে নৌকা করে এবাড়ী ওবাড়ী যেতে হয়। আজকাল ভেনিস ইতালির মধ্যে, কিন্তু রনেসাঁসের সময়ে, যদিও ভেনিস এখনও যে জায়গায় তখনও সেখানেই ছিলো, তবুও, ভেনিস আলাদা রাজত্ব ছিলো, ইতালির বাইরে। ইতালিতে তখন গণতন্ত্র ছিলো না কিন্তু ভেনিস স্বতন্ত্র রাজ্য ছিলো, গণতন্ত্র ছিলো। তার নিজের সমরবাহিনী ছিলো, নৌবহর ছিলো, শাসনকর্তার নাম ছিলো 'দোজে', নিজের আলাদা সব আইনকানুন ছিলো। আর ছিলো রনেসাঁসের সময়ে তার নিজস্ব শিল্পীর দল। এই সব শিল্পীরা তাঁদের আশ্চর্য ছবি, আশ্চর্য রঙের জন্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

রনেসাঁসের প্রথম যুগে ভেনিসে একজন শিল্পী ছিলেন, তাঁর নাম বেল্লিনি, তাঁর দুই ছেলের নামও বেল্লিনি, তাঁরাও কালে বিখ্যাত শিল্পী হলেন। সত্যি বলতে বাপের চেয়ে দুজনেই অনেক বড় হয়েছিলেন। দুই ভাইএর মধ্যে একজন দুই ছাত্রকে ছবি আঁকা শেখালেন, তাঁরা আবার দুই ভাইকেই ছাপিয়ে গেলেন। এঁদের একজনের নাম জর্জনে অর্থাৎ বড় জর্জ। আরেকজনের নাম তিশান; তিশান মানে তিশান।

তাহলে এখন মনে রাখো—তিনজন বেল্লিনি, জর্জনে আর তিশান, পাঁচটি লোক, তিনটি নাম।

বেল্লিনিদের কথা আরেকটু ভাল করে বলার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু স্থানাভাব। জাকোপো বেল্লিনি ছিলেন বাবা, তিনি মারা যান ১৪৬৮ সালে। জেন্তিল বেল্লিনি ছিলেন বড় ভাই, ১৪২৯ সালে জন্মান, ১৫০৭ সালে মারা যান। তাঁর কয়েকটি ছবি ভেনিসে যত্ন করে রাখা আছে। একটি ছবি 'সেন্ট মার্কের ধর্মপ্রচার' মিলান ক্যাথিড্রালে আছে। ছোট ভাই জভান্নি বেল্লিনি সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। কবে জন্ম ঠিক জানা নেই, মারা যান ১৫১৬ সালে। তাঁর কয়েকটি ছবি এখন লণ্ডনের ন্যাশন্যাল গ্যালারি বা জাতীয় চিত্রশালায় আছে, কতগুলি আছে ভেনিসে। নিজের বিখ্যাত বিখ্যাত ছবি ছাড়াও তাঁর আরও নাম তিনি তিশান, তিন্তোরেত্তো, আর জর্জনের গুরু বলে। তিন বেল্লিনিই ভেনিসের 'দোজে'দের ছবি এঁকেছিলেন।

এখন জর্জনের কথা বলি। পণ্ডিতরা বলেন জর্জনে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন। লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির মতই, নিশ্চিত তাঁরই আঁকা বলে যে সব ছবি আমরা জানি তার সংখ্যা খুবই কম। কন্‌সার্ট বলে একটা বিখ্যাত ছবি আছে। অনেকের ধারণা ছবিটি জর্জনের আঁকা, আবার অনেকে মনে করেন ওটি তাঁর বন্ধু তিশানের আঁকা। কন্‌সার্ট ছবিটিতে তিনটি লোকের মাথা আর কাঁধ আঁকা। একজন ক্ল্যাভিকর্ড বাজাচ্ছে। পিয়ানো যখন আবিষ্কার হয়নি তখন লোকে ক্ল্যাভিকর্ড বাজাতো। দ্বিতীয় লোকটির হাতে ভায়োলিন, তৃতীয় লোকটি একটি বড় টুপি পরে, তাতে অনেক পালক গোঁজা, মহিলা বলে ভুল হয়। ছোটবেলায় আমাদের বাড়ীতে 'কন্‌সার্টের' একটি সাদাকালো কপি টাঙানো ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল টুপিপরা লোকটি একটি মহিলা।

জর্জো দা কাস্তেল্‌ফ্রাঙ্কো জর্জনে বড় অল্পদিন বেঁচেছিলেন। ১৪৭৮ সালে তাঁর জন্ম, মারা যান ১৫১০ সালে। মাত্র ৩২ বছর বেঁচেছিলেন, এত অল্প বয়সে কটা ছবিই বা আঁকবেন। ১৫১০ সালে ভেনিসে ভয়ঙ্কর প্লেগ দেখা দেয়, জর্জনে প্লেগে মারা যান।

জর্জনের বন্ধু তিশান খুব বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, তাই জর্জনের চেয়ে অনেক বেশী ছবিও এঁকেছিলেন। ভেচেল্লো তিৎসিয়ানো

১৪৭৭ সালে জন্মান, মারা যান ১৫৭৬ সালে। পুরো ৯৯ বছর বেঁচেছিলেন। আমীর-ওমরা বড়মানুষদের ছবি খুব ভাল আঁকতে পারতেন। একটা ছবির নাম 'দস্তানা-পরা লোক'। কাকে দেখে এঁকেছিলেন কেউ বলতে পারে না, কিন্তু যে দেখবে তারই ছবিটা খুব পছন্দ হবে।

তিশান লোকের চেহারা ছাড়া অন্যান্য ছবিও খুব ভাল আঁকতেন। ভেনিসের একটি গির্জার বেদীর জন্য তিনি একবার একটা ছবি আঁকেন, তার নাম 'অসাম্প্‌শন্‌'। ছবিটিতে মাদোনা স্বর্গে প্রবেশ করছেন। ছবিটা ভেনিসবাসীদের খুব প্রিয় ছবি। তাদের সবচেয়ে ভাল লাগে এর অতি আশ্চর্য জমকালো, উজ্জ্বল রঙ, কারণ ভেনিস এমনিতেই রঙে ভরপুর; চারদিকে গাঢ় নীল সমুদ্র, তারমধ্যে অসংখ্য মার্ব্‌লের প্রাসাদ, ঝকঝকে সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।

ভিনিশানদের অর্থাৎ ভেনিসবাসীদের একটা শখ ছিলো বাড়ীর বাইরে দেয়ালের গায়ে শিল্পীদের দিয়ে ছবি আঁকানো, যাতে শহরটা রঙে আরও ঝকমক করে। জর্জনে আর তিশান দুজনেই এ রকম অনেক বাড়ীর বাইরের দেয়ালে ছবি এঁকেছিলেন, এখন অবশ্য বহুবছরের রোদে জলে ধুয়ে তার একটাও নেই।

অবশেষে বহু বছর বেঁচে, বহু বছর ধরে ছবি এঁকে তিশান মারা গেলেন, লোকে বলে জর্জনে যে রোগে মারা যান সেই রোগেই, অর্থাৎ প্লেগে।

তবুও ভেনিসে বহু বিখ্যাত শিল্পী বেঁচে রইলেন। প্রথমেই মনে পড়ে তিন্তোরেত্তোর কথা। জাকোপো তিন্তোরেত্তো ভেনিসে জন্মান ১৫১৮ সালে, সেখানেই মারা যান ১৫৯৪ সালে। সুতরাং তিশানের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তিন্তোরেত্তো মানে ছোট্ট রঙরেজি, কারণ তাঁর বাবা কাপড়ে রঙ ছোপাতেন। ছেলে বয়সে তাঁর বাবা তাঁকে তিশানের কাছে পাঠালেন ছবি আঁকা শিখতে। কি কারণে জানি না তিশান তাঁকে মাত্র দশ দিন রেখেছিলেন, তার পর তিন্তোরেত্তোকে নিজের মাস্টারি নিজেকেই করতে হয়েছিলো।

জর্জনে আর তিশানের মত তিন্তোরেত্তোও লোকদের বাড়ীর বাইরের পাঁচিলে পাঁচিলে অনেক ছবি এঁকেছিলেন, এবং আর সকলের মত তাঁরও ছবি রোদে জলে হাওয়ায় ধুয়ে মুছে গেছে, এখন কোন

অস্তিত্বই নেই। তিশান টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব হিসেবী ছিলেন, এক একটা ছবিতে বেশ টাকা আদায় করতে পারতেন। তিন্তোরেত্তো আবার সেইরকম বেহিসেবী, টাকাকড়ির কোন খেয়ালই বড় একটা রাখতেন না। যা ন্যায্য দাম হওয়া উচিত তার অনেক কমে ভাল ভাল ছবি বেচে দিতেন। এমনকি অনেক সময়ে দামও নিতেন না। এ সব বিষয়ে বড় খেয়ালী ছিলেন।

একবার তিন্তোরেত্তো একটা খুব বড় কাজের ফরমায়েস পেলেন। ভেনিসের স্কুয়োলা দি সান রক্কোর বাড়ীর দেয়ালে কতগুলি ছবি এঁকে দিতে হবে। মিকেলাঞ্জেলো সদ্য আস্তরলাগানো ভেজা দেয়ালে ছবি এঁকেছিলেন, লেঅনার্দো এঁকেছিলেন শুকনো আস্তরে, কিন্তু তিন্তোরেত্তো আঁকলেন ক্যান্‌ভাসে অর্থাৎ সুতোর চটে। ক্যানভাসে ছবি আঁকা শেষ হলে পর সেগুলি দেয়ালে আটকে দেয়া হলো। সান রক্কোর ছবিগুলি সবই দেয়ালে আটকানো, দেয়ালে আঁকা নয়।

মাটিকাদা দিয়ে ছোট ছোট পুতুল গড়ে সেইগুলি মড্‌ল্ ব্যবহার করে তিন্তোরেত্তো ছবি আঁকতেন। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারতেন, সেইজন্যে বহু ছবি এঁকে যেতে পেরেছিলেন। প্রায় সবগুলিই প্রাণে, কাজে, আবেগে, গতিতে ভরপুর। কোন কোন ছবিতে লোকজনকে দেখে মনে হয় যেন হাওয়ার মধ্যে দিয়ে তীরের মত ছুটে চলেছে। ছবির মধ্যে এত গতি, এত কর্মব্যস্ততা ইতালিয়ান চিত্রকলার ইতিহাসে আগে যেন কখনও দেখা যায়নি। তাঁর ছবির কাছে প্রথম যুগের শিল্পীদের ছবি যেন স্তব্ধ, স্তিমিত, গতিহীন মনে হয়। তিন্তোরেত্তোর ছবির গতি আর প্রাণ মিকেলাঞ্জেলোর দৃপ্ত, প্রাণবন্ত ছবির কথা কেবলই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু প্রাণ, তেজ, গতি ছাড়াও তিন্তোরেত্তোর ছবিতে তিশানের জমকালো রঙেরও কিছু অপ্রাচুর্য ছিল না।

তাঁর ছবি আঁকার ঘরের দরজায় তিনি লিখে রেখেছিলেন: "মিকেলাঞ্জেলোর রেখা আর তিশানের রঙ"। প্রায়ই তিনি যেন তিশানকেও অতিক্রম করে যেতেন। তিশানের ছবিতে বেশী থাকতো সোনালী ব্রাউন, জমকালো লাল আর সবুজ। তিন্তোরেত্তোর শেষের দিকের ছবিতে বেশী থাকতো ধূসরের মোলায়েম পর্দা আর রূপালী আভাস ; সোনালী দ্যুতি অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন।

তিন্তোরেত্তোর একটি ছবির নাম 'সেণ্ট মার্কের দৈবশক্তি'। প্রবাদ আছে সেণ্ট মার্কের একটি বিশ্বস্ত চাকর ছিলো। সে খৃষ্টিয়ান ছিলো বলে আদেশ হলো তাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে মারা হবে। যখন এই মৃত্যুদণ্ড হয় তখন সেণ্টমার্ক বিদেশে ছিলেন। এদিকে দণ্ডের সময় এসে গেছে, চাকরটিকে মাটিতে টান করে শুইয়ে ভাল করে বাঁধা হয়েছে, জহ্লাদ এসে যন্ত্রণা-দেয়া শুরু করবে। সম্মুখে বিচারক বসে। হঠাৎ সেণ্টমার্ক বায়ুপথে মাথার উপরে এসে হাজির আর অমনি জহ্লাদের হাতের অস্ত্রগুলি ভেঙে গেলো। সেণ্টমার্ক তাঁর চাকরকে বাঁচাতে ছুটে এসেছেন।

তিন্তোরেত্তো ছবিতে দেখিয়েছেন সেণ্টমার্ক হাওয়ার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে জহ্লাদের মাথার উপর এসে পৌছেছেন, কিন্তু একটি ছোট্ট শিশু ছাড়া আর কেউ তাঁকে দেখছে না। সবাইএর চোখ তখন জহ্লাদের হাতের ভাঙা অস্ত্র দেখতেই ব্যস্ত।

তিন্তোরেত্তোর যখন বেশ বয়স হয়ে গেছে, বৃদ্ধ বললেই চলে, তখন বরাত পেলেন স্বর্গের একটি ছবি আঁকতে হবে। ত্রিশ ফুট উঁচু আর চুয়াত্তর ফুট লম্বা একটা দেওয়াল এই ছবি দিয়ে ভরাতে হবে। তিন্তোরেত্তো কাজ শুরু করলেন। ছবিটি হলো পৃথিবীর মধ্যে ক্যানভাসে আঁকা সবচেয়ে বড় ছবি। 'পারাদিসো' ছবিটিতে তিনি দেখালেন স্বর্গে মেঘের উপরে খৃষ্ট আর মাদোনা বসে আছেন, তলায় প্রায় পাঁচশর উপর সেণ্ট (সিদ্ধপুরুষ) আর স্বর্গদূতের ভিড়। এইটিই তিন্তোরেত্তোর শেষ বড় কাজ। এটি শেষ করার অল্পদিন পরই মারা যান।

তিন্তোরেত্তোর সব কাজই যে সমান ভাল হতো তা বলা যায় না। কিছু কিছু কাজের তুলনা নেই, আবার কিছুর মূল্য খুব বেশী নয়। ভিনিশানরা ঠাট্টা করে বলতো, তিন্তোরেত্তোর তিনটে তুলি আছে—একটি সোনার, একটি রূপোর, তৃতীয়টি লোহার। তার মানে কতগুলি ছবি অতুলনীয় ; কতগুলি বেশ ভাল, মূল্যবান ; আবার কতগুলি যেমন তেমন করে আঁকা। আর এই কারণেই বোধ হয় তিন্তোরেত্তো সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত আছে।

তিন্তোরেত্তোর পর ভেনিসে আরও অনেক বড় বড় চিত্রশিল্পী কাজ করেন, কিন্তু আপাতত তিনজন বেল্লিনি, জর্জনে, তিশান

আর ভিস্তোরেন্তোর কথা অল্পে জেনে রাখো। ভেনিসে পা দিয়ে প্রথম ক'দিন এঁদের ছবি দেখলেই চলবে।

এক দর্জির ছেলে আর এক আলোর রাজা

তুমি যদি ফ্লরেন্সের ছেলে হতে আর তোমার নাম হতো আন্দ্রেয়া, তোমার বাবা হতেন দর্জি, তাহলে তোমার নাম হতো আন্দ্রেয়া দেল সার্তো, দর্জির ছেলে আন্দ্রেয়া। তাহলে আর রক্ষে থাকতো না, চলতে ফিরতে লোক জিগগেস্ করতো, 'তুমি বুঝি ছবি আঁকো?' কারণ দর্জির ছেলে আন্দ্রেয়া ছিলেন ফ্লরেন্সের আবার-জন্মানো যুগের একজন বিখ্যাত শিল্পী। ১৪৮৬ সালে ফ্লরেন্সে জন্ম, মারা যান ১৫৭১ সালে।

দর্জির ছেলে আন্দ্রেয়া যখন বড় হলেন তখন, শুনতে মজার লাগে, বিয়ে করলেন এক টুপিওলার বিধবাকে। মহিলাটির স্বামী টুপি তৈরি করতেন। দেখতে অতি সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু যেমন মুখরা, বদমেজাজী ছিলেন, তেমনি ছিলেন অমিতব্যয়ী আর স্বার্থপর। আন্দ্রেয়া যা রোজগার করতেন সব খরচ করে উল্টে তাঁকে দেনায় ডুবিয়ে দিতেন।

আন্দ্রেয়ার দুটি ছবি ফ্রান্সে পাঠানো হলো। ছবি দেখে ফ্রান্সের রাজা আন্দ্রেয়াকে ডেকে পাঠালেন, তিনি যেন ফ্রান্সে গিয়ে ছবি আঁকেন, রাজার ফরমায়েস মত। আন্দ্রেয়া ফ্রান্সে হাজির হলেন, রাজা তাঁকে দেখে খুব খুসী, প্রচুর টাকা দিলেন, বললেন ছবি আঁকো। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যে বৌয়ের কাছ থেকে এক চিঠি—যত তাড়াতাড়ি পারো ইতালিতে ফিরে এসো। আন্দ্রেয়ার সাধ্য কি স্ত্রীর হুকুম অমান্য করেন! অগত্যা রাজা তাঁকে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন যে আন্দ্রেয়া তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন, এমনকি ইতালি থেকে ফেরার সময়ে কিছু ছবি কিনে আনার জন্য টাকাও হাতে দিলেন।

তারপর যা ঘটলো তাতে বুঝতে দেরী হয় না যে আন্দ্রেয়া লোকটির চেয়ে আন্দ্রেয়ার ছবি অনেক ভাল ছিলো। কারণ লোক হিসেবে আন্দ্রেয়া ছিলেন যাকে আমরা বলি দুর্বল প্রকৃতির।

বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আন্দ্রেয়ার স্ত্রী তাঁর আনা টাকায় একটি সুন্দর বাড়ী তৈরি করে ফেললেন। নিজের টাকায় কুলোলো না, অতএব স্ত্রীর মন রাখার জন্যে আন্দ্রেয়া রাজার বায়না দেয়া টাকাও খরচ করে ফেললেন বাড়ীর পিছনে। এই রকম জোচ্চুরির পর কে আর ঘাড়ে দুটো মাথা নিয়ে ঘোরে বলো যে, আবার ফ্রান্সে ফিরে যাবে।

ইতালিতে কতগুলি মনাস্টারি বা মঠের ঘরের দেয়ালে আন্দ্রেয়া বেশ কিছু ফ্রেস্কো আঁকেন। মনে আছে তো ফ্রেস্কো কাকে বলে? দেয়ালের নতুন আস্তর বা প্লাস্টার ভিজে থাকতে জলে গোলা রঙে ছবি আঁকাকে বলে ফ্রেস্কো। দেয়ালের প্লাস্টার ভিজে থাকা অবস্থায় ছবি আঁকা চাই যাতে তুলির রঙ দেয়ালে শুষে বসে যায়। তাতে মুশকিল এই যে শিল্পী যদি একবার রঙের বা তুলির টানের ভুল করে ফেলেন তাহলেই বিপদ, মুছে ফেলার উপায় নেই, কারণ প্লাস্টারে ততক্ষণ রঙ শুষে গেছে, প্লাস্টার না চেঁচে ফেললে রঙ উঠবে না। তাই অধিকাংশ ফ্রেস্কো-শিল্পী করতেন কি, ভুলচুক মারার জন্যে, প্লাস্টার শুকিয়ে যাবার পর ফের তুলি দিয়ে এদিক ওদিক টানটোন ঠিক করে দিতেন, ইংরেজীতে যাকে বলে টাচ আপ করে দিতেন। আন্দ্রেয়া কিন্তু কখনও একাজ করেন নি, অর্থাৎ টাচ আপ করতেন না। এত ভাল ছবি আঁকতেন, হাত এত পরিষ্কার আর দৃঢ় ছিলো যে পরে শোধরাবার মত ভুলচুক তাঁর ছবিতে কখনও হতো না। একবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত ছবি হাত থেকে বেরুতো, ভুলচুক থাকতো না।

আন্দ্রেয়া তেলরঙেও আঁকতেন, ফ্রেস্কোতেও আঁকতেন। মনে আছে কি, প্রথম যুগের রনেসাঁস শিল্পীরা ডিম বা গঁদ বা ফলের কষের সঙ্গে রঙের গুঁড়ো মিশিয়ে ছবি আঁকতেন, তাকে বলতো মিশালী রঙ, টেম্পেরা। তার পরে কেউ কেউ আবিষ্কার করলেন যে রঙে তেল মেশালে আরও ভাল হয়, সঙ্গে সঙ্গে সব শিল্পীরা, এক ফ্রেস্কোর কাজ ছাড়া, তেলরঙ ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিলেন। পুরানো প্রথায় ডিম কিংবা গঁদ মিশিয়ে রঙ ব্যবহার করতে হলে শিল্পীদের করতে হতো কি, কাঠ বা বোর্ডের উপর

সমান করে, মসৃণ করে, এক ধরনের আস্তর বা প্লাস্টার লাগিয়ে নিতে হতো, তাকে বলতো জেস্‌সো। তেল রঙ আবিষ্কার হবার পর আর জেস্‌সোর দরকার হতো না; সোজা ক্যানভাস্‌, কাঠের পাটা বা বোর্ডের উপর তেল রঙ দিয়ে ছবি আঁকতে পারা গেলো। ছবি আঁকার কাজ সহজ হয়ে এলো, তা ছাড়া তেল রঙে আঁকা ছবি দেখতেও ভাল হলো।

তেল রঙে আঁকা আন্দ্রেয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি একটি মাদোনা। মেরীর কোলে শিশু যীশু। একপাশে সেণ্ট ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে, অন্য দিকে সেণ্ট জন, মধ্যে দুটি ছোট্ট দেবদূত। ছবিটার নাম একটু অদ্ভুত—'মাদোনা অভ্‌ দা হার্পিজ্‌।' হার্পিজ্‌ কাকে বলে জানো? হার্পিজ হচ্ছে মনগড়া কাল্পনিক জন্তু—মাথাটা স্ত্রীলোকের, শরীরটা পাখীর। আন্দ্রেয়ার ছবিতে মাদোনা দুটি হার্পিজ আঁকা একটি বেদী বা পাদানের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। এর থেকে ছবির নাম হলো 'মাদোনা অভ্‌ দা হার্পিজ।'

লোকে বলে তাঁর স্ত্রীকে মড্‌ল্‌ করে আন্দ্রেয়া এই ছবির মাদোনাকে আঁকেন। মাদোনার মুখটি নাকি তাঁর স্ত্রীর মুখ। প্রায় সব ছবিতেই আন্দ্রেয়া তাঁর স্ত্রীর প্রতিচ্ছবি আঁকতেন। কিন্তু বেচারী আন্দ্রেয়া স্ত্রীর মন বোধ হয় শেষ পর্যন্ত পান নি। শেষে যখন আন্দ্রেয়া প্লেগ হয়ে মরণাপন্ন হলেন, তখন তাঁর স্বার্থপর স্ত্রী প্লেগের ভয়ে কাতর হয়ে তাঁকে বেমালুম ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। আন্দ্রেয়া একা একা বিনা শুশ্রূষায় রোগে ভুগে মারা গেলেন।

আন্দ্রেয়া দেল সার্তো তো তাঁর বাপের ব্যবসার নামে পরিচিত ছিলেন। এখন আরেকজন শিল্পীর কথা বলবো যাঁর নামকরণ হয়েছিলো তিনি যে শহরে জন্মেছিলেন তার নামে। পেরুজীনোর কথা মনে আছে তো, যাঁর নামকরণ হয়েছিল যে শহরে তিনি কাজ করতেন তার নামে? বেশ, এই পেরুজিয়ার অল্প দূরেই আর একটি গ্রাম আছে, তার নাম করেজ্‌জো। এই করেজ্‌জোতে একজন বিখ্যাত শিল্পী জন্মালেন, যিনি তাঁর জন্মস্থানের নাম নিয়েই বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেলেন। করেজ্‌জোর জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না, কিন্তু তাঁর ছবি আমর সুযোগ পেলেই দেখতে পারি। আন্দ্রেয়া দেল সার্তোর মত, করেজ্‌জো ফ্রেস্কো আর তেল রঙ

দুইয়েতেই কাজ করেছেন। করেজ্জো তাঁর সব ফ্রেস্কোই ইতালির পার্মা শহরের ক্যাথিড্রাল আর অন্যান্য গির্জায় করেন।

আন্তোনিও আলেগ্রি করেজ্জো করেজ্জোতে জন্মান অনুমান ১৪৯৪ সালে, মারা যান নিজেরই জন্মস্থানে ১৫৩৪ সালে। প্রায় ৪০ বছর বেঁচেছিলেন।

পার্মার ক্যাথিড্রালটির মাথায় একটি গোল গম্বুজ বা কিউপোলা আছে; করেজ্জো এই কিউপোলার ভিতরের ছাতটিতে একটি ছবি আঁকেন। কিউপোলার ছাতের ঠিক মাপে মাপে যাতে হয় সেজন্যে করেজ্জো একটি গোল ফ্রেস্কো আঁকলেন। ছবিটি যেহেতু লোকে শুধু মাটি থেকে দাঁড়িয়েই উপর দিকে তাকিয়ে দেখবে, সেহেতু করেজ্জো ঠিক করলেন যে ছবিতে দেবদূতদের আর অন্যান্যদের এমন করে আঁকবেন যাতে নীচে দাঁড়িয়ে দেখলে ভ্রম হয় যেন সত্যিকারের লোকজন শূন্যে ভেসে যাচ্ছে। যদি তোমার এমন সৌভাগ্য হয় যে সোজা উপরে তাকালেই তুমি দেখছো একজন দেবদূত তোমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তাহলে বলো তো দেবদূতকে তুমি কি রকম দেখবে? তাহলে দেখবে তার পা তোমার অনেক কাছে, তার মাথা দূরে, নয় কি? তেমনি যদি উপরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে কাউকে দেখো, তাহলে তার মাথাটা কাছে দেখবে, পা বা অন্যান্য অঙ্গ দূরে দেখবে।

নীচে দাঁড়িয়ে, মাথার উপর দেবদূত বা অন্য লোক উড়ে যাচ্ছে, তাকে যে রকম দেখতে লাগবে সে রকম যদি আঁকতে হয় তবে বিপদের কথা বৈকি! খুব কম শিল্পীই সে রকম আঁকতে চেষ্টা করেছেন। করেজ্জো তাই করলেন কি, এক ভাস্করকে দিয়ে অনেকগুলি মাটির পুতুল গড়ালেন, আর সেগুলি নানা অদ্ভুত ভঙ্গীতে মাথার উপর টাঙিয়ে খুব ভাল করে বুঝে নিলেন কোন্ অবস্থায় কোন্ ভঙ্গীতে কে থাকলে নীচে থেকে তাকে কি রকম দেখায়, কি রকম ভাবে তাকে আঁকাই বা যায়। তিনি যে পদ্ধতিতে এই ছবির লোকজন আঁকলেন তাকে বলে "সমুখ দিকটা খাটো করে দেয়া", ইংরেজিতে "ফোর্‌শর্টনিং"।

করেজ্জো আরও কয়েকটি গির্জার কিউপোলায় এই "সমুখ দিকটা খাটো করে দেয়া" পদ্ধতিতে, অর্থাৎ "ফোরশর্টনিং" করে

ছবি একেছেন। প্রথম প্রথম যখন লোকে দেখতো তখন হতভম্ব হয়ে যেতো। ভালমন্দ কিছুই জোর করে বলতে পারতো না, কারণ পদ্ধতিটা এতই নতুন যে পুরোপুরি ভাল লাগা সম্ভব নয়, নিন্দা করাও সমীচীন নয়। একজন বললেন এ ধরনের আঁকা ছবি ঠিক দেখায় যেন অনেকগুলো ব্যাঙকে ছরকুটে দিয়েছে। কিন্তু তিশান একবার যখন পার্মায় এসে ক্যাথিড্রালে গিয়ে করেজ্জোর কিউপোলার ছবি দেখলেন তখন তিনি আনন্দে চীৎকার করে বল্লেন, "কিউপোলাটা উল্টিয়ে দাও আর সেটা সোনা দিয়ে ভর্তি করে দাও, তবুও তাতে করেজ্জোর আঁকা ছবির দাম উঠবে না।"

তেলরঙে আঁকা করেজ্জোর ছবিগুলিতে আলোছায়ার আশ্চর্য খেলা। এক কথায় বলতে গেলে করেজ্জো আলোছায়ার রাজা। ছবিতে যাদের তিনি আঁকতেন তাদের যেমন কমনীয় শ্রী, তেমনি সুন্দর, আনন্দময় দেহ, হাসিভরা মুখ। সকলের ভাল লাগতে বাধ্য। শুধু একমাত্র দোষ লোকে এই ধরে যে তাঁর ছবিতে কোন গভীর ইঙ্গিত নেই, গূঢ় জগতের সন্ধান নেই। অর্থাৎ মিকেলাঞ্জেলো বা লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির মত করেজ্জো চিন্তাশীল মহাজ্ঞানী লোক ছিলেন না। হাত আর চোখ নিখুঁত ছিলো, এই পর্যন্ত।

করেজ্জোর আরেকটি ছবির নাম "সেন্ট ক্যাথারিনের ঐশী বিবাহ"। সেন্ট ক্যাথারিন স্বপ্ন দেখছেন, শিশু যীশুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হচ্ছে, ছবিতে যীশু বিবাহের অঙ্গুরীয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করে খেলা করছেন, এই আংটিই সেন্ট ক্যাথারিন স্বপ্ন দেখেছেন।

এই ছবিটির মতই বিখ্যাত আরেকটি ছবি আছে, তার নাম "পবিত্র রজনী", অথবা রাখালদের বন্দনা। সদ্যোজাত শিশু আস্তাবলে মার কোলে শুয়ে আছেন, চারদিকে রাখালরা ঘিরে আছে। আস্তাবলের কোথা থেকে একটা আশ্চর্য ভাস্বর দ্যুতি এসে পড়েছে, সেই আলোয় রাখালদের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

করেজ্জোর মৃত্যু সম্বন্ধে অদ্ভুত একটা গল্প আছে, সত্যি মিথ্যা জানি না। গল্পটা হচ্ছে, করেজ্জো তাঁর একটা ছবির দাম একবার সবটাই তামার পয়সায় পেলেন। বুঝতেই পারছো অনেক

টাকা দামের জিনিস বেচতে গিয়ে মূল্যটা যদি তোমাকে পয়সা গুনে দেয়া হয়, তাহলে তার কি সাংঘাতিক ওজন হবে! ছবিটার দাম নিতে গিয়ে করেজ্জো এক বিরাট বস্তা বোঝাই তামার পয়সা পেলেন। কি আর করেন, সেই বস্তা ঘাড়ে করে কষ্টে-স্বষ্টে কোনমতে বাড়ীমুখো রওনা হলেন। একে ঐ মোট, তার উপর বেজায় গরম। করেজ্জো গরমে আর পরিশ্রমে এত ক্লান্ত হলেন যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, বাড়ীতে পৌছে সেই যে বিছানায় শুলেন আর উঠতে পারলেন না, শীঘ্রই মারা গেলেন। এইভাবে আলো-ছায়ার রাজার জীবন শেষ হলো। কিন্তু তাঁর আঁকা ছবি বেঁচে রইলো যুগ যুগ ধরে লোককে আনন্দ দিতে।

রনেসাঁস যুগে চিত্রকলায় ইতালি এত জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠলো, অতটুকু দেশে এত মহান ও বিরাট শিল্পীরা জন্মালেন, কাজ করলেন যে, রনেসাঁস কথাটা উচ্চারণ করলেই আমাদের মনে সারাক্ষণ ইতালির কথাই মনে হয়। অন্য দেশের কথা কেউ মনে করিয়ে দিলে তবে যেন মনে আসে। অথচ ইওরোপের অন্যান্য দেশেও এই যুগে যেসব দিক্পাল জন্মেছিলেন তাঁদের কথা যখন সংক্ষেপে বলবো তখন বুঝতে পারবে যে রনেসাঁস মানে শুধু ইতালির কথাটা ভাবা একটু ভুল।

ছোট বইয়ে অল্প কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর কথা লিখে মনের আশ মেটে না। আসলে এক এক যুগে ছোট বড় অনেক শিল্পী না জন্মালে তার মধ্যে থেকে বিশ্ববরেণ্য কয়েকজন বেরুনো শক্ত। দিকপালদের নাম করতে গেলে ছোট মাঝারি এঁদের কথাও বলতে হয়, কারণ জগজ্জয়ী প্রতিভাও তো স্বয়ম্ভু নয়। তাছাড়া আমার ধারণা কোন দেশের বা কোন বিশেষ যুগের শিল্প, ছবি, স্থাপত্য বা ভাস্কর্য সম্বন্ধে ধারণা করতে গেলে সে দেশের ইতিহাস, আর্থিক অবস্থা, ব্যবসা, বাণিজ্য, গ্রাম, শহর, ঘরবাড়ী, লোকজন, তাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, তারা কিভাবে শোয়, বসে, খায়, চিন্তা করে এসব না জানলে চারু-শিল্পের গূঢ় তত্ত্ব বোঝা যায় না। তোমরা যখন বড় হবে তখন রনেসাঁস সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেক বই, অনেক ইতিহাস পড়বে। কয়েকটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বইয়ের নাম আগেই বলেছি। একজন লেখকের কথা

বলিনি, তিনি হচ্ছেন বর্নার্ড বেরেন্সন্। তাঁর একটি বই আছে, তার নাম 'থ্রি এসেজ্ ইন্ মেথড্', ১৯২৭ সালে অক্সফোর্ড থেকে ছাপা হয়েছিলো। কি করে ছবি দেখতে হয়, চোখ কিভাবে তৈরি করতে হয়, কি করে শিল্পীরা ছবি আঁকেন, এসব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা বইটিতে আছে। বেরেন্সনের তিনখণ্ডে আরেকটা বই আছে, তার নাম 'দা স্টাডি এণ্ড ক্রিটিসিজম্ অভ্ ইটালিয়ান আর্ট।' এই তিনটি বইও অমূল্য, বড় হয়ে নিশ্চয় পড়বে। সম্প্রতি আরেকটি খুব ভাল বই বেরিয়েছে, তার নাম 'ফ্লরেণ্টাইন পেণ্টিং এণ্ড ইট্স্ সোশ্যাল ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড,' লেখকের নাম ফ্রেডেরিক আণ্টাল। সমাজব্যবস্থা আর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মহৎ শিল্পের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তা এই বই পড়লে খানিকটা বোঝা যায়।

যাই হোক, এবার ইওরোপের অন্য দেশের শিল্পীদের কথা পাড়া যাক। রনেসাঁসের সময়ে ইওরোপের অন্যান্য দেশে চিত্রকলার কি অবস্থা ছিলো এসো দেখি।
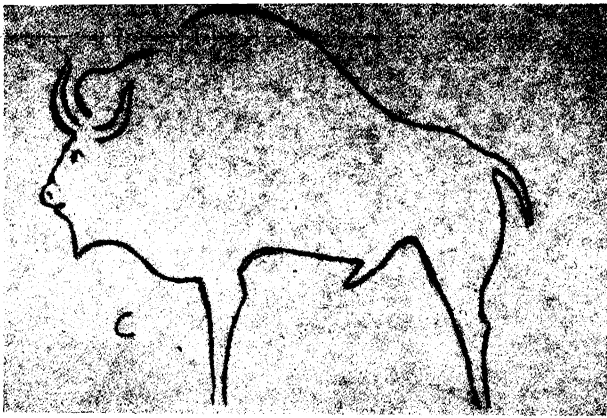
গুহাচিত্র : বাইসন
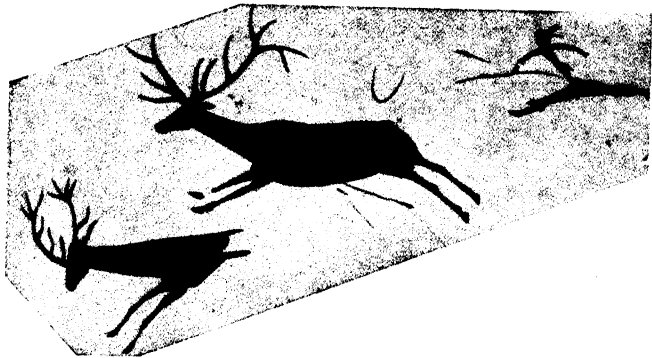
গুহাচিত্র : বল্লাহরিণ

গুহাচিত্র : শিকার

জত্তো : সেণ্ট ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে শোক

ফ্রা আঞ্জেলিকো : সেণ্ট নিকোলাসের ঐশী মহিমা
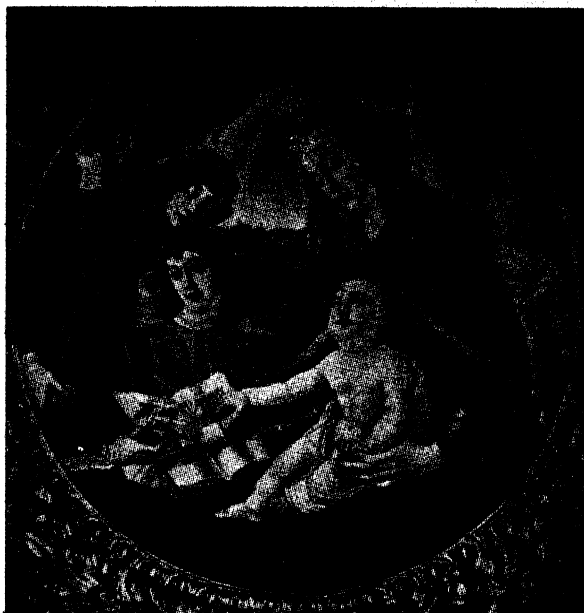
বতিচেল্লি : দা ম্যাগনিফিকাট বা মাদোনা অব্‌ভ দা করোনেশন
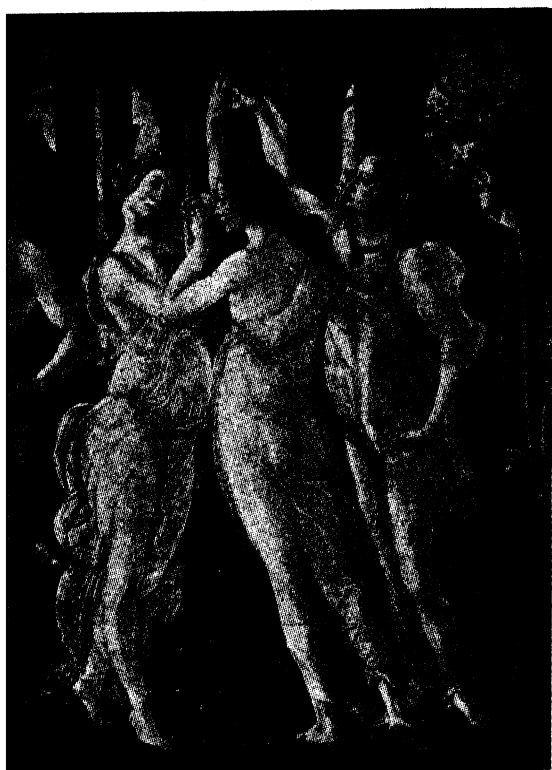
বতিচেল্লি : প্রিমাভেরা (অংশ)

পেরুজীনো : খৃষ্টের চার জন শিষ্য দাঁড়িয়ে আছেন

মিকেলাঞ্জেলো : নরকস্থ আত্মার মাথা

মিকেলাঞ্জেলো : সিস্তিন চ্যাপেলের অংশ (জেরিমায়া)

লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি : খৃষ্টের মাথা

লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি :: মোনা লিসা

লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি : একটি যুবতীর মাথা

লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি : মেরি, যীশু, সেণ্ট এলিজাবেথ ও সেণ্ট জন

জর্জনে : খৃষ্ট ক্রস্‌ বইছেন (ছবির অংশ)

তিশান : দস্তানাহাতে লোক

তিশান : অশ্বপৃষ্ঠে সম্রাট পঞ্চম চার্লস

তিন্তোরেত্তো : তীরন্দাজ

তিন্তোরেত্তো · সেণ্ট মার্কের দেহ আবিস্কার

আন্দ্রেয়া দেল সার্তো : মাদোনা অভ দা হাপিজ

করেজ্জো : পবিত্র রজনী
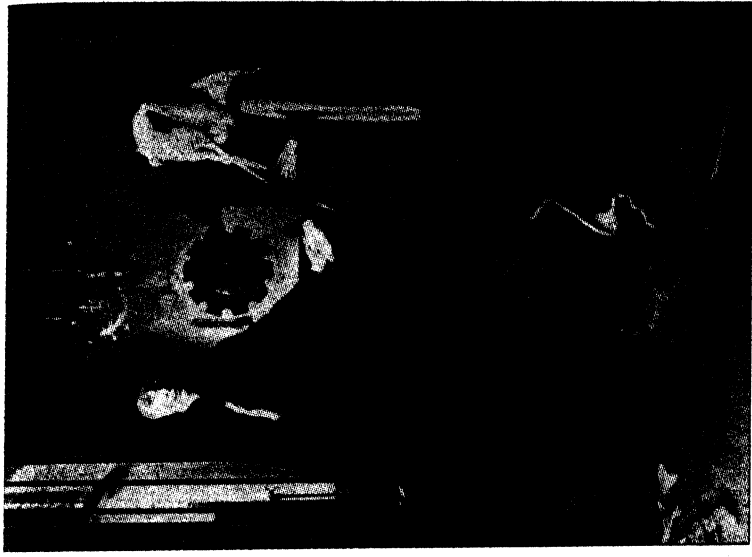
ইয়ান ভ্যান আইক : জভান্নি আর্নল্‌ফিনি আর তাঁর স্ত্রী

পীটর ব্রথেল :   গাঁয়ের বিয়েতে ভোজ

রুবেন্স : শিশু খৃষ্টের মাথা

রুবেন্স : সুজান ফুরমে

রুবেন্স : রুবেন্স আর তাঁর প্রথম স্ত্রী

ভ্যান ডাইক : ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস

গেন্‌স্‌বরা : ব্লু বয়

সপ্তম অধ্যায়

রনেসাঁস যুগে ইউরোপের অন্যদেশের শিল্পীরা

ফ্লেমিং

বলো তো ফ্লেমিং কাকে বলে ? চিড়িয়াখানার কোন অদ্ভুত জন্তুর কথা মনে হচ্ছে কি ? ফ্ল্যামিঙ্গো বলে তো এক রকম সারস পাখী আছে জানি। তারই কোন জাতভাই নয় তো ?

না, তা নয়, আসলে ফ্লেমিং তোমার আমার মতই মানুষ। ফ্লেমিং হচ্ছে, ফ্লাণ্ডার্স অঞ্চলের লোক, ফ্লেমিশও বলে। তবে ফ্লেমিং সম্বন্ধে মজার কথা হচ্ছে, কোন ফ্লেমিং ফরাসীও হতে পারে, বেলজিয়ানও হতে পারে, ডাচ্‌ম্যানও হতে পারে, আবার সোজাসুজি স্রেফ ফ্লেমিংও হতে পারে, কারণ ফ্লাণ্ডার্স এখন কতকটা ফ্রান্সে, কতকটা বেলজিয়ামে, বাকীটা হল্যাণ্ডে।

এখন যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলুম সেটা হচ্ছে, ইতালিতে 'আবার জন্মানো' যুগে, অর্থাৎ রনেসাঁসের প্রথম যুগে যখন মস্ত মস্ত শিল্পীরা ছবি আঁকছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ফ্লেমিংদের মধ্যেও বড় বড় শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিলো। অবশ্য ইতালিতে সে সময়ে যতজন বড় বড় শিল্পী ছিলেন, ফ্লাণ্ডার্সে ঠিক ততজন ছিলেন না, কিন্তু তবুও এ সময়ে ফ্লাণ্ডার্সে যতজন ছিলেন অন্য কোনও দেশে একসঙ্গে অতজন ছিলেন না। ম্যাপে ফ্লাণ্ডার্স কোথায় যদি দেখতে চাও, তবে বেলজিয়াম দেখো। বেলজিয়াম উত্তর সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে।

প্রথম যুগের ফ্লেমিশ শিল্পীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় দুই ভাইএর, নাম ভ্যান আইক। বড় ভাইএর নাম হিউবার্ট, ইয়ান ছোট ভাই। দুজনে ব্রুজ শহরে কাজ করতেন। ব্রুজ এখন আর তত বড় নগর নয়, কিন্তু ভ্যান আইকদের সময়ে ব্রুজ ছিল ইউরোপের মধ্যে একটা নগরের মত নগর, যেমন বড় তেমনি ধনী লোকের বাস।

বড়ভাই হিউবার্ট ভ্যান আইক অনুমান ১৩৬৬ সালে হল্যাণ্ডে

জন্মান, মারা যান গেণ্টে ১৪২৬ সালে। ছোট ভাই ইয়ান জন্মান ১৩৮৫ সালে, মারা যান ব্রুজে ১৪৪১ সালে।

দুই ভাই মিলে গেণ্ট শহরের সেণ্ট বেভন গির্জার জন্য একটি জগদ্বিখ্যাত অল্টার-পিস্ বা বেদীমঞ্চ আঁকেন। হিউবার্ট সম্বন্ধে যা জানা গেছে তাতে শুনি তিনি ১৪২০ সালে কাজটি হাতে নেন, তখন তিনি গেণ্টে। অল্টার-পিস্‌টির নাম 'অ্যাডোরেশন অভ দা ল্যাম'। কাজটি সম্পূর্ণ করেন ছোট ভাই ইয়ান।

অল্টার-পিস যে কোন ছবির মত নয়। তার তিনটি ভাগ, মধ্যেরটি বড়, দুপাশে দুটি ছোট ভাগ, সেগুলি ভাঁজ করা যায়। খানিকটা তিন ভাঁজ করা, পায়ার উপরে দাঁড় করানো, স্ক্রিনের মত। পাশের দুটি ভাগ বা পাল্লা ভাঁজ করে মধ্যের ভাগটির উপরে ফেলা যায়, জানালার কপাটের মত। অতএব ভ্যান আইকদের জানালার কপাটের ভিতরে বাইরে দুদিকেই ছবি আঁকতে হলো।

সমস্ত ছবিটা কিভাবে আরম্ভ হবে কিভাবে শেষ হবে, ছবির মধ্যে কি কি বিষয় থাকবে, কেমনভাবে থাকবে এ সমস্ত হিউবার্ট ছকে সব স্কেচ করে ঠিক করে রাখেন। কিন্তু সমস্ত অল্টার-পিসটি সম্পূর্ণ হবার আগেই হিউবার্ট মারা যান, ছোটভাই ইয়ান শেষ করেন। অল্টার-পিসটির খ্যাতি চারদিকে এত ছড়ালো যে বিভিন্ন শহর থেকে তাদের মিউজিয়ামের জন্যে সেটি কিনতে চেয়ে অনেক চিঠি এলো। শেষ পর্যন্ত তিনটি পাল্লা তিনটি শহরে বিলি হয়ে গেলো, মধ্যেরটি রইলো গেণ্টে, পাশের দুটি অন্য দুটি শহরে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনটি ভাগই আবার একত্র করা হয়, এবং তিনভাগে এখন অল্টার-পিসটি সম্পূর্ণ করে গেণ্টে রাখা হয়েছে।

হিউবার্টের হাতের কাজের নিদর্শন এখন আর প্রায় অন্য কিছুই নেই। অল্টার-পিসটি প্রায় একমাত্র ছবি যার থেকে বোঝা যায় তিনি কত বড় শিল্পী ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন মিউজিয়ামে ইয়ানের আঁকা কয়েকটি খুব বিখ্যাত ছবি এখনও খুব সযত্নে রাখা আছে। দুই ভাইই তেলরঙে আঁকতেন, তাঁরা তেলরঙের কাজ এত ভাল জানতেন আর বুঝতেন যে তাঁদের ছবিতে তেলরঙ অপূর্ব দেখায়, শুধু তাই নয়, মনে হয় যেন সত্ত আঁকা হয়েছে। তাঁদের তেলরঙের ব্যবহারের মহিমা দেখে সে সময়ের লোকের ধারণা হলো যে তাঁরাই তেলরঙের ব্যবহার

প্রথম আবিষ্কার করেন। এখনও অনেকের এই ধারণা আছে। যদিও একথা বলা যায় না যে ভ্যান আইকরাই তেলরঙের ব্যবহার প্রথম আরম্ভ করেন বা আবিষ্কার করেন, তবুও একথা বেশ বলা যায় যে তাঁরা তেল-রঙের এতখানি উন্নতি করেন এবং এত সুদক্ষভাবে তার ব্যবহার করেন যে তাঁদেরকে তেলরঙ ব্যবহারের আদি জনক বললে অত্যুক্তি হবে না। এটা ঠিক যে তাঁদের কাছ থেকেই ইতালিয়ানরা তেলরঙে ছবি আঁকা শেখেন।

ভ্যান আইকদের পর বহু বড় বড় শিল্পী ফ্লাণ্ডার্সে জন্মান কিন্তু এই ছোট্ট বইয়ে তাঁদের কথা বলা চলবে না। তবে ফ্লেমিশদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় তাঁর কথা না বললে অন্যায় হবে। তিনি ভ্যান আইকদের দুশো বছর পরে জন্মেছিলেন, অর্থাৎ ১৫৭৭ সালে জন্মে ১৬৪০ সালে মারা যান। তাঁর নাম পীটর পল রুবেন্স।

ছেলেবেলায় পীটর পল নিশ্চয়ই খুব মেধাবী ছিলেন, কারণ অতি অল্প বয়সে তিনি সাতটা ভাষা বলতে পারতেন—ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, ইংরেজি, জার্মান আর ডাচ! তোমাদের মধ্যে কয়জন সাতটা ভাষা জানো তাই ভাবো তো?

অল্প বয়সে পীটর পল ইতালিতে একজন ড্যুকের কাছে কয়েক বছর কাজ করেছিলেন। রুবেন্সের কাজ ড্যুকের এত পছন্দ হলো যে তিনি কিছুতেই তাঁকে ছাড়বেন না। হঠাৎ একদিন ফ্লাণ্ডার্স থেকে রুবেন্স চিঠি পেলেন যে তাঁর মার খুব অসুখ। সেই মুহূর্তে রুবেন্স, ড্যুকের অনুমতির অপেক্ষা না করেই বাড়ীর দিকে রওনা দিলেন।

ফ্লাণ্ডার্সের কর্তারা রুবেন্সকে ফিরে পেয়ে মহা খুসী। অনেকগুলি ছবি আঁকার ফরমাস তো তাঁকে দিলেন, উপরন্তু তাঁকে আরও অন্যান্য কাজে লাগালেন। এমন কি স্পেনে, ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে তাঁকে শক্ত শক্ত কাজ দিয়ে পাঠানো হলো। রুবেন্স ছবি আঁকার সঙ্গে রাষ্ট্রের দৌত্য কাজও করলেন। যেখানেই গেলেন সেইখানেই তাঁর অনেক বন্ধু হলো। স্পেনের রাজা তাঁকে রাজসম্মানে ভূষিত করলেন, নাইট করে দিলেন। ইংলণ্ডের রাজাও তাঁকে নাইট উপাধি দিলেন। চারদিক থেকে তিনি সম্মান পেলেন। সেই সঙ্গে ছবির পর ছবি এঁকে চললেন। তাঁর বাড়ীতে ছিলো এক প্রকাণ্ড স্টুডিও, সেখানে অনেক অল্পবয়স্ক শিল্পী এসে ছবি আঁকা শিখতো আর সেই সঙ্গে রুবেন্সকে তাঁর কাজে সাহায্য

করতো। প্রকাণ্ড বড় বড় ছবি আঁকতে রুবেন্সের খুব ভাল লাগতো। সেই জন্যে তিনি তাঁর স্টুডিওর সিঁড়ি খুব বড় আর চওড়া করে তৈরি করিয়েছিলেন যাতে তাঁর সবচেয়ে বড় বড় ছবিও আঁকার পর অক্লেশে বাইরে নিয়ে যাওয়া যায়।

রুবেন্সের ছবি জমকালো, উজ্জ্বল রঙের জন্যে বিখ্যাত। সব রকম ছবিই তিনি আঁকতে পারতেন—মানুষের প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, জন্তুজানোয়ার, যুদ্ধের দৃশ্য, ধর্মবিষয়ক ছবি, পুরাণ বা ইতিহাসের ছবি, সবই তাঁর আয়ত্তে ছিলো। তার মধ্যে কতগুলি এত কর্মব্যঞ্জক আর উত্তেজনায় ভর্তি যে শুধু তাকিয়ে দেখলেও উত্তেজনা আসে। 'সিংহ শিকার' ছবিটি এই ধরনের। ঘোড়ায় চড়ে শিকারীরা বর্শা নিয়ে সিংহকে আক্রমণ করছে, সিংহ হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে আসছে, ছবিটি দেখলেই বোঝা যায় সিংহ শিকার কি শক্ত ব্যাপার, কাপুরুষদের কর্ম নয়। তোমাদের মনে কৌতূহল হতে পারে অমন জীবন্ত সিংহ রুবেন্স আঁকলেন কী করে! শুনলে অবাক হবে, ছবিটা আঁকার জন্যে রুবেন্স জলজ্যান্ত একটি সিংহ ভাড়া করে বাড়ীতে রেখেছিলেন। তাকে তিনি মড্‌ল্‌ হিসেবে ব্যবহার করতেন।

তাঁর সমসাময়িকদের মত রুবেন্সও পুরাকালের ছবি আঁকার সময়ে পুরাণের লোকদের তাঁর সময়ের, তাঁর দেশের, পোষাক পরিয়ে দিতেন। পুরাকালের গ্রীক স্ত্রী-পুরুষরা সতেরো শতাব্দীর ফ্লেমিশ পোষাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ দৃশ্য তখনকার লোকের চোখে মোটেই বিসদৃশ ঠেকতো না। কিন্তু আজকাল আর তা হয় না। আজকালকার শিল্পীরা যে যুগের লোকের ছবি আঁকেন, তাদের সেই যুগের পোষাক নিখুঁতভাবে আঁকার চেষ্টা করেন, তার জন্যে নানা বই, নানা ছবি ঘাঁটতে কসুর করেন না।

অনেকের মতে 'ক্রস থেকে অবরোহণ' ছবিটি হচ্ছে রুবেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি। এতে যীশুর শিষ্যরা তাঁর মৃতদেহ ক্রস থেকে নামাচ্ছেন। বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প ক্যাথিড্রালে এটি আছে।

রুবেন্সের আঁকা একটি ছবি প্রত্যেকের ভাল লাগতে বাধ্য, সেটি তাঁর নিজের দুই ছেলের। বড়টির বয়স এগারো, ছোটটির সাত, এই সময়ে রুবেন্স তাঁদের একটি ছবি আঁকেন। হঠাৎ ছবিটা দেখলে মনে হয় ছেলে দুটি যেন এখনি কথা কয়ে উঠবে! অথচ ছবিটা ছবিই, রঙে আঁকা ফটোগ্রাফ নয়।

কুঁড়েমি করা রুবেন্সের ধাতে সইতো না, সারাক্ষণ উর্ধ্বশ্বাসে যেন কাজ করতেন। সর্বদা এত কাজ করেও তিনি বরাতমত ছবি এঁকে কুলিয়ে উঠতে পারতেন না, এত লোকে তাঁর ছবি চাইতো। সময়ে সময়ে ছাত্রদের দিয়ে গৌণ অংশগুলি আঁকাতেন যাতে তারা নিজেরা শেখে, আর সেই সঙ্গে ছবিও তাড়াতাড়ি শেষ হয়। অন্য শিল্পীদের সদাই সাহায্য করতে প্রস্তুত, রুবেন্সের মত এ রকম উদারহৃদয় সতীর্থ সচরাচর দেখা যায় না। সাধারণত শিল্পীরা অন্য শিল্পী সম্বন্ধে অসহিষ্ণু, নিন্দুক, আর সাহায্য করতে অনিচ্ছুক হয়। কিন্তু রুবেন্স প্রায়ই গরীব শিল্পীদের ছবি পয়সা দিয়ে কিনতেন, তাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। রুবেন্সের চরিত্রের এই দিকটা খুব মহৎ ছিলো; একবার একজন শিল্পী তাঁর শত্রুতা করেন, রুবেন্স প্রতিহিংসার চেষ্টা তো করলেনই না, উল্টে তাঁর মনটা বিচলিত হয়েছিলো বলে লজ্জিত হয়ে তাঁর কতগুলি ছবি কিনে ফেললেন।

রুবেন্স এত যত্ন নিয়ে এতগুলি ছেলেকে তাঁর স্টুডিওতে ছবি আঁকা শেখান যে তাদের মধ্যে কয়েকজন অচিরেই বিখ্যাত শিল্পী হয়ে উঠলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি বিখ্যাত হলেন, তাঁর নাম অ্যাণ্টনি ভ্যান ডাইক। ভ্যান ডাইক ইংলণ্ডের বসবাস উঠিয়ে নিয়ে যান এবং সেখানে রাজদরবারে ছবি আঁকার কাজ নেন। ইংলণ্ডের রাজা তাঁকে নাইট উপাধি দেন। স্যর অ্যাণ্টনি ভ্যান ডাইক রাজা-মহারাজা, আমীর-ওমরা আর তাঁদের পরিবারদের ছবি এঁকে খ্যাতিলাভ করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ধর্মবিষয়ক ছবিও তিনি কিছু এঁকেছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের ছেলেমেয়েদের একটি খুব সুন্দর ছবি ভ্যান ডাইক আঁকেন।

যেসব আমীর-ওমরার ছবি ভ্যান ডাইক এঁকে গেছেন তাদের প্রায়ই প্রত্যেকের একটু করে ছুঁচলো দাড়ি ছিলো। আর যেহেতু তাদেরই ছবি আঁকার জন্যে ভ্যান ডাইকের খ্যাতি সেহেতু ঐ ধরনের ছোট ছুঁচলো দাড়ি দেখলেই আমরা বলি ভ্যান ডাইক দাড়ি। ভ্যান ডাইকের প্রায় সব ছবিতেই লম্বা, মোলায়েম, সুশ্রী হাত দেখতে পাওয়া যায়; প্রবাদ আছে যে এই সব ছবিতে তিনি নিজেরই লম্বা, সুন্দর গড়নের হাত এঁকেছেন।

আরও অনেক ফ্লেমিশ শিল্পীর কথা বলা উচিত ছিলো। কিন্তু একটি ছোট্ট অধ্যায়ে খুব বেশী তো বলা যায় না। অথচ ফ্লেমিংদের

সম্বন্ধে এইটুকু বললে হয়তো তোমাদের ভুল ধারণা থেকে যাবে যে চিত্রকলার ইতিহাসে তাঁদের স্থান খুব উঁচুতে নয়। কিন্তু আসলে ঐ ছোট্ট দেশে এত ভাল ভাল শিল্পী জন্মেছেন আর কাজ করেছেন যে ভাবলে অবাক হতে হয়। এ অধ্যায়টি শেষ করার আগে তোমাদের তিনটি বিখ্যাত ফ্লেমিশ শিল্পীর কথা বলা একান্ত দরকার। তাঁরা তিনজনেই ভ্যান আইক আর রুবেন্সের মধ্যবর্তী সময়ে বেঁচে ছিলেন আর কাজ করে গেছেন। তাঁদের একজন বাবা, আর দুইজন ছেলে, সুতরাং তিনজনেরই নাম এক—বেল্লিনিদের মত—ব্রখেল বা ব্রুগাল। পীটর ব্রখেল ছিলেন বাবা, জন্ম ব্রখেলেই, ১৫২৫ সালে, মারা যান ব্রাস্‌ল্‌সে ১৫৬৯ সালে। তিনিই সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। ইয়ান ব্রখেল ছিলেন এক ভাই, তিনি ব্রাস্‌লসে জন্মান ১৫৬৮ সালে, মারা যান ১৬২৫ সালে। অন্য ভাইটি অত বিখ্যাত নন। পীটর ব্রখেল ঐ যুগে ছবির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রায় বিপ্লব এনেছিলেন। তখন সারা ইওরোপে অধিকাংশ ছবিরই বিষয় ছিলো হয় বাইব্‌লের কাহিনী না হয় গ্রীক দেবদেবীর কমনীয় গল্প। কিন্তু পীটর ব্রখেল ছবিতে আঁকলেন এমন সব বিষয় যা অতি সাধারণ, অতি দৈনন্দিন, এমনকি সময়ে সময়ে অতি গরীব, নোংরা, নিষ্ঠুর। আর সব ছবিই যেন দুঃখে সুখে, হাসি-কান্নায়, রক্তমাংসে, কেনাবেচার ভীড়ে, রাস্তাহাটের চীৎকার, চেঁচামেচিতে ভরা। দু-একটা ছবির নাম বললেই বুঝতে পারবে—'গরীবপাড়ায় বাজারতলায় ছোট ছেলেদের খেলা', 'বরফপড়া দেশে শীকারীর দল', 'গ্রামের মেলায় কৃষকদের নাচ', 'গ্রামের বিয়ে', 'গরুঘোড়ার জন্যে ঘাস কাটা', 'মেলায় বিয়ের নাচ'। এক-একটা ছবি যেন লোকে গিস্‌গিস্‌ করছে, নানাভঙ্গীর স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়েতে ঠাসা। জীবনের সব কিছুতেই যেন পীটর অপার আনন্দ পেতেন, উৎসব মনে করতেন। ব্রখেল আমার নিজের খুব প্রিয় শিল্পী। একদিকে ভ্যান আইকদের শান্ত, ধীর, নিপুণতা, অন্যদিকে রুবেন্সের জমকালো দরবারী ছবি, মাঝখানে ব্রখেলদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবন নিয়ে অপার আনন্দ, যার কিছুটা রুবেন্সের ছবিতেও মাঝে মাঝে দেখা দিতো; সত্যিই, ফ্লেমিংদের মধ্যে বৈচিত্র্যের কিছু অভাব ছিলো না। আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই ব্রখেলদের ছবিতে ইতালীয় পদ্ধতির চিহ্ন খুব কমই দেখা যায়। ইয়ান ব্রখেলের ছবিতে একটি বিষয় বিশেষভাবে দেখা দেয়—সেটি হচ্ছে চিত্রে

আমরা যাকে বলি স্টিল-লাইফ, অর্থাৎ প্রাণহীন বস্তুর ছবি, যেমন ফল-ফুল, মরা মাছ, ঘটিবাটি, ঘরে সাজানো কাটা ফুল, মরা খরগোস বা পাখী, হাঁড়ি, থালা, বাটি, ইত্যাদি।

যাই হোক ছয়সাত জন ফ্লেমিং শিল্পীর কথা বলা হলো। তাঁরা হলেন দুজন ভ্যান আইক, দুজন ব্রখেল, রুবেন্স আর ভ্যান ডাইক। বড় হলে অন্যদের কথা জানতে পারবে, আর যদি ইতালি থেকে বেল্‌জিয়ামে পাড়ি দাও তাহলে তাঁদের দেশ আর ছবি দুই-ই দেখতে পাবে।

* * *

দুজন ডাচ্ শিল্পী

ফ্লাণ্ডার্সের লাগ্‌উত্তরে উত্তর সমুদ্রের কূলে হচ্ছে নেদারল্যাণ্ড্‌স্, যাকে বাংলায় অনুবাদ করা যায় নীচু জমি। এদেশের অনেকখানি সমুদ্রের বুক থেকে উদ্ধার করা। সমুদ্রের মধ্যে দেয়াল তুলে, দেয়ালের মধ্যেখানের জমি থেকে জল ছেঁচে বার করে দিয়ে, সে জায়গা মাটি ভরাট করে, তবে দেশটা বেড়েছে। দেশময় খালি কাঠের জুতো, হাওয়ায় চলা কল, টিউলিপ আর হায়াসিন্থ ফুল, আর আছে বিখ্যাত জাইড'-জি, বড় বড় খাল আর বাঁধ। প্রায়লোকেই নেদারল্যাণ্ড্‌স্ বলতে হল্যাণ্ড বোঝে, কিন্তু আসলে সেটা ঠিক নয় কারণ হল্যাণ্ড নেদারল্যাণ্ড্‌সের একটি অংশমাত্র। নেদারল্যাণ্ড্‌সের লোকদের আমরা সাধারণত ডাচ্ বলি।

ইতালিয়ান আর ফ্লেমিশদের মত ডাচ্‌দেরও রনেসাঁস এলো, অবশ্য ইতালিয়ান বা ফ্লেমিশ 'আবার-জন্মানো' যুগের ঢের পরে। কিন্তু যখন এলো তখন ডাচ্‌দের মধ্যে থেকে জগদ্বিখ্যাত শিল্পী বেরুলো।

ডাচ্‌রা যা ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন তা ইতালিয়ান বা ফ্লেমিশ ছবি থেকে অনেক তফাৎ। দক্ষিণ ইওরোপের লোকরা রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী, আর ডাচরা প্রটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বী। সুতরাং রোমান ক্যাথলিকরা যেমন গির্জায় ছবি এঁকে সাজাতে ভালবাসতেন, ডাচ্‌দের মোটেই সেদিকে উৎসাহ ছিলো না। তাই ডাচরা খুব কমই ধর্ম-বিষয়ক ছবি আঁকেন, তাঁদের আঁকা মাদোনা বা পূত পরিবারের (জোসেফ

মেরি ও যীশু) ছবির সংখ্যা খুবই কম। তার বদলে তাঁরা আঁকতেন লোকের প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, দৈনন্দিন জীবন, চারদিকের অতি সাধারণ লোক, যে-বিষয়ে পীটর ব্রেখেলকে অগ্রণী বলা যায়।

তাছাড়া তাঁদের ছবি অন্যান্য দিক দিয়েও আলাদা। আগেকার ছবিতে, যেমন ফ্লাণ্ডার্সে বা ইতালিতে, শিল্পীরা যখন প্রতিকৃতি আঁকতেন তখন স্ত্রী বা পুরুষের মুখে তাঁদের স্বাভাবিক ভাব বা স্বাভাবিক প্রকৃতি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন. অর্থাৎ যে-ভাব সদাসর্বদা মানুষটির পরিচয় হিসেবে লোকে জেনে অভ্যস্ত। ছবি দেখে মনে হয়, শিল্পী যার ছবি আঁকছেন তাঁকে ডেকে বলছেন, 'আচ্ছা এখন চুপ করে বসুন, নড়বেন না, চড়বেন না, দাঁড়ান আপনার ছবিটা আমি এঁকে নিই।' কিন্তু কোন কোন ডাচ্ শিল্পী এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা নিয়ে ছবি আঁকতে বসে গেলেন। যেমন, একজন ডাচ্ শিল্পী, নাম ফ্রাঞ্জ হ্যাল্স্ বা হ্যাল্জ্ এমন কতগুলি ছবি আঁকলেন যে দেখেই মনে হয়, যাদের তিনি এঁকেছেন তাদের তিনি চুপ করে বসতে বলেননি, 'স্বাভাবিক' হয়ে তাকাতে বলেননি। ফ্রাঞ্জ হ্যাল্সের ছবিতে দেখা গেলো, ক্ষণিক মুহূর্তের পলাতক চাউনি আর ভাব। মুহূর্তের মৃদুহাসি বা প্রাণখোলা অট্টহাসি, বা ভ্রূকুটি—যা মুহূর্তের জন্যে এসেই মিলিয়ে যায়—ফ্রাঞ্জ হ্যাল্স্ সেই মুহূর্তের মুখটি খুঁজে বেড়াতেন আর ছবিতে ধরতেন। তাঁর ছবি দেখে মনে হবে, পরমুহূর্তেই মুখের চেহারা বদলে যাবে।

আরও এক বিষয় হ্যাল্সের কয়েকটি ছবি পূর্বজদের ছবির থেকে তফাৎ। এসব ছবিতে তুলির টানগুলি ভাল করে সমান করে, মসৃণ করে দেয়া নেই, দেখে মনে যেন রঙের মধ্যে তুলিটি আটকে গিয়েছিলো, যেন শিল্পী যত তাড়াতাড়ি পারেন ছবিটি শেষ করার জন্যে উদ্‌গ্রীব, তাই তুলির কয়েকটি মোটা টানে মুখের সেই মুহূর্তের ভাবটুকু ফুটিয়ে খালাস হতে চান। অবশ্য সব ছবিই এরকম নয়। অনেক ছবিই অতি যত্ন করে, প্রত্যেকটি তুলির টান ভাল করে মিলিয়ে দিয়ে আঁকা। যেমন ধরা যাক, 'লাফিং ক্যাভালিয়' বলে জগদ্বিখ্যাত ছবিটি। ছবিটি এমন যত্ন করে, নিখুঁত করে আঁকা যে হাতের লেসের প্রতিটি সুতো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ছবিতে লেস আঁকা সহজ কথা নয়। লাফিং ক্যাভালিয় কিন্তু সত্যিই হাসছে না। ঠোঁটে তার ঠিক হাসি নয়, শুধু আত্মসর্বস্ব একটু ভঙ্গী, যেন নিজের মহিমায় মহা খুসী।

হ্যাল্‌সের আরেকটি ছবি আছে তাতে তাঁর তাড়াতাড়ি তুলি চালানোর কাজ বেশ বোঝা যায়, এধরনের কাজে তাঁর কতখানি দক্ষতা ছিলো তাও বোঝা যায়। ছবিটার নাম 'মাল্ বাব্'; একটি স্ত্রীলোক টিয়াপাখী নিয়ে বসে, সমুখে টেবিলে একটা মদের বড় পাত্র। টিয়াপাখীটা দেখলে পেঁচা বলে ভুল হবে, আর বুড়ীকে দেখলেই ভয় হয়। অনেকে ছবিটাকে 'হার্লেমের ডাইনী' বলেও জানে। হ্যাল্‌স্ হলাণ্ডের হার্লেম শহরে থাকতেন। ১৫৮০ সালে বেল্‌জিয়ামের অ্যান্‌ভার্স শহরে ফ্রাঞ্জ হ্যাল্‌স্ জন্মান, মারা যান হার্লেমে ১৬৬৬ সালে।

ফ্রাঞ্জ হ্যাল্‌সের জীবদ্দশায় নেদারল্যাণ্ড্‌স্ রাজ্য সদ্যমুক্ত, স্বাধীন দেশ। নব অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে সেদেশের প্রত্যেককে তখন ফৌজে ভর্তি হয়ে যুদ্ধ ও অস্ত্র শিক্ষা করতে হতো। বন্দুক, কামান, বারুদ, তখন সবে চালু হয়েছে তাই তখন অনেক সৈন্যবাহিনীর নাম ছিলো তীরন্দাজ বাহিনী বা আড়া-ধনুক বাহিনী। যেমন এখনও ভারতীয় সৈন্যদলে যারা ট্যাঙ্কবাহিনীতে আছে তাদের মাঝে মাঝে ঘোড়সওয়ার বাহিনী (ক্যাভালরি) বা বর্শাবাহিনী (লান্সার্স) বলে। কোন কোন সৈন্যদলের সব অফিসাররা মিলে হয়তো কখনও তাঁদের দলের ছবি একসঙ্গে আঁকিয়ে নিতেন, সেইভাবে হ্যাল্‌স্ তীরন্দাজ আর অন্যান্য বাহিনীর বেশ কয়েকটি ছবি আঁকেন। অনেকের ধারণা রেমব্রাণ্টকে বাদ দিলে প্রতিকৃতি-আঁকিয়ে হিসেবে হ্যাল্‌স্‌ই ডাচ্ শিল্পীদের মধ্যে সর্বপ্রধান।

শিল্পীশ্রেষ্ঠ রেম্‌ব্রাণ্ট তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল অ্যামস্টরড্যাম শহরেই কাটিয়েছেন। হার্‌মেন্‌জ্ ভান রাইন রেম্‌ব্রাণ্ট লাইড্‌ন্ শহরে ১৬০৬ সালে জন্মান, মারা যান অ্যামস্টরড্যামে ১৬৬৯ সালে। তিনি শুধু লোকের প্রতিকৃতিই নয়, বরং এমন বিষয় নেই যা আঁকেননি।

রেম্‌ব্রাণ্ট ছবিতে এমন এক আলোর সৃষ্টি করেন যা ঠিক দিনের আলোও নয়, রাত্তিরের বাতির আলোও নয়। সত্যিকারের দিনের আলো হলে ছবিগুলি আরও হাল্কা হয়ে যেতো, গভীরত্ব আসতো কম; অথচ রাত্তিরের বাতির আলো হলে, ছবিগুলিতে আরও বেশী আলো অন্ধকার হতো। রেম্‌ব্রাণ্ট ছবিতে যে আলোর সৃষ্টি করলেন তাতে ছবির মধ্যস্থলটি হতো এক অপূর্ব তীব্র আলোয় উজ্জ্বল, আর চারদিকে গভীর অন্ধকার। আজকাল চলচ্চিত্রের পরিচালকরা মাঝে মাঝে

তাঁদের জোরালো বীমফেলা আর্কল্যাম্প দিয়ে কোন কোন ফিল্মে রেম্‌ব্রাণ্টের ছবির আভাস আনার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে অনেক বছর ধরে তিনি বহু পরিশ্রম করে, অনেক ছবি এঁকে, খুব আনন্দে কাটালেন, তাতে পয়সা হলো খুব, খ্যাতি হলো তার চেয়ে বেশী। কিন্তু সুন্দর সুন্দর দামী দামী জিনিস কেনার বাতিক তাঁর এত বেশী ছিলো যে শেষ-কালে তাঁর বিস্তর ধার হয়ে গেলো। সেইসঙ্গে তাঁর ছবির কদরও পড়ে গেলো। ফলে বুড়োবয়সে টাকার অভাবে রেম্‌ব্রাণ্ট বড় কষ্ট পেয়েছিলেন।

যে-ছবি পরে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ ছবি বলে গণ্য হলো, যে ছবির তুলনা নেই বললেই চলে, সেই ছবি যখন প্রথম আঁকা হয় তখন সকলে হাসাহাসি করেছিলো, সে-ছবি আঁকার জন্যে রেম্‌ব্রাণ্টের সুনাম নষ্ট হয়ে গেলো, একথা যদি আজ তোমাদের বলি, তোমরা বিশ্বাস করবে কি? অথচ সত্যিই তাই হয়েছিলো। রেম্‌ব্রাণ্টের একটা ছবি আছে তার নাম 'রাতের পাহারা'। বিপদের সময়ে শহরের যে রক্ষীদল রাত্তিরে নগর পাহারা দিতো সেইদল রেম্‌ব্রাণ্টকে এই ছবিটি আঁকার বরাত দেন। ঠিক ছিলো ছবিটি আঁকা হলে রক্ষীদলের ক্লাবঘরে তা টাঙানো হবে, আর দলের প্রত্যেকটি সভ্য চাঁদা দিয়ে রেম্‌ব্রাণ্টকে ছবি আঁকার পারিশ্রমিক দেবেন।

বিপদের খবর পেয়ে রক্ষীদল ছুটে বেরিয়ে এসেছে, রেম্‌ব্রাণ্ট সেই সময়ের ব্যস্তসমস্ত ভাব আর উত্তেজনা ছবিতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন। সমুখে দলের ক্যাপ্টেন আর লেফ্‌টেনাণ্ট, পিছনে রক্ষী-বাহিনীর অন্য সকলে বন্দুক বর্শা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসছে। ছেলেরা ছুটে বেরিয়ে এসেছে তামাসা দেখতে, এমনকি একটা কুকুরও পায়ের ফাঁকে ছুটে বেড়াচ্ছে। কয়েকটি লোকের গায়ে আলো খুব উজ্জ্বল হয়ে পড়েছে, বাকী সকলে প্রায় রাত্রির অন্ধকারে। তবুও আলোটি বাতি বা মশালের আলো থেকে এত তফাৎ যে অনেকে ভুল করে মনে করেন যে ছবিটি দিনের বেলার কোন ঘটনা নিয়ে আঁকা। 'রাতের পাহারা' বলা উচিত নয়।

যারা ছবিটা বরাত দিয়েছিলো, তারা যখন ছবিটি দেখলো তখন রেগেই আগুন। তারা চেঁচামেচি করে উঠলো:

'আমাদের প্রত্যেকের মুখ, শরীর যাতে ভাল করে ওঠে তার জন্যেই

না আমরা চাঁদা করে ছবির দাম দেবো! আর এ কি হয়েছে? আমাদের এমন করে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে, যে কারুকে দেখা যাচ্ছে না।'

অন্য সকলে যারা দেখতে এসেছিলো তারা হেসে উঠলো, বললো 'বোঝাই যাচ্ছে না, রাত না দিন!' তারপর থেকে রেম্‌ব্রাণ্টের খুব কম ছবি বিক্রী হতো।

জানি না আমাকে তোমাদের ফরমাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে কিনা এমন একটি তালিকা তৈরি করে দিতে যাতে আমি প্রথম দেবো পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর নাম, তার পর, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এমনি করে পঁচিশ, পঞ্চাশ বা একশোটি শিল্পীর নাম। অবশ্য যদি আমাকে একাজ করতেও বলো তাহলেও আমি করবো না; করতে ইচ্ছে হয় না বলে নয়, তার কারণ পৃথিবীতে কেউই এরকম কোন নির্ভুল, সর্ববাদি-সম্মত তালিকা করতে পারে না বলে। আমি যদি করতুম তাহলে সেটি হতো নিতান্তই আমার, আমার নিজস্ব মত। সে তালিকাতে হয়তো পৃথিবীর সত্যিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম সর্বপ্রথম, তারপরে দ্বিতীয়, তৃতীয় করে থাকবে না, সেই তালিকায় থাকবে তাঁরই নাম প্রথম যাঁকে আমি প্রথম বলে, বা দ্বিতীয় বলে মনে করি। অথচ আমি কারুকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করলেই তিনি তো তখনই সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে গেলেন না। কোন শিল্পীই জগতে এমন অবিসংবাদিতভাবে, সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নন যাঁর কথা সকলেই একসঙ্গে মনে করে চেঁচিয়ে বলবে অমুকই সর্বশ্রেষ্ঠ।

কিন্তু যাঁরা চিত্রকলা বিষয়ে ভালরকম জানেন, তাঁরা সকলেই যদি প্রত্যেকে একটি করে এইরকম নিজের নিজের লিস্ট করেন, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রত্যেকের তালিকাতেই রেমব্রাণ্টের নাম প্রথম কয়েক জনের মধ্যেই থাকবে।

তাহলে বুঝে দেখো রেমব্রাণ্টকে লোকে কত বড় শিল্পী মনে করে। আর যদি তোমাদের কোনদিন রেম্‌ব্রাণ্টের আসল ছবি দেখার সৌভাগ্য হয়—আলগা ছাপা ছবি বা কোন বইয়ে ছাপা নয়—তাহলে আমার অনুরোধ যে তোমরা অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে সেটি দেখবে। তার পর তোমার নিজের তালিকায় রেম্‌ব্রাণ্টের স্থান কত উঁচুতে সেটা জানার কৌতূহল আমার রইলো।

এতখানি লিখে এখন মনে হচ্ছে বইটা না লিখতে বসলেই ভাল হতো। প্রথমত সব শিল্পী দূরের কথা, বড় বড় শিল্পীদের নামই সব বলা হলো না। দ্বিতীয়ত ইওরোপের সব দেশের কথাও বলা হলো না। এক একটি দেশের কথা ভাবি আর তাদের চিত্রকলার সম্পদ, শিল্পীদের নামের প্রকাণ্ড তালিকার কথা ভেবে স্তম্ভিত হতে হয়, মনে হয় এ শুধু পণ্ডশ্রম। এর পরে যদি ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে কোনদিন লিখি তাহলে যেমন ভারতের গুহাচিত্র, তারপর আস্তে আস্তে মন্দিরচিত্র, পাণ্ডুলিপিচিত্র, পাঠান, রাজপুত, পাহাড়ী, উড়িষ্যা, কাংড়া, কুলু, গাড়ওয়ালী, ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের, শত শত শিল্পীর নাম নিয়ে হাবুডুবু খাবো কূল পাবো না। কিন্তু তবুও এই ছোট্ট বই লেখা সার্থক হবে যদি তোমাদের ইওরোপীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগাতে পারি, এবং আমি সামান্য যে কয়জনের নাম করতে পারবো তার সূত্র ধরে অন্যান্য বহু শিল্পীর বিষয়ে তোমরা পড়াশুনা করো। আরেকটি ধারণা তোমাদের মনে আমার খুব ঢুকিয়ে দিতে দিতে হচ্ছে, সেটি হচ্ছে যে চিত্রকলাতেও নানা দেশের ছবি দেখাশোনা, ভাবের আদান-প্রদানের চর্চার, খুব প্রয়োজন, কারণ জগজ্জয়ী প্রতিভাও স্বয়ম্ভূ নয়; নানা জিনিস নানা ভাবে, নানা দেশে, নানা বইয়ে, নানা লোকের সঙ্গে আলোচনা না করলে প্রতিভাও ম্লান হয়ে পড়ে, তার প্রকৃত স্ফুরণ হয় না।

এখন তোমাদের ছুটি জামান শিল্পীর কথা বলবো। জার্মানিতেও অনেক বড় বড় শিল্পী জন্মেছেন, সকলের কথা বলা অসম্ভব। তবে প্রথমেই যাঁর কথা মনে হয়, যিনি জার্মান শিল্পীদের গুরু বলা চলে তাঁর নাম অ্যালব্রেক্ট ডিউরর।

১৪৭২ সালে অ্যাল্‌ব্রেক্ট ডিউরর ন্যুরেমবর্গ শহরে জন্মান। তাঁর বাবা ছিলেন স্যাকরা; পরবর্তী জীবনে তিনি এন্‌গ্রেভিং আর কাঠ খোদাই কাজে যে প্রতিভার পরিচয় দেন তার কিছুটা উত্তরাধিকারসূত্রে রক্তে পাওয়া। বাবার দোকানে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি স্যাকরার কাজ ছেড়ে শহরের শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাইকল ভোল্‌গেমুটের কাছে কাজ শিখতে গেলেন। এরপর তিনি কিছুদিন দেশবিদেশে ঘুরে

বেড়ালেন, ভেনিসে গেলেন, র‍্যাফেইলের সঙ্গে দেখা করলেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি কাঠ খোদাই আর তামার পাতে এবং কাঠে এন্‌-গ্রেভিং করে অনেক দিন কাটান। কিন্তু দ্বিতীয়বার ভেনিস থেকে ফিরে এসে ছবি আঁকাতেই মন দিলেন। নিজের হাতে লেখা তাঁর ডায়ারি এখন প্রকাশিত হয়েছে. তাতে লিখেছেন কি করে ইতালিতে গিয়ে তিনি ফ্লরেন্সে, ভেনিসে দিনের আলোর খেলা দেখলেন, কি করে ছবিতে পরস্পেক্‌টিভ আঁকা শিখলেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি নেদারল্যাণ্ড্‌সে যান আর সম্রাট পঞ্চম চার্লসের দরবারে শিল্পী নিযুক্ত হন। তিনি নুরেমবর্গে মারা যান ১৫২৮ সালে! জার্মান সরকার নুরেমবর্গে তাঁর পুরানো বাড়ীটি ডিউরর মিউজিয়ম করে রেখেছেন।

তাঁর জন্মমৃত্যুর তারিখ মেলালেই বুঝতে পারবে, ডিউরর, তিশান, তিন্তোরেত্তো, মিকেলাঞ্জেলো, লেঅনার্দোদা ভিঞ্চি, র‍্যাফেইলের সম-সাময়িক ছিলেন। তাঁদের অনেককেই তিনি বিশেষ করে জানতেন, ভেনিসে গিয়ে তাঁদের মধ্যে কিছু দিন ছিলেন। এই সময়টা জার্মানিরও 'আবার জন্মানো'র দিন বলা যায়। ঠিক যে সময়ে ইতালি বা ফ্লাণ্ডার্সে, এবং একটু পরে নেদারল্যাণ্ডসে, রনেসাঁসের যুগ শুরু হলো, সেই সময়ে জার্মানিতেও রনেসাঁস শুরু হলো।

ইতালিয়ান শিল্পাদের সঙ্গে অত আলাপ থাকা সত্ত্বেও, ডিউরর তাঁদের মত আঁকেন নি। ডিউরর অনেক ধরনের ছবি এঁকেছেন তার মধ্যে তাঁর লোকের প্রতিকৃতি অন্যান্য ছবির চেয়ে অনেক বেশী বিখ্যাত। তা ছাড়া, আগেই বলেছি ছবি ছাড়া, ডিউরর এন্‌গ্রেভিংএর জন্যে বিশ্ববিখ্যাত। এন্‌গ্রেভিং করতে হলে কাঠ বা তামার উপরে ছবিটি খোদাই করে লাইনের খাঁজে খাঁজে কালি দিতে হয়। তারপর কাঠটি বা তামার ফলকটি কাগজের উপর চেপে চাপ দিয়ে ছাপতে হয়। এইভাবে যে ছবি হয় তার নাম এন্‌গ্রেভিং।

ডিউরর বহু এন্‌গ্রেভিং করেন, এবং তিনিই একমাত্র শিল্পী যাঁর চিত্রকলায় আর এন্‌গ্রেভিংএ সমান নাম, আর পৃথিবীজোড়া নাম। তাঁর কয়েকটি এন্‌গ্রেভিং এমন আছে, যা তাঁর আঁকা সেরা চিত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে। যেমন একটির নাম এখনই মনে পড়ছে—বিষাদ।

ডিউররের কাঠখোদাইএরও তুলনা নেই। কাঠখোদাই হচ্ছে এন্‌গ্রেভিংএর ঠিক উল্টো। কাঠখোদাইএ, ছবির লাইনগুলি কাঠে

এঁকে নেয়া হয়, তারপর আস্তে আস্তে লাইনগুলির পাশ থেকে খোদাই করে, চেঁচে, কাঠ বাদ দিয়ে দেয়া হয়, ফলে যে লাইনগুলি আঁকা হয়েছিলো সেইগুলিই মাত্র উঁচু হয়ে থাকে, বাকী সব কাঠ খাঁজে খাঁজে চাঁচা হয়ে নীচে পড়ে যায়। তারপর জেগে-থাকা লাইনগুলিতে কালি দিয়ে কাগজের উপর ছাপা হয়। এখন কলকাতার অলিতে গলিতে কাপড় ছাপার দোকান হয়েছে, এমন কি মফঃস্বলের শহরেও। যে কোন দোকানে যদি আধঘণ্টাও বসে বসে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে, কাঠখোদাইএর ব্লকগুলি কিভাবে তৈরি হয়, আর ছাপার কাজ কিভাবে হয়। কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউতে মহাজাতি সদন তৈরি হচ্ছে জানো বোধ হয়। মহাজাতি সদনের সমুখে রাস্তার ওপারে একটা রাস্তা পশ্চিমদিকে চলে গেছে তার নাম বালমুকুন্দ মকর রোড। সেখানে যদি কোনদিন যাও তাহলে দেখবে ভাল ভাল মিস্ত্রিরা কি রকম কাঠখোদাই করছে। এন্‌গ্রেভিংএর কাজ যেকোন স্যাকরার দোকানে আধঘণ্টা বসলেই দেখতে পাবে।

ডিউরর যখন ভেনিসে যান তখন ভেনিসের শিল্পীমহল তাঁকে খুব সম্মান করে আদর অভ্যর্থনা জানান। বিখ্যাত শিল্পী বেল্লিনি, তখন তিনি খুব বৃদ্ধ, ডিউররকে একদিন বিস্ময় প্রকাশ করে জিগ্‌গেস করলেন, কিরকম তুলি দিয়ে তিনি তাঁর ছবির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চুল আঁকেন, যদি আপত্তি না থাকে ডিউরর সেই তুলির একটা বেল্লিনিকে দেবেন কি! ডিউরর 'বিলক্ষণ কথা, নিশ্চয় দেবো', বলে যে তুলি দিয়ে আঁক-ছিলেন সেই তুলিটি বেল্লিনির হাতে তুলে দিলেন।

বেল্লিনি বল্লেন, 'এ কি দিলেন, এ যে অতি সাধারণ একটা তুলি। আপনি কি সত্যিই বলতে চান যে এই তুলি দিয়েই আপনি ঐ রকম মাকড়সার জালের মত সরু চুল আঁকেন?' তখন ডিউরর একটু বিরক্ত একটু লজ্জিত হয়ে কয়েকটি চুল এঁকে দেখালেন, সেরকম সরু চুল এক তিনিই আঁকতে পারতেন। আর কে পারতেন মনে আছে? অন্তত যাঁর সম্বন্ধে এরকম গল্প আছে? পুরাকালের গ্রীস দেশের শিল্পী অপেলিজ, যাঁর কথা বইএর প্রথম দিকে পড়েছো।

ডিউরর ইতালিয়ান শিল্পীদের খুব ভক্ত ছিলেন, খুব শ্রদ্ধাসহকারে তাঁদের কাছে যেটুকু শিখবার সেটুকু শিখেছিলেন, কিন্তু শেষে যখন জার্মানিতে ফিরে গেলেন তখন পুনরায় নিজের মত করে আঁকতে

লাগলেন। ইতালিয়ান চিত্রকলা যেহেতু বড়, সেহেতু ইতালিয়ানদের মত করে আঁকবো, এ ইচ্ছা তাঁর মনে একবারও এলো না। যদিও ইচ্ছে করলেই হয়তো অনেক বড় ইতালিয়ান শিল্পীর চেয়ে তিনি ইতালিয়ান রীতিতেই অনেক ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। কতকটা আমাদের দেশের যামিনী রায়ের মত, তিনিও ইওরোপীয় চিত্রকলা পদ্ধতি খুব ভাল করে জানেন, অথচ একদিনে সে পদ্ধতি ছেড়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি।

অ্যাল্‌ব্রেক্ট ডিউরর নিজের অনেকগুলি ছবি আঁকেন (ইংরেজিতে বলে সেল্‌ফ্‌ পোর্ট্রেট)। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে দেখে অবশ্য আঁকতেন। এইসব ছবি থেকে বোঝা যায় যে ডিউরর খুব সুপুরুষ ছিলেন। ডিউরর আরও অনেকের বিখ্যাত বিখ্যাত প্রতিকৃতি আঁকেন। নিজের বাবার একটা ছবি এঁকেছিলেন, সেটি ছবি হিসেবে অপূর্ব।

ডিউররের ছবির একটি বিশেষত্ব, প্রত্যেকটি ছবি অসম্ভব খুঁটিনাটিতে ভর্তি। প্রত্যেকটি ছবির সবটুকু জায়গাই ছোটখাটো নানা জিনিস দিয়ে ভরা। জামার ছোট্ট বোতামটি যত যত্ন করে আঁকা, মানুষের মুখটিও ঠিক তত যত্ন করেই আঁকা। এটা বোধহয় জার্মান জাতির বিশেষত্ব, কারণ প্রত্যেক জার্মান শিল্পীর ছবিতেই এই গুণটি আছে। আর এতখানি খুঁটিনাটি থাকা অনেক সময়ে ছবির প্রসাদগুণকে ব্যাহত করে। অত খুঁটিনাটি থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কষ্ট হনীয়য়াজপ্রেয় ও অপ্রয়োজনীয়ের দোটানায় পড়ে চোখের বিভ্রম ঘটে, শ্রান্তি আসে। কিন্তু সুখের কথা এই যে যদিও খুঁটিনাটি আঁকায় ডিউরর কোন জার্মান শিল্পীর চেয়ে কম যান না, তবুও তিনি কখনও ছবিতে ছোটখাট জিনিসকে প্রাধান্য দিয়ে দর্শকের মনোযোগ নষ্ট করতেন না, তার দৃষ্টি ঘুলিয়ে দিতেন না।

জার্মান রনেসাঁসের দ্বিতীয় মহৎ শিল্পীও লোকের প্রতিকৃতি এঁকে গেছেন আর কাঠখোদাই বা উড্‌কাট করতেন। তাঁর নাম হ্যান্‌স্‌ বা হান্‌স্‌ হোল্‌বাইন। বাপ আর ছেলে দুজন হান্‌স্‌ হোল্‌বাইন ছিলেন, দুজনেরই এক নাম। দুজনেই চিত্রশিল্পী ছিলেম। বড় হোল্‌বাইন অনুমান ১৪৬০ সালে জন্মান, মারা যান ১৫২৪ সালে। তাঁর তুলিতেই প্রথম জার্মান চিত্রকলার উপর ইতালিয়ান প্রভাব

সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। তাঁর কাজের মধ্যে যেগুলি ভাল সেগুলি অগ্‌স্‌বর্গ ক্যাথিড্রালে এবং আরও কয়েকটি জার্মান শহরে আছে।

কিন্তু আজ এখানে বলবো ছোট হান্‌স্‌ হোল্‌বাইনের কথা, তাঁর জন্ম অগ্‌স্‌বর্গে ১৪৯৭ সালে। খুব অল্পবয়সেই তাঁর প্রতিভার আভাস পাওয়া গেলো তাঁর এন্‌গ্রেভিংএর কাজে, বিশেষ একধরনের রঙীন কাঁচ আঁকায় আর তাতে রঙ করায়, আর নানারকম আলপনার কাজে। ইংরেজিতে স্টেন্‌ড্‌ গ্লাস কথাটার বাংলা রঙীন কাঁচ করলে ঠিক হয় না, কারণ রঙীন কাঁচ বললে মনে হয় যেন নানা রঙের কাঁচ জুড়ে জুড়ে বসিয়ে ছবি করা হয়েছে। আসলে তা হতো না। কাঁচ বসানো হতো সাদাই, তাতে এক ধরনের রঙ, যা কাঁচে ধরে আর কিছুতেই জলে, ঝড়ে, ধুলোয় সে রঙ উঠে যায় না, সেই রঙ ছবিতে লাগানোর মত করে লাগানো হতো। এই স্টেন্‌ড্‌ গ্লাসের কৌশল অধুনা লুপ্ত হয়েছে, কি করে করে আজকাল কেউ জানে না। কলকাতার গির্জায় যা রঙীন কাঁচের ছবি মাঝে মাঝে দেখা যায় তা আসল স্টেন্‌ড্‌ গ্লাস নয়, নেহাতই রঙীন কাঁচ কেটে কেটে জুড়ে বসানো।

ছোট হোল্‌বাইন যখন একটু বড় হলেন তখন হোল্‌বাইনরা আল্‌প্‌স্‌ পর্বতের দেশ সুইট্‌সরল্যাণ্ডে চলে গেলেন। সেখানে ছোট হোল্‌বাইনের সঙ্গে বিখ্যাত পণ্ডিত আর মনীষী ইর‍্যাজ্‌মসের সঙ্গে খুব ভাব হলো। ইর‍্যাজমস তখনকার দিনে ছিলেন জগজ্জয়ী পণ্ডিত আর দার্শনিক। হোলবাইন ইর‍্যাজমসের পাঁচটি ছবি আঁকেন। তার মধ্যে একটিতে ইর‍্যাজমসকে বাঁ পাশ থেকে দেখানো হয়েছে। পাশ থেকে ছবিকে ইংরেজিতে বলে প্রোফীল বা প্রোফাইল। ইর‍্যাজ্‌মস ডেস্কে বসে লিখছেন। এই ছবিতে অন্য খুঁটিনাটি বিশেষ কিছু নেই কিন্তু আরেকটা বিখ্যাত ছবি, যাকে বলা হয় 'জর্জ গীজের প্রতিকৃতি' তাতে জর্জ গীজ নিজে ছাড়া আরও পঁচিশটি জিনিস আঁকা আছে। এত জিনিস থাকা সত্ত্বেও, ডিউররের মতই, হোল্‌বাইন সেই পঁচিশটি জিনিস দিয়ে ছবিটা অযথা ভারাক্রান্ত করেননি, যার ফলে সেগুলি থাকা সত্ত্বেও জর্জ গীজের উপরই চোখ লেগে থাকে। ছবিতে প্রতিকৃতির মুখেও শিল্পী ঠিক একই কারণে অযথা রেখার বাহুল্য আনেননি, শুধু সেই কটি রেখাই দিয়েছেন যে কটিতে সবচেয়ে বেশী চরিত্রের ব্যঞ্জনা আসে।

কিছুদিন পরে সুইট্‌সরল্যাণ্ডে হোল্‌বাইন ছবি-আঁকার বায়না আর বেশী পেলেন না। তখন তিনি মনস্থির করে এক দুঃসাহসী কাজ করলেন। ঠিক করলেন ইংলণ্ডে গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষা করবেন। ইর‍্যাজ্‌মসের কাছ থেকে স্যর টমাস মোরের কাছে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে ইংলণ্ড গেলেন। সেখানে স্যর টমাস মোর তাঁকে প্রতিকৃতি আঁকার কাজ দিলেন। ক্রমে ক্রমে ১৫৩৬ সালে তিনি অষ্টম হেন্‌রির রাজদরবারে শিল্পী নিযুক্ত হলেন। ইংলণ্ডে থাকতে তিনি অষ্টম হেন্‌রি, অ্যান্‌ অভ্‌ ক্লীভজ, জেন্‌ সীমর, প্রিন্‌স্‌ অভ্‌ ওয়েল্‌স্‌, ড্যুক অভ্‌ নর্ফোকের ছবি আঁকেন। জর্জ গীজের বিখ্যাত ছবিটি আছে বার্লিনের এক চিত্রশালায়, আরেকটি আশ্চর্য ছবি 'জহুরী মরেত্তো' আছে ড্রেসডেনে।

হোল্‌বাইনের ছবিগুলি আবালবৃদ্ধ সকলেরই ভাল লাগে। তোমরা যারা ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ছো তাদের আরও ভাল লাগবে।

ফাইডন প্রেস বলে ইংলণ্ডে একঘর বিখ্যাত প্রকাশক আছে। সেখান থেকে ডিউরর আর হোল্‌বাইনের ছবি ও এন্‌গ্রেভিং এর দুটি বই বেরিয়েছে। দাম খুব বেশী নয়। যদি হাতের কাছে পাও তবে বই দুটি উল্টেপাল্টে ছবিগুলি নিশ্চয় দেখো।

অ্যালব্রেক্ট ডিউরর আর ছোট হান্‌স্‌ হোল্‌বাইন, জার্মান চিত্রকলার দুই দিক্‌পাল। দুজনের মধ্যে কাকে তোমাদের সবচেয়ে বেশী পছন্দ হবে তাই ভাবছি।

ভুলে যাওয়া, ফের ফিরে পাওয়া

ইওরোপের প্রায় সব বড় শিল্পী সম্বন্ধেই, তাঁদের জীবনী সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, প্রায়ই অনেক কিছু নতুন জানতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু একজন জগদ্বিখ্যাত শিল্পী সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নেই, যেটুকু জানা আছে তা দু-চার লাইনেই শেষ করা যায়। তিনি হচ্ছেন ইয়ান ভের্‌মেয়ার, একজন ডাচ্‌ চিত্রশিল্পী, থাকতেন ডেল্‌ফ্‌ট্‌ শহরে, ১৬৩২ সালে জন্মান, ১৬৭৫ সালে অর্থাৎ মাত্র ৪৩ বছর বয়সে মারা যান, রেখে যান স্ত্রী, আটটি ছেলেমেয়ে আর পৃথিবীর মধ্যে সেরা সেরা ক'খানি ছবি। ইয়ান ভেরমেয়ারের সম্বন্ধে আমরা প্রায় এইটুকুই

মাত্র জানি। এমন কি অনেকে জানে না তিনি কতগুলি ছবি সবশুদ্ধ এঁকেছিলেন, কেন না ওরই মধ্যে কতগুলি হয়তো আছে যা ভের্‌মেয়ারের আঁকা মনে হয়, আসলে নাও হতে পারে। শোনা যায় তিনি রেম্‌ব্রান্টের ছাত্র কারেল ফাব্রিটাসের কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। ডেল্‌ফ্‌টে চিত্রশিল্পীদের একটা সমিতি বা গিল্‌ড্‌ ছিলো, একসময়ে তিনি তাঁদের নেতা ছিলেন।

আশ্চর্যের কথা তাঁর মৃত্যুর পর ইওরোপের বড় বড় শিল্পীরা, ঐতিহাসিকরা তাঁকে প্রায় বেমালুম ভুলে গেলেন। কেউ তাঁর নাম উচ্চারণও করতো না, যেন তিনি জন্মাননি, কোনকালে ছবিও আঁকেননি। তাঁর নাম, তাঁর কাজ যাকে বলে বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে গেলো। হঠাৎ ১৮৬৬ সালে তাঁকে 'আবিষ্কার' করলেন এক ফরাসী সমালোচক। আর তার কিছুদিন পরেই সারা জগৎ জেনে নিলো যে ভের্‌মেয়ার ছিলেন জগদ্বিখ্যাত ডাচ্‌ শিল্পীদের মধ্যেও অতিপ্রধান, চিত্রশিল্পশাস্ত্র তাঁর মত আর কেউ জানতো না।

যেসব ছবি নিশ্চিত তাঁর আঁকা বলে আমরা জানি সেগুলি সত্যিই আশ্চর্য সুন্দর। প্রায় সবগুলিই ঘরের ভিতরকার দৃশ্য। সম্ভবত একটিমাত্র ছবি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য। প্রায় সব ছবিরই বিষয় হচ্ছে একটি মহিলা ঘরের কোন সামান্য সাধারণ কাজে রত, হয় চিঠি পড়ছেন, না হয় শেলাই করছেন বা পিয়ানোর আদি বাজনা ক্ল্যাভিকর্ড বাজাচ্ছেন, অথবা শুধু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। হয়তো এঁরা ভের্‌মেয়ারের স্ত্রী বা মেয়ে, ভের্‌মেয়ারের ছবি আঁকার সুবিধার জন্য বিশেষ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। কোন কোন ছবিতে দুজন মহিলাও আছেন, আবার দু-একটা ছবিতে পুরুষও আছে। প্রায় প্রতি ছবিতেই স্ত্রী বা পুরুষ যেই হোক সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, বাইরের আলো জানালার মধ্যে দিয়ে তার গায়ে পড়ছে। জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের আলো ঘরের মধ্যে, জিনিসে, লোকের গায়ে, মুখে, কাপড়ে পড়ছে, এই বিষয়টা ভের্‌মেয়ার এমন অদ্ভুত, এমন আশ্চর্যভাবে আঁকতেন যে যেকেউ তাঁর ছবি দেখবে, তার প্রথমেই এই জিনিসটাই নজরে পড়বে। তারপর নজরে পড়বে, কি নিখুঁতভাবে ভেরমেয়ার দেখাতে পারতেন একটা জিনিস কিভাবে তৈরি, কি দিয়ে তৈরি ; যেন সেটাকে ধরে ছুঁয়ে বোঝা যায় সেটি কত ভাল বা মন্দ। এই গুণকে

ইংরেজিতে বলে টেক্স্চার। লেসের আস্তিন, সিল্কের কাপড়, কাঠের চেয়ার, রূপোর পাত্র, পাকা ফল, ঝকঝকে গেলাস, মুক্তোর মালা, নীল চীনেমাটির বাসন, সবই এত নিখুঁতভাবে আঁকা যে দেখলে সন্দেহ থাকে না, কোন্‌টা কি, কিসে তৈরি বা কোন্ জিনিসটা আসলে কতখানি সরেস বা নিরেস ছিলো। যেকোন জিনিসে হাত দিলে কি রকম লাগবে তা যেন ছবি দেখেই বলে দেওয়া যায়। আর প্রত্যেকটি জিনিসের উপর জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের আলো এসে প'ড়ে একটিমাত্র ছবিতে সব যেন গেঁথে দিয়েছে। অনেকে বলেন, ঘরের ভিতরকার দৃশ্যে বাইরের দিনের আলো ভের্‌মেয়ার যেভাবে ফেলতে পেরেছেন, তা অন্য কোন শিল্পী পারেননি। সত্যিই, ভেরমেয়ার যা এঁকেছেন, তা খুব কম শিল্পীই পারেন।

একটি ছবি আছে, 'বাজানো শেখা'। একটি মেয়ে জানালার ধারে ক্ল্যাভিকর্ড বাজাতে শিখছে, পাশে শিক্ষক দাঁড়িয়ে; জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে, মেঝেটি সাদাকালো মার্বলের, মাঝখানে একটি চেলো পড়ে, সমুখের দিকে একটি টেবিল মোটা জমকালো কাজকরা ট্যাপেস্ট্রি দিয়ে ঢাকা। দেয়ালে ক্ল্যাভিকর্ডের উপর একটি ছবি। ঘটনাটি খুবই সাধারণ, জিনিসপত্রও খুব সাধারণ, কিন্তু সূর্যের আলোছায়ায় সবটি কি অপরূপই দেখায়।

অনেকে বলেন, ভের্‌মেয়ারের কল্পনা ছিলো না। চিত্রশিল্পীর কল্পনা, আর সাহিত্যিকের কল্পনা ঠিক এক পর্যায়ে পড়ে না। সুতরাং এবিষয়ে আলোচনা করতে গেলে শিল্পতত্ত্বের গূঢ়কথায় যেতে হয়। কিন্তু ছবির ছবি হিসেবে একটা স্বধর্ম আছে। সেই স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলে কল্পনা সার্থক, তার থেকে চ্যুত হলে যত কল্পনাই যাক, সব অসার্থক। ভের্‌মেয়ারের ছবি কখনও স্বধর্মচ্যুত হয়নি।

এত মহৎ শিল্পীর সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি, ভাবতে খারাপ লাগে। অদ্ভুত মনে হয়। যখন বেঁচেছিলেন তখন নিশ্চই ভের্‌মেয়ারের খুব খ্যাতি ছিলো, তার পর সবাই কি ভুলে গেলো? আশ্চর্য! এমন কি, কেউ তাঁর ছোট্ট একটি জীবনী লেখা শুদ্ধ প্রয়োজন মনে করেননি। তারপর যখন তাঁর ছবি 'আবিষ্কার' হলো তখন সে কি তুমুল উত্তেজনা! একটা ছবি কিনতেই বড়লোক দেউলে হয়ে যাবার দাখিল! ভের্‌মেয়ারের সব ছবিই এখন সযত্নে মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে।

স্পেনের শিল্পীদের কথা

এখন স্প্যানিশ শিল্পীদের কথা শোনো। কিন্তু প্রথমে তোমাদের ক্রীটের কথা বলবো, স্পেনের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই। গ্রীসদেশের দক্ষিণে ক্রীট একটি দ্বীপ। গ্রীসের অধিকারে ক্রীট, ক্রীটনরা গ্রীক ভাষায় কথা বলে। অনুমান ১৫৪৫ সালে ক্রীটে একটি ছোট্ট শিশু জন্মায়। পরবর্তী জীবনে সেই শিশু জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হন। তাঁর আসল নাম কেউ মনে রাখে না, উচ্চারণ করাও শক্ত। নামটা জেনে রাখা দরকার বলে বলছি, কিন্তু মুখস্থ করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ সকলে তাঁর অন্য ছোট্ট নামই জানে। আসল নাম হচ্ছে ডমেনিকো থিয়োটোকপুলি। এল্‌গ্রেকো মারা যান ১৬১৩ সালে।

অদ্ভুত ধরনের লোক, কেউ তাঁর জীবনী সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানে না। শোনা যায় তিনি ক্রীট ছেড়ে ভেনিসে যান তিশানের কাছে ছবি আঁকা শিখতে। তার পরে আর খোঁজখবর নেই। বেমালুম ডুব। হঠাৎ শোনা গেলো তিনি স্পেনের তলেদোতে বসবাস আরম্ভ করেছেন। তারপর থেকে স্পেনেই রইলেন আর স্পেনেই মারা গেলেন ১৬১৪ সালে। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ ছবিই সই করতেন গ্রীক হরফে। তাঁর অত বড় গালভরা নাম ডেকে ডেকে বেড়ানো স্প্যানিয়ার্ডদের কর্ম নয়। তারা তাঁকে ডাকতো 'গ্রীক ভদ্রলোক' বলে, কিংবা শুধু 'গ্রীক' বলে। স্প্যানিশে বলে 'এল্‌ গ্রেকো' তাই থেকে নাম হয়ে গেলো এল্‌ গ্রেকো!

অন্য সকলের থেকে এল্‌গ্রেকোর ছবি এত তফাৎ যে প্রথমে এল্‌গ্রেকোর কয়েকখানা ছবি দেখলে মনে হবে, দূর! এ মোটেই সুন্দর নয়। ছবির সব লোকই কি রকম লম্বা-লম্বা, শীর্ণ, মনে হয় না জলজ্যান্ত লোক। আর সাধারণত ছবিতে যে ধরণের রঙ থাকে, এল্‌গ্রেকোর ছবিতে তার যেন কোন নিয়মই মানা হয়নি। তাই এল্‌গ্রেকোর ছবি দেখতে গেলে এটা মনে রাখা দরকার যে ফোটোগ্রাফে লোককে যেরকম দেখায় ছবিতে সেরকম দেখাতে তিনি মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না। ছবির মধ্যে লোকজন বা দৃশ্য এঁকে এল্‌গ্রেকো দেখাতে চাইলেন, রক্তমাংসের লোকগুলি নয়, বা আসল গাছপাতাওলা দৃশ্য নয়, সেই রক্তমাংসের ভিতরের প্রাণ আর আত্মাকে, সেই দৃশ্যের ভিতরের

মানুষগুলির প্রকৃত ভাবটিকে। সুতরাং তাঁর ছবির লোকজন বা দৃশ্য, রক্তমাংসের লোকজনের নিছক প্রতিকৃতি বা গাছ-পালা-পরিবৃত দৃশ্যমান জগৎ থেকে তফাৎ হবেই। এই তফাৎটুকু ঠিক ঠিক বোঝা অনেক লোকের পক্ষে খুব শক্ত। সাধারণত লোকে মনে করে ছবির কাজ হচ্ছে, যে-কোন জিনিস চোখে যেমন দেখতে লাগে, সেরকমই আঁকা উচিত। আর সেইটে ভালভাবে করতে পারাই হচ্ছে আর্ট। এর অবশ্য চরম হচ্ছে সেই ধরণের ছবি যাকে আমরা আগে বলেছি এপ্রিল-ফুল-করা ছবি, বা বোকাবানানো ছবি। অতদূর না গেলেও আমরা এটুকু বলতে পারি, চোখে যা দেখছি, ছবিতে যদি শুধু সেটুকুই ধরে দেবো তাহলে মানুষের চোখের, হাতের, রঙের, কাগজের বা চটের দরকার কি, পরিশ্রমের দরকার কি, চিন্তার দরকার কি, শিক্ষার দরকার কি, প্রতিভার দরকার কি? ভাল ক্যামেরার লেন্স ত আছে, ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুললেই হয়। আপদ চুকে যায়। কিন্তু একথা বললেই আমরা হাঁ হাঁ করে উঠলো, বল্‌বো শিল্পীর হাত আর ক্যামেরা এক জিনিস নয়। তাই প্রায় প্রত্যেক শিল্পীই, অল্পবিস্তর গ্রেকোর মতই, যা দেখেন শুধুমাত্র তাই এঁকে তৃপ্ত হন না, ছবি হিসেবে সেটা কেমন দেখাবে তাই ভেবে ভেবে ছবি আঁকেন।

যাঁরা ছবি সম্বন্ধে বোঝেন তাঁরা বলেন এল্‌গ্রেকোর ছবিতে বাইজান্‌টাইন্‌ শিল্পের ঋজুতা, তীব্র আবেগের কঠিন ভাব, আর ভাবের গভীরত্ব, ভিনিশানদের জমকালো রঙ, আর স্প্যানিয়ার্ডদের বনেদী ধরাছোঁয়া বাঁচিয়ে দূরত্ব ভাব, তিনটিই একসঙ্গে পুরোমাত্রায় আছে। অথচ কোন্‌ রীতি যে প্রধান একথা আঙুল দেখিয়ে কোন ছবিতে বলা যায় না, কারণ তাঁর যে কোন ছবিতে যে গুণটি সবচেয়ে ফুটে উঠেছে সেটি এল্‌গ্রেকোর স্বকীয়তা, দেখলেই বোঝা যায় এছবি গ্রেকো ছাড়া আর কেউ আঁকেন নি। আমাদের কবি বিষ্ণু দে যাকে বলেছেন 'গ্রেকোর মায়া'। গ্রেকোর ছবিতে একটি গুণ অন্য সব গুণকে ছাপিয়ে উঠেছে, সেটি হচ্ছে ছন্দ। লোকজন, রঙ, পাথর, ঘর, বাড়ী, দেয়াল, আসবাব, জড়, অজড়, সব যেন বেঁচে আছে, সব যেন একটিমাত্র ছন্দের মূর্ছনায় প্রাণবন্ত, গতিশীল। ফাইডন প্রেস থেকে ছাপা এল্‌গ্রেকোর একটি কমদামী অ্যাল্‌বাম আছে, সেটি যদি হাতের কাছে কোন দিন পাও নিশ্চয় দেখো।

এল্‌গ্রেকো যখন মারা যান স্প্যানিশ শিল্পীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বিখ্যাত তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ। শুনে অবাক হবে যে তিনি মায়ের নাম নিয়েছিলেন, বাবার নয়। এটা একটা পুরানো স্প্যানিশ সামাজিক রীতি। তাঁর পুরো নাম মনে রাখা শক্ত—দিয়েগো রদরিগেথ দি সিল্‌ভা ই ভেলাস্‌কেথ্। শুধু ভেলাস্‌কেথ নামটা মনে রাখলেই চলবে। ভেলাস্‌কেথ আর হল্যাণ্ডের ভ্যান ডাইক একই বছরে জন্মান, ভেলাস্‌কেথ জন্মান স্পেনের সেভীল্ শহরে ১৫৯৯ সালে। মারা যান ১৬৬০ সালে।

বড় হয়ে ভেলাস্‌কেথ কিছুদিন ছবি আঁকার পর স্পেনের রাজধানী ম্যাড্রিদে গেলেন। রাজা তাঁর ছবি দেখে পছন্দ করলেন, ভেলাস্‌কেথকে কিছু ছবি আঁকার বরাতও দিলেন। তখন ভেলাস্‌কেথ বরাবরের মত ম্যাড্রিদে চলে গেলেন। সেখানে রাজদরবারের শিল্পী হয়ে বসলেন। স্পেনের এই রাজা কি রকম দেখতে ছিলেন, ভেলাস্‌কেথের কৃপায় আমরা তা বিলক্ষণ জানি কারণ ভেলাস্‌কেথ তাঁর অনেকগুলি প্রতিকৃতি আঁকেন। রাজশিল্পীর একটি কাজই ছিলো রাজার ছবি আঁকা। রাজার নাম চতুর্থ ফিলিপ। চতুর্থ ফিলিপের যে কোন ছবিতে প্রথমেই নজরে পড়ে তাঁর বিশাল গোঁফজোড়া, পাক খেয়ে যে দুটি চোখ পর্যন্ত উঠেছে। গোঁফজোড়া নিশ্চয় বড় ঝঞ্ঝাটের ছিলো, কারণ সেদুটি সুন্দর রাখার জন্যে ফিলিপ যখন ঘুমোতে যেতেন তখন চামড়ার খাপে ঢুকিয়ে, চামড়ার খাপ মুখে এঁটে শুতেন। মাঝে মাঝে ভাবি, হঠাৎ যদি কোন দিন ফিলিপ ঝড়জলে পড়ে থাকেন তাহলে বৃষ্টিতে অত সাধের গোঁফ জোড়ার কি অবস্থা হয়েছিলো!

রাজার আর তাঁর আমীর ওমরাদের যত ছবি ভেলাস্‌কেথ এঁকেছেন, তার প্রায় সবেতেই দেখবে প্রত্যেক লোকের গলা জুড়ে একটা বিরাট সাদা কলার চারদিকে মাঠের মত ছড়িয়ে আছে। রাজা ফিলিপ এই ধরণের কলার ভীষণ পছন্দ করতেন, তার সঙ্গত কারণও আছে—তিনি নিজে এই কলার বার করেন! তাই সকলকেই বাধ্য হয়ে এই কলার পরতে হতো। তিনি এই কলার আবিষ্কার করে এত খুসী হন যে তাঁর এই বিশাল প্রতিভার জন্যে একবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়া স্থির হলো, আর সকলে ঘটা করে, গম্ভীর মুখে, লম্বা শোভা-যাত্রা করে, গির্জায় গিয়ে রাজার জন্যে পূজো দিয়ে এলেন।

রাজা ফিলিপের ছোটো মেয়ে ছিলো, তার নাম মার্গরীট। এই

মার্গরীটের একটি অতি সুন্দর ছবি ভেলাস্‌কেথ আঁকেন। একটি বললে ভুল হবে, এঁকেছিলেন তিনটি ছবি—শিশু মার্গরীট লাল পোষাকে, শিশু মার্গরীট সবুজ পোষাকে, শিশু মার্গরীট নীল পোষাকে, তিনটি পোষাকে তিনটিই খুব আশ্চর্য ছবি, কিন্তু আমাদের কখনও মনে হবে না যে প্রত্যেকটাতে মার্গরীটের আলাদা আলাদা করে কিছু বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। বরং প্রত্যেকটিতে বেচারী মার্গরীট আর চীনে মাটির পুতুলে কিছু বিশেষ তফাৎ বোঝা যায় না।

এর থেকেই কথা আসে যে এল্‌গ্রেকোর থেকে ভেলাস্‌কেথ শিল্পী হিসেবে অনেক তফাৎ। এল্‌গ্রেকো যখন ছবি আঁকতেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য হতো, যাকে আঁকছেন তাকে তিনি কি ভাবে দেখবেন, অর্থাৎ দ্রষ্টব্য বস্তু বা লোক সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত বা ধারণাটা কি। এল্‌গ্রেকোর তুলিতে আসতো কল্পনা, চোখ দিয়ে শুধু তিনি যা দেখতেন, ক্যান্‌ভাসে শুধু সেটুকু তুলে কখনও তৃপ্ত হতেন না, চোখের পিছনের মনটি যতক্ষণ উজাড় করে না দিতেন। সেই থেকে আসতো তাঁর ছবিতে ছন্দ, আসতো গতি। প্রাণী আর বস্তু সব এক ছন্দে একাকার হতো। কিন্তু ভেলাস্‌কেথ বস্তুকে বস্তু হিসেবেই নিতেন, বস্তু হিসেবেই তার স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। যে শিল্পী এই ধরণে আঁকেন তাঁকে আমরা বলি, বস্তুনিষ্ঠ বা রিয়লিস্ট, কারণ যা ঠিক ঠিক দেখছেন, তাই ঠিক ঠিক আঁকছেন।

রুবেন্স যখন ম্যাদ্রিদে যান তখন রাজা ভেলাস্‌কেথকে হুকুম করলেন, তাঁর রাজ্যের শিল্প-সম্ভার সব রুবেন্সকে দেখাতে। রুবেন্স আর ভেলাস্‌কেথের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হলো। দুজনে দুজনের কাজের খুব অনুরাগী হলেন।

ভেলাস্‌কেথের ইচ্ছে হলো মহান ইতালীয়ান শিল্পীদের হাতের কাজ দেখবেন। রাজার কাছে অনুমতি নিয়ে গেলেন ইতালিতে। ইতালিতে গিয়ে কাজ শেখার উদ্দেশ্যে তিন্তোরেত্তো, মিকেলাঞ্জেলো আর তিশানের অনেক ছবি তিনি বসে বসে কপি করেন। বড় শিল্পীমাত্রেই কত নিরহঙ্কার হন দেখো। শেখার জন্যে অন্যের কাজ বসেবসে কষ্ট করে নকল করতে বিন্দুমাত্র বিরক্তি নেই, অহঙ্কার নেই। আর আমাদের মধ্যে যদি কেউ দুটো আঁচড় কাটতে পারি,

তার আর অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়বে না, কারুর সঙ্গে কথা বলবে না, কারুকে শেখাতে সুদ্ধ চাইবে না।

ভেলাস্কেথ বিখ্যাত কথক ঈশপের একটা মনগড়া ছবি আঁকেন। আমাদের ঈশপ, যিনি শৃগাল আর দ্রাক্ষাফল, ইত্যাদি গল্প লিখে গেছেন। অবশ্য ছবিটি ঈশপের আসল প্রতিকৃতি নয় বুঝতেই পারছো, কারণ ভেলাস্‌কেথ জন্মানোর দু হাজার বছর আগে ঈশপ মারা যান।

লোকে বলে ভেলাস্‌কেথ শিল্পীর গুরু শিল্পী, কারণ এমন শিল্পী খুব কমই আছেন যাঁরা ভেলাস্‌কেথের ছবির প্রশংসা করেন নি, তাঁর কাছে অনেক কিছু শেখার আছে তা স্বীকার করেন নি, তাঁর কাছে তাঁদের ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন নি। চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁকে স্পেনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলা যায়, অনেকে এল্‌গ্রেকোর চেয়েও তাঁর স্থান উঁচুতে দেন। এখন যেসব শিল্পীর কথা বলবো তাঁদের চেয়ে ভেলাস্‌কেথের স্থান উঁচুতে তো বটেই।

ভেলাস্‌কেথের পরে নাম করতে হয় চারজনের—রিবাল্‌তা, রিবেরা, থুরবারান আর মূরীল্লো। রিবাল্‌তা, রিবেরা, থুরবারানের কথা এখানে বলা যাবে না, কিন্তু মূরীল্লোর দু-একটা কথা বলতেই হয়। ভেলাস্‌কেথের মত মূরীল্লোও জন্মান সেভীলে; তাঁর জন্ম ১৬১৭ সালে, মৃত্যু ১৬৮২ সালে। মূরীল্লো অল্পবয়সে ম্যাড্রিদে যান, সেখানে ভেলাস্‌-কেথ তাঁকে ছবি আঁকতে উৎসাহ দেন, আর রাজার অনুমতি নিয়ে তাঁর চিত্রশালায় ছবি দেখতে দেন। দুবছর এইভাবে শিক্ষা করার পর মূরীল্লো সেভীলে ফিরে যান। কিন্তু তখনও তিনি যেমন অখ্যাত তেমনি গরীব।

ঠিক সেই সময়ে সেভীলের ফ্রান্সিস্‌ক্যান মঠের সাধুরা, অর্থাৎ মঙ্করা একজন শিল্পী খুঁজছিলেন যিনি ছবি এঁকে তাঁদের একটি বাড়ী ভরিয়ে দেবেন। তাঁরা একাজের জন্যে চাচ্ছিলেন একজন বিখ্যাত শিল্পী, কিন্তু বড় শিল্পীকে তো তাঁর উপযুক্ত পয়সা দিতে পারেন না, সুতরাং তাঁরা ঠিক করলেন, মূরীল্লোকে দিয়েই কাজটা করাবেন। বাড়ীটিতে মূরীল্লো এগারোটা ছবি আঁকলেন, সবাই প্রত্যেকটি ছবি দেখে এত খুসী হলেন যে মূরীল্লো এতগুলি ছবির আঁকার বরাত পেলেন যা তাঁর পক্ষে এঁকে ওঠা শক্ত।

তখন মূরীল্লো আরেকটি বাড়ীর আরো এগারোটি ছবি আঁকলেন। এইবারের ছবিগুলি প্রথমবারের এগারোটির চেয়ে অনেক ভাল হলো, তাঁর খ্যাতি হলো প্রচুর।

মূরীল্লো একটা ছবি আঁকেন, তার সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। ছবিতে একটি মাঙ্ক, তাঁর পায়ের তলায় একটি স্প্যানিয়েল কুকুর। গল্প আছে যে ছবির স্প্যানিয়েলটি এতই জলজান্ত দেখাচ্ছিলো যে একদিন একটি আসল কুকুর ঘরে ঢুকে ছবির স্প্যানিয়েলটাকে দেখে কী ঘেউ ঘেউ। এ গল্পটা আমাদের জিউক্সিসের আঙুরের ছবি আর পাখী ঠোকরানোর গল্প মনে করিয়ে দেয়। আমার অবশ্য গল্পটা বিশ্বাস হয় না, কারণ কুকুর আয়নায় নিজের ছায়া দেখে যেভাবে ঘেউ ঘেউ করে, ছবি দেখে কখনও তা করে না।

ছোট শিশু আর মাদোনা আঁকতে মূরীল্লো খুব ভাল পারতেন। তাঁর মাদোনাদের সকলেরই কালো চুল আর কালো চোখ। তাঁর আঁকা একটি ছবি আছে তাতে শিশু যীশু আর ছোট্ট সেন্ট জন একটা বড় সাগরের শামুক থেকে জল চুষে খাচ্ছেন। পাশে ছোট্ট ভেড়াটি দেখে মনে হয় তারও যেন বড় তেষ্টা পেয়েছে, সেও যেন জল খেতে চায়।

মূরীল্লো ভাল ভাল দামে নিজের ছবি বেচে বড়লোক হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন, গরীবদুঃখীকে খুব দান করতেন। নিজে এককালে গরীব ছিলেন তো, সুতরাং গরীবের কষ্ট বুঝতেন।

বুড়ো বয়সে একদিন উঁচু ভারায় উঠে একটা বড় ছবির উপরের দিকটা আঁকতে যেই যাবেন, অমনি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। এত জোর আঘাত পেলেন যে আর ভাল হয়ে উঠতে পারলেন না, ছবিটি আর শেষ হলো না। সেভীলবাসীরা মূরীল্লোকে কোনদিন ভুলতে পারলো না, এখনও একটা ভাল ছবি দেখলেই বলবে, 'ওটা একটা মূরীল্লো'।

* * *

আরেকজন স্প্যানিশ শিল্পী সম্বন্ধে সামান্য দুচার কথা না বললে খুব অপরাধ হবে, যদিও তিনি রনেসাঁসের অনেক পরে জন্মেছিলেন। কিন্তু স্প্যানিশ চিত্রকরদের কথা যখন হচ্ছে তখন এখানেই বলা ভাল, কারণ পরে বলার সুযোগ হবেনা। তাঁর নাম গোইয়া, পুরো নাম এত

প্রকাণ্ড আব এত অখ্যাত যে না জানলেও চলবে। কৃষক পরিবারে গোইয়ার জন্ম ১৭৪৬ সালে। দেশ আরাগোঁর কাছে, ছবি আঁকা শিখতে গেলেন সারাগোসায়। সেখান থেকে অত্যন্ত দুরন্তপনার ফলে পালালেন ম্যাদ্রিদে, সেখান থেকে ইতালি। ১৭৭৫ সালে ম্যাদ্রিদে ফিরে এসে রাজার কাপড়ের কলে অনেক ভাল ভাল ট্যাপেস্ট্রির জন্যে ছবি এঁকে দেন। তারপরে অনেকগুলি ফ্রেস্কো আঁকেন। তারপর রাজদরবারে শিল্পী নিযুক্ত হন। চারটি রাজার ছবি আঁকেন। রাজা ছাড়া বিস্তর আমীর-ওমরারও প্রতিকৃতি আঁকেন। প্রতিকৃতি এঁকে তিনি জগদ্বিখ্যাত হন। তাছাড়া এচিং করতেন খুব ভাল। গোইয়া ৮২ বছর বয়সে ১৮২৮ সালে মারা যান।

গোইয়া, ভেলাস্কেথ, এল্‌গ্রেকো, স্প্যানিশ চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় নাম আর নেই। জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তালিকাতেও এঁদের নাম হেসেখেলে বহু উঁচুতে। এঁদের মধ্যে ভেলাস্‌কেথ একটু তফাৎ, এল্‌গ্রেকোর সঙ্গে গোইয়ার নাম যেন আরো সহজে একসঙ্গে করা যায়। গোইয়া এল্‌গ্রেকোর মত ধ্যানী, আদর্শবাদী আর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন। গোইয়ার সব চিত্রেরই মূল কথা হচ্ছে সব রকমের জীবনের প্রতি তাঁর দরদ। একদিকে নেপোলিআন, আর একদিকে ইংরেজ আক্রমণ, স্পেন যখন এই দুই আক্রমণে ছিন্নভিন্ন, বিপর্যস্ত, তখন গোইয়া 'যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম' বলে কতগুলি রেখাচিত্র আঁকেন। এইসব ছবির প্রায় ১২৫ বৎসর পরে আর এক স্প্যানিশ শিল্পী, পাব্‌লো পিকাসোও স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে গোইয়ার মত ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ হয়ে গোয়েনকা বলে একটি জগদ্বিখ্যাত ছবি আঁকেন। যুদ্ধের যে সব চিত্র গোইয়া আঁকেন সেগুলি যেমন ভয়ঙ্কর আর ভয়াবহ তেমনি মানুষের কষ্টে দরদে ভরতি। যারা যুদ্ধ আনে, যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুকে ডেকে আনে তাদের সম্বন্ধে রাগ, ঘৃণা গোইয়ার প্রতিটি লাইনে যেন তীরের মতো কেটে কেটে পড়ছে।

অষ্টম অধ্যায়

রনেসাঁসের পরে দু'শ বছর

ফরাসী শিল্পী

গ্রামদেশে প্রাকৃতিক দৃশ্য হয় মাঠ, ঘাট, নদী নালা, গাছ, পাথর, পাহাড়। শহরে আকাশে বাড়ীর ছাতের রেখাই যা কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য সৃষ্টি করে। ছবির জগতে আজকাল প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, কিন্তু মাত্র দু'শ আড়াইশ' বছর আগে পর্যন্ত চিত্রকলার সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিশেষ সম্বন্ধই ছিলো না।

ভাবলে অবাক লাগে যে গুহার মানুষরা যে সময়ে জন্তুজানোয়ারের ছবি আঁকতো, সে সময় থেকে, হাজার হাজার বছর ধরে, সতেরো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, ইউরোপে প্রায় কেউই একখানা রীতিমত যাকে বলে প্রাকৃতিক দৃশ্য তা আঁকেন নি। রনেসাঁসের সময়ে ইতালিতে বহু বিখ্যাত শিল্পী জন্মান, ইতালির প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোরম, প্রায় অতুলনীয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বড় বড় শিল্পীদের মধ্যে কেউই একখানাও প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকেননি। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার কথা ভাবেননি পর্যন্ত। যদিই বা ইতালিয়ানে ছবিতে কিছু মাঠঘাটের দৃশ্য এসে থাকে, তা এসেছে নিতান্তই পটভূমিকা বা ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসেবে, যার সম্মুখে বা ফোরগ্রাউণ্ডে ছবির আসল লোকজনকে আঁকা হয়েছে।

বিখ্যাত তিন-পাল্লার অল্টার-পিসটিতে ফ্লাণ্ডার্সের ভ্যান আইকরা প্রায় যথার্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য বা ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকেছিলেন বলা যায়। কিন্তু তবুও ছবিটিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়ে ঘটনার প্রাধান্য অনেক বেশী ছিলো। অর্থাৎ অল্টার পিসেও প্রাকৃতিক দৃশ্যটুকু ব্যাকগ্রাউণ্ডেই পড়ে গেছে, ফোরগ্রাউণ্ডে লোকজনের ঘটনাই প্রধান।

অবশ্য জার্মানীতে ১৫০০ সাল নাগাদ কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা হয়েছিলো, কিন্তু সেগুলির উপর লোকের দৃষ্টি বিশেষ পড়েনি।

শুনলে আরও অবাক লাগবে যে ইতালিয়ান প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রথম

ভাল করে আঁকেন, কোন ইতালিয়ান নয়, একজন ফরাসী শিল্পী। তাঁর নাম হচ্ছে নিকোলাস পুস্যাঁ। পুস্যাঁর আগ্রহ ছিলো পুরাকালের গ্রীক গল্প আর রোমান পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে। তাঁর ছবিতে সমুখদিকটা অর্থাৎ ফোরগ্রাউণ্ডে সাধারণত থাকতো গ্রীক দেবদেবী, কিন্তু ব্যাক-গ্রাউণ্ডে প্রায়ই হতো সত্যিকারের ল্যাণ্ডস্কেপ।

নিকোলাস পুস্যাঁর জন্ম ফ্রান্সে ১৫৯৪ সালে। তিনি মারা যান, রোমে ১৬৬৫ সালে। তাঁর একটা ছবির নাম 'শেপার্ড্স্ অভ্ আর্কেডিয়া'। আর্কেডিয়া কোথায় জানো? আর্কেডিয়া ছিলো পুরাকালের গ্রীসের একটা জায়গা, যেখানে নাকি দুঃখকষ্ট ছিলো না, লোকে সদাই প্রফুল্ল, খোলামেলা মনে, পরের উপকার নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। আর থাকতো মেষপালকের দল। ছবিতে পুস্যাঁ মেষপালকদের দেখিয়েছেন তারা যেন একটি মার্ব্‌লের কবরের সম্মুখে কথা বলছে। একজন কবরটির গায়ে একটি লেখা হাত দিয়ে দেখাচ্ছে। তাতে লেখা 'আমিও আর্কেডিয়ায় বেঁচে ছিলুম।' পুস্যাঁর আরেকটি বিখ্যাত ছবি আছে, তাঁর নাম 'ফ্লোরার রাজত্ব।' ছবিটি ক্যান্‌ভাসের উপর তেলরঙে আঁকা। এ ছবির ফোরগ্রাউণ্ডটি যদিও অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ শিশুতে ভর্তি, এমনকি আকাশেও অশ্বারোহীর দল আঁকা, তবুও ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে ল্যাণ্ডস্কেপের বাহাদুরি সুস্পষ্ট।

আরেকজন ফরাসী শিল্পী ইতালিতে থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকে প্রসিদ্ধ হন, তাঁর নাম ক্লোদ্ লরেন। তাঁর আসল নাম ক্লোদ অন্য কিছু ছিল, কিন্তু যেহেতু তাঁর ফ্রান্সের লরেনের একটি গ্রামে জন্ম, সেহেতু তাঁর নাম ক্লোদ লরেনই রয়ে গেছে। প্রবাদ আছে যে প্রথম বয়সে তিনি ভাল বাবুর্চি ছিলেন, পরে ইতালিয়ান এক শিল্পীর কাছে বাবুর্চি হিসেবে চাকুরী নেন। তাঁর বাড়ীতে রান্না করা ছাড়া আরও একটি কাজ ছিলো, ভদ্রলোকের তুলিগুলি রোজ পরিষ্কার করে রাখা। শোনা যায় এই তুলি সাফ করতে করতে তাঁর আঁকার শখ হলো। তাঁর প্রভু তাঁকে কিছু শেখালেন, তার পরে ক্লোদ নিজেই নিজের গুরু হয়ে বসলেন। ক্লোদ লরেনের ঠিক কোন বছরে জন্ম জানা নেই, তবে ১৬০০ সালের কাছাকাছি ; মারা যান ১৬৮২ সালে।

ক্লোদ লরেনের ছবিতে লোকজন থাকতো, তবে সাধারণত তারাই ছবি জুড়ে বসতো না, তারা হতো গৌণ। তাঁর ছবিতে ল্যাণ্ডস্কেপই

হতো মুখ্য, এমন কি পুসাঁ্যার চেয়েও মুখ্য। তাই ক্লোদ লরেনকে মাঝে মাঝে ল্যাণ্ডস্কেপ চিত্রশিল্পের আদিপুরুষ বলা হয়। তিনি আবার ল্যাণ্ডস্কেপের চেয়ে সমুদ্রের দৃশ্য আঁকতে আরও ভালবাসতেন, সুতরাং তাঁকে সীস্কেপ শিল্পীও বলা যায়। প্রাকৃতিক দৃশ্য একেবারে ইতালিয়ান রীতিতে আঁকা, তাতে মেঘ আর আলোর খেলা অতি অদ্ভূত, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ আঁকার হাত অত ভাল নয়।

ক্লোদ লরেন বা পুসাঁ্যার পরে উল্লেখযোগ্য শিল্পীর নাম করতে হলে একেবারে প্রায় একশ বছর লাফিয়ে, যেতে হবে আঠারো শতকে। আঁতোয়ান ওয়াতো ১৬৮৪ সালে ভ্যালেন্সিয়ন্জে এ জন্মান, মারা যান ১৭২১ সালে। মাত্র ৩৯ বছর বেঁচেছিলেন। তিনি একবার একটা টুপির দোকানের জন্যে একটুকরো কাঠের উপর একটা ছবি আঁকেন, সাইনবোর্ড হিসেবে। বেচারী ওয়াতো খুব দুঃখে দিন কাটিয়েছেন। প্রথম দিকে অত্যন্ত গরীব ছিলেন। প্যারিসে যখন ছবি আঁকতে এলেন তখন খুব পরিশ্রম করতেন, কিন্তু টাকা এত কম পেতেন যে প্রায়ই উপবাসে কাটাতেন। শেষে যখন অবস্থা স্বচ্ছল হলো আর শিল্পী হিসেবে বিখ্যাত হলেন তখন কিন্তু আর ভোগ করতে পেলেন না, কারণ দারিদ্র্যে তাঁর শরীরে এমন রোগ বাসা বেঁধেছিলো, ভোগ করা দূরে থাকুক তিনি সেই রোগে অল্পদিনের মধ্যে মারাই গেলেন।

ওয়াতোর জীবনে এই সব দুঃখের ঘটনা বলুলম, তার কারণ আছে। তিনি যেসব ছবি এঁকে গেছেন সে সবে বিষাদের চিহ্নমাত্র নেই, দারিদ্র্যের নামগন্ধ নেই। ওয়াতো নিজে যেমন দারিদ্র্যে কাটিয়েছেন তাঁর ছবির লোকজন আবার ঠিক সেই রকম ধনী।

নোংরা কাপড়চোপড়পরা জরাজীর্ণ গরীব লোক না এঁকে তিনি আঁকলেন সিল্ক স্যাটিন পরা বড় লোকের ছেলে মেয়ে। নিজের মত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করা লোক না এঁকে, তিনি আঁকলেন এমন সব স্ত্রীপুরুষ যারা চিরটা কাল যেন আমোদ আহ্লাদ, নাচ, গান, পিক্নিক্, বাগানবাড়ী, প্রেম নিয়েই মেতে আছে। নিজের মত কুৎসিত কর্কশ লোক না এঁকে, তিনি আঁকলেন এমন সব লোক যারা কমনীয়তা, নম্রতা, ভব্যতার চূড়ান্ত। ওয়াতোর লোকজনের মত এত নির্ঝঞ্ঝাট, গায়ে ফুঁ-দিয়ে বেড়ানো, অফুরন্ত অবসরের মধ্যে থাকা, স্ত্রীপুরুষ যেন দেখা যায় না। ওয়াতোর একটি ছবির উল্লেখ এখানে করা যায়, তার

নাম 'এম্বার্কেশন ফর সিথিয়রা'। ছবির বিষয়বস্তু শুনলেই বুঝতে পারবে। কয়েকটি ফুর্তিবাজ, লঘুচিত্ত যুবক আর তাদের প্রেমিকারা একটি স্বপ্নের জাহাজ চড়ে প্রেমদ্বীপে যাবার জন্যে তৈরি—দূরে সোনালী কুয়াসার মধ্যে দিয়ে প্রেমদ্বীপ দেখা যাচ্ছে।

এর পরে নাম করতে হয় আরেকজন বিখ্যাত ফরাসী শিল্পীর, যিনি ওয়াতোর অল্প কিছুদিন পরে জন্মান। তাঁর নাম জঁ।-বাপ্তীস্ত সিমেয় শার্দাঁ, জন্ম প্যারিসে ১৬৯৯ সালে, মৃত্যুও প্যারিসে ১৭৭৯ সালে। তিনিও এককালে সাইন-বোর্ড এঁকেছিলেন, বোধহয় ওয়াতোর কাছ থেকে শিখে। কিন্তু শার্দাঁ এক সাইনবোর্ড আঁকেন, টুপির দোকানের নয়। সে-ছবিতে দেখালেন, রাস্তার উপর লোকের ভীড়, আর তারই মাঝখানে এক ডাক্তার তরোয়াল খেলে হেরে গেছে এমন একটি লোকের ক্ষত বেঁধে দিচ্ছে।

শার্দাঁ স্টিল্‌লাইফ আঁকতে ভালবাসতেন। স্টিল্‌লাইফ কি, আগে বলেছি। যেসব ছবিতে প্রাণহীন ছবি আঁকা হয়, যেমন ফল, মরা মাছ, পাখী বা খরগোস, হাড়ি কলসী বা কাটা সাজানো ফুল ইত্যাদি। শার্দাঁর স্টিল্‌-লাইফ অতি উঁচুদরের। প্রায় দেড়শ বছর পরে ফরাসী চিত্রশিল্পে আরেক দিক্‌পাল দেখা দেন, তাঁর নাম সেজান্। তাঁর ছবি শারদাঁর স্টিললাইফের কথা মনে করিয়ে দেয়—সেই গভীরত্ব, সেই বস্তুনিষ্ঠতা, সেই রেখার স্বল্পতা, রঙের গুরুভার আর কঠোরতা। সেজানের মতই শার্দাঁ প্রাণহীন জিনিসের আসল প্রাণ যেন তুলি দিয়ে টেনে বার করতেন, তাদের চরিত্র ফুটিয়ে তুলতেন, ছবির কয়েকটি জিনিসের সম্বন্ধের মধ্যে যেন স্থাপত্যের আইন প্রকাশ করতেন, এক-টুকরো রুটির মধ্যে যেন রুটির গুণটুকু তুলি দিয়ে এঁকে বলে দিতেন।

ঠিক একই গুণ শার্দাঁ আনতেন প্রতিকৃতি আঁকার মধ্যে। এখানেও সেজানের সঙ্গে তাঁর বেশ মিল। কিন্তু তৃতীয় এক ধরনের ছবিতে শার্দাঁ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, সে হচ্ছে বাড়ীর মধ্যে লোক-জনের ছবি, তাদের দৈনন্দিন কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের ছবিতে প্রায়ই ছোট ছেলে মেয়ে এসে গেছে। যেমন একটি ছবিতে খাবার আগে মা ছেলেমেয়েকে স্তোত্র পাঠ করাচ্ছেন। আরেকটিতে একটি ছোট ছেলে টেবিলের উপর লাট্টু ঘোরাচ্ছে। আরেকটিতে মা ছেলেকে শেখাচ্ছেন কেমন করে বাইরে গেলে নতুন টুপির যত্ন নিতে হয়।

শার্দাঁর সময়ে লোকের পোষাক আমাদের যুগের থেকে যদিও তফাৎ ছিলো তবুও তাঁর আঁকা কোন ছবি দেখলেই মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে যায়, এ তো সত্যিকারের লোকের মতন!' মনে হয় একটা অদ্ভুত কিছু এঁকে শার্দাঁ আমাদের তাক লাগিয়ে দিতে চান না, সাধারণ ফরাসী পরিবারে সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনাই দেখাচ্ছেন। এখানেও সেজানের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল। সেই জন্যে শার্দাঁর নাম 'নিত্যকর্ম, নিত্যনৈমিত্তিক জিনিষের শিল্পী।'

শার্দাঁর পরেই নাম করতে হয় বিখ্যাত শিল্পী ফ্রাগোনারের। তিনি জন্মান ১৭৩২ সালে, মারা যান ১৮০৬ সালে। তবে এঁর সম্বন্ধে কিছু না বলে, চলো যাই একেবারে ফরাসী বিপ্লবের দিনে।

১৭৯৩ সাল। ফ্রান্সে রাজার রাজত্ব শেষ হয়েছে, বিপ্লবের জয় হয়েছে। সাধারণ লোক বহুযুগ ধরে অত্যাচার সহ্য করেছে, শেষে অসহ্য বোধ করে রুখে উঠেছে। ফ্রান্সে গণতন্ত্র হলো। গণতন্ত্রের যারা শত্রু এমন শত শত লোকের মাথা খসলো। রাজা আর রাজ-পরিবার কারাগারে বন্দী হলো। ভোটে ঠিক হলো তাদেরও মুণ্ডচ্ছেদন হবে।

"রাজাকে মেরে ফেলা হবে কিনা" এই প্রশ্নের উত্তরে যাঁরা 'হ্যাঁ' বলে জবাব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক ভদ্রলোক, নাম জ্যাক লুই দাভিদ্। দাভিদ্ ছিলেন চিত্রশিল্পী, যদিও রাজদরবারে ছবি এঁকে তাঁর রোজগার চলতো, তবুও, তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিলো যে বিপ্লবের পথ সত্যের পথ।

এই সময়ে বিপ্লববাদীরা পুরানো রোমান গণতন্ত্রের কথা, যা আমরা ইতিহাসের বইয়ে পড়ি, খুব পড়তেন। পড়ে পড়ে তাঁদের ইচ্ছে করতো পুরাকালের রোমানদের মত তাঁরাও হবেন বিরাট শক্তিমান আর নির্ভীক। তাঁরা আশা করতেন যে তাঁদের গণতন্ত্র রোমান গণ-তন্ত্রের মতই হবে। অতএব ফরাসী বিদ্রোহের পর রোমান বীরদের নকল করা একটা ফ্যাশন দাঁড়িয়ে গেলো। দাভিদ করলেন কি থিয়েটারে অভিনেতাদের ফরাসী কাপড়জামা ছাড়িয়ে রোমান সাজ পোষাক পরালেন। তাই দেখে দেখে অন্যান্য লোকরাও পুরানো রোমানদের মত পোষাক করা শুরু করলো। এমন কি আসবাবপত্রও রোমানদের নকল করে চলতি হলো। দাভিদ দেখলেন লোকে এখন

রোমানই চায়, তাই তিনি রোমান ইতিহাস থেকে বেছে বেছে অনেক দৃশ্য আঁকলেন।

বিপ্লববাদীরা দাভিদের ছবিকে যত মাথায় তুলতেন, আজকাল আর তাঁর ছবি আমাদের অত ভাল লাগে না। কিন্তু তবুও দাভিদের স্থান ফরাসী বা ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসে বেশ উঁচুতে, কারণ তিনি এক বিশেষ ধরণের রীতির প্রবর্তন করেন। পুরানো রোমান ও গ্রীক যুগকে ক্ল্যাসিকাল যুগ বলা হয়, তাই দাভিদ যে রীতিকে জনপ্রিয় করলেন চিত্রকলায় তাকে ক্ল্যাসিকাল রীতি বলা হয়। সেই সময়ে দাভিদ আর তাঁর সমসাময়িক ক্ল্যাসিকাল রীতির শিল্পীরা বলতেন যে, ক্ল্যাসিকাল রীতি ছাড়া অন্য কোন রীতিতে আঁকার কোন মানে হয় না। তাঁরা এই বিশ্বাসে চিত্রশিল্পের অনেক রীতিনীতি, আইন-প্রকরণ তৈরি করলেন, এবং সেবিষয়ে লিখলেন। তাঁরা আশা করলেন যে ভাল শিল্পীমাত্রেই তাঁদের আইন মেনে আঁকবে।

বিপ্লবের আগে থেকেই দাভিদ রোমানদের ছবি আঁকতে আরম্ভ করেছিলেন। তার মধ্যে একটির নাম ছিল 'হোরেশিয়দের শপথ'। রোমান ইতিহাস যদি মনে থাকে তাহলে মনে আছে বোধ হয় তিন হোরেশিয়াস ভাই খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। তখন রোমের সঙ্গে অন্য এক নগরের যুদ্ধ। মিছামিছি তুই নগরের সব লোক যুদ্ধ না করে ঠিক হলো যে এতগুলি লোকের প্রাণ নষ্ট করার কোন মানে হয় না, প্রত্যেক নগর থেকে তিনজন বাছাই-করা যোদ্ধা আসুক, তারা অন্য নগরের তিনজন বাছাই-করা যোদ্ধার সঙ্গে লড়ুক, তাদের যুদ্ধের যে ফলাফল হবে, তাই তুই নগর মেনে নেবে। রোমানরা হোরেশিয়দের বাছলেন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে শপথ করলেন, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। দাভিদ তাঁর ছবিতে এই শপথ করা দেখিয়েছেন।

যখন যুদ্ধ সাঙ্গ হলো, তখন তুই ভাই মারা গেছেন। কিন্তু তৃতীয় হোরেশিয়াস অন্য পক্ষের তিনজনকেই নিহত করে রোমের মুখ রাখলেন।

দাভিদের আরেকটি বিখ্যাত ছবি আছে তাতে তিনি দেখিয়েছেন গৃহরমণীরা ছুটে এসে ভীষণ যুদ্ধরত রোমান আর স্যাবাইনদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ থামাচ্ছেন। এই ছবিটি প্রায়ই ইতিহাসের বইয়ে দেয়া হয়।

দাভিদ প্রতিকৃতিও আঁকতেন। একবার মাদাম রেকামিয়েরের বলে একটি মহিলার ছবি আঁকেন, মহিলাটি একটি রোমান আরাম কেদারায় শুয়ে, মহিলার পোশাকও রোমান ধরনের। সে যুগে মহিলাদের মধ্যে রোমান ধরনের পোশাক খুব চলন ছিলো।

বিপ্লবের পর এলো নেপোলিয়নের যুগ। নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট-পদে অভিষিক্ত করলেন। দাভিদ নেপোলিয়নের খুব ভক্ত ছিলেন, তাঁর অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন। একটা ছবিতে দেখালেন নেপোলিয়ন ঘোড়ায় চড়ে, ঘোড়া পিছনের দুপায়ে ভর করে শূন্যে লাফ দিয়ে উঠেছে, নেপোলিয়ন আল্‌প্‌স্‌ পেরোচ্ছেন। নেপোলিয়নের মাথায়-মুকুট-পরানো ছবিও দাভিদ আঁকলেন (নেপোলিয়ন নিজেই নিজের মাথায় মুকুট পরান)। তাছাড়া 'যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন' ছবিও দাভিদ আঁকেন।

কিন্তু নেপোলিয়নের পরে আরেক রাজা এলেন—যে রাজা বেচারী প্রাণ হারিয়েছিলেন, ইনি তাঁরই বংশধর। কাজে কাজেই দাভিদ তো আর নতুন রাজার রাজশিল্পী হতে পারেন না, তাঁরই পূর্বপুরুষের মৃত্যু-দণ্ডের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন যে! উল্টে দাভিদকে ফ্রান্স ছেড়ে পালাতে হলো, বাকি জীবনটা ব্রাস্‌ল্‌সে কাটালেন। দাভিদ জন্মান প্যারিসে ১৭৪৮ সালে। বাবা ছিলেন এক স্থপতি। ব্রাস্‌ল্‌সে ১৮২৫ সালে মারা যান।

কিন্তু ক্ল্যাসিকাল রীতির কঠোর নিয়মকানুন চালু হয়ে গেলো। ফ্রান্সে থাকতে দাভিদের অনেক ছাত্র ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত হলেন। এঁদের মধ্যে একজনের নাম অ্যাঙ্গ্‌র্‌। জঁা অগস্ত দমিনিক অ্যাঙ্গ্‌র্‌ জন্মান ১৭৮০ সালে, মারা যান ১৮৬৮ সালে। অ্যাঙ্গ্‌রের মত নক্সাবিদ বা ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান দুর্লভ। তার মানে তাঁর চিত্রের রেখা হতো অতি সুন্দর; বাস্তবিকপক্ষে তাঁর ছবিতে রঙ বা আলোর চেয়ে নক্সা বা রেখার নৈপুণ্য ছিলো অনেক বেশী। তিনি রঙ বা আলোর চেয়ে রেখা সম্বন্ধে ভাবতেনও বেশী। সব ক্ল্যাসিকাল শিল্পীই অবশ্য তাঁদের ছবিতে রঙের চেয়ে রেখা আর আকারের প্রাধান্য অনেক বেশী দিতেন, তাই তাঁদের রঙগুলি অধিকাংশ সময়েই নির্জীব, ম্যাড়মেড়ে হতো। অ্যাঙ্গ্‌র্‌ সবচেয়ে ভাল আঁকতেন প্রতিকৃতি। যে সব প্রতি-

কৃতি তিনি পেন্সিলে এঁকে রঙ দিতেন না, সেগুলি থেকে বোঝা যায় তিনি রেখা বা নক্সা কত ভাল বুঝতেন।

দাভিদের আরেকজন শিষ্য ছিলেন, তাঁর নাম বার্ঁ গ্রো। দাভিদের প্রবর্তিত ক্ল্যাসিকাল রীতিতে তিনি যতগুলি ছবি আঁকেন, দুঃখের বিষয় তার কোনটাই ভাল উৎরায়নি, বরং তিনি অন্য রীতিতে যেসব ছবি আঁকেন সেগুলির জন্যই তাঁর নাম। গ্রো ক্ল্যাসিকাল রীতি ধরেই ক্রমাগত এঁকে চললেন, যখন কিছুতেই সফলকাম হলেন না তখন মন ভেঙে গেলো। অথচ তাঁর যেসব সত্যিকারের ভাল ছবি, সেগুলি সম্বন্ধে গ্রোর কিছু মায়া ছিলো না, কারণ সেগুলি গ্রীক বা রোমানদের ছবি নয়। গ্রো আসলে সেই সব ছবি ভাল আঁকতেন যা তিনি নিজের চোখে দেখতেন, আর সেই কারণেই সে-সব ছবি আমাদের আজও ভাল লাগে।

সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একজন শিল্পী সঙ্গে করে নিয়ে যেতে নেপো-লিয়নের শখ হলো। গ্রোকে তিনি ইন্স্পেক্টর অভ্ রিভিয়ুজ করে তাঁর বাহিনীতে নিলেন, যাতে গ্রো তাঁর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে থেকে যুদ্ধের ছবি আঁকতে পারেন। গ্রো দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখতেন, তাই যুদ্ধ যে কী ভয়াবহ জিনিস, গরিমাময় নয়, তা বুঝলেন। তাঁর ছবিতে সৈন্যদের শৌর্যবীর্য ফুটে উঠলো বটে, কিন্তু তাদের অসহ্য কষ্ট আর যন্ত্রণাও তিনি দেখালেন।

এর পর একজন ফরাসী শিল্পীর কথা বলবো যিনি ক্ল্যাসিকাল চিত্র-রীতিতে একেবারে বিশ্বাস করতেন না। ক্ল্যাসিকাল শিল্পীরা চিত্রশিল্পের যে সব কড়া, বাঁধাধরা আইনকানুন করলেন, সে সবের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষেপে গেলেন। তাঁর নাম য়োজেন্ দেলাক্রোয়া। জন্ম ১৭৯৮ সালে, মৃত্যু ১৮৬৩ সালে। ক্ল্যাসিকাল চিত্ররীতির বিরুদ্ধে তিনি শুরু করলেন বিদ্রোহের অভিযান। দেলাক্রোয়ার দলের নাম হলো রোম্যান্টিসিস্ট্স্। এঁরা গ্রীক-রোমানদের ছবি আঁকার কোন সার্থকতা দেখলেন না। তাঁরা ব্যস্ত হলেন তাঁদের চারধারে জগতে যা ঘটছে তাই আঁকতে। ক্ল্যাসিকাল রীতির বিরুদ্ধে তাঁরা আরেক দিক দিয়েও বিদ্রোহ করলেন। রোম্যান্টিসিস্টরা রঙের অনুরক্ত হলেন ; তাঁরা ঘোষণা করলেন যে নক্সা বা রেখার চেয়ে ছবিতে রঙ অনেক বেশী মূল্যবান।

অবশ্য এতে ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদবাদী শিল্পীরা গেলেন নিদারুণ চটে, খেয়ালপন্থী বা রোম্যান্টিসিস্টদের হলেন তাঁরা ঘোরতর শত্রু, যেকোন

উপায়ে তাদের ধ্বংসসাধন করা হলো তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু আস্তে আস্তে দেলাক্রোয়া আর তাঁর সহধর্মীরা জনপ্রিয় হলেন, এবং আগেকার যুগের ক্ল্যাসিকাল শিল্পীদের প্রতাপ তাঁরা ছিনিয়ে নিলেন।

দেলাক্রোয়া ক্রুজেডারদের, বাইব্‌ল কাহিনী, অ্যাল্‌জিয়ার্সের লোক-দের, তদানীন্তন গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধের (দেলাক্রোয়া মনেপ্রাণে গ্রীকদের স্বপক্ষে ছিলেন), এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে ছবি আঁকেন। সাদা-কালোয় ছাপা হলে দেলাক্রোয়ার ছবির খুব কিছু থাকে না, তাঁর রেখা আঁকা বা নক্সার হাত অন্য শিল্পীদের মত অত ভাল ছিলো না। কিন্তু তাঁর রঙ ছিলো অপূর্ব। আশা করি দেলাক্রোয়ার আসল ছবি তোমরা একদিন দেখবে।

দেলাক্রোয়ার একটি ছবির নাম 'মুক্তি জনসাধারণকে চালিত করছেন'। ১৮৩০ সালে ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিপ্লব হয়, প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় সম্রাটের সৈন্যের সঙ্গে প্যারিসবাসীর যুদ্ধ হয়। এ-ছবিটি সেই যুদ্ধেরই একটি দৃশ্য, খুব উত্তেজনাপূর্ণ, গতি আর কর্মব্যস্ততায় ভরপুর। ছবিটির দুটি মানে আছে। এক তো ১৮৩০ সালের বিপ্লবের কাহিনী। দ্বিতীয় পক্ষে, ছবিটিতে দেলাক্রোয়া বললেন যে, ক্ল্যাসিকাল রীতি হয়ে উঠেছিলো চিত্রশিল্পে সব রকম প্রগতির বিরুদ্ধে জগদ্দল পাথর, তাকে উৎপাটন করতেই হবে। তাই এ-ছবিকে আরেকটি আখ্যা দেয়া যায়, সেটি হচ্ছে, মুক্তি বা স্বাধীনতার দূত, ক্ল্যাসিকাল রীতির অত্যাচার থেকে রোম্যান্টিক আর্টকে মুক্ত করছে।

দেরীতে শুরু

আন্তর্জাতিক চিত্রশিল্প প্রদর্শনী কাকে বলে জানো? এ ধরনের প্রদর্শনী হচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের শিল্পীদের ছবি সংগ্রহ করে একজায়গায় দেখানো, যাতে বোঝা যায় বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের মিল কোনখানে, অমিলই বা কত বেশী। কিছুদিন আগে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে এরকম একটি প্রদর্শনী হয়, তোমরা হয়তো দেখে থাকবে।

ধরা যাক, ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে (অর্থাৎ ২৫০ বছর আগে) ইওরোপের সব বড় বড় দেশ বসে স্থির করলো যে একটি আন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনী

করা হোক। আমরা অবশ্য এটা নেহাতই কল্পনা করছি, কারণ তখনকার দিনে এধরনের কথা কেউ ভাবতেই পারতো না। এবার এসো ১৭০০ সালের প্রদর্শনীর একটা নিয়মকানুন করা যাক।

১৭০০ সালই ধরা যাক। প্রত্যেক দেশ একটিমাত্র ছবি পাঠাতে পারবে, আর তাদের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ হবে, সেটি পাবে প্রথম পুরস্কার।

এখন ধরা যাক একে একে সব দেশ থেকে ছবি এলো।

ভেনিস থেকে এলো একটি তিশান
রোম থেকে এলো একটি মিকেলাঞ্জেলো
স্পেন থেকে এলো একটি ভেলাস্‌কেথ
ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকে এলো একটি রুবেন্স
নেদারল্যাণ্ডস্‌ থেকে এলো একটি রেম্‌ব্রাণ্ট
জার্মানি থেকে এলো একটি ডিউরর
ফ্রান্স থেকে এলো একটি পুসঁ্যা

ইংলণ্ডের ছবি কই? সব বড় বড় দেশই ছবি পাঠিয়েছে, কিন্তু ইংলণ্ড কই? অথচ ১৭০০ সালে ইংলণ্ড একটি পরাক্রমশালী দেশ! কিন্তু সেই ইংলণ্ড থেকে মার্জনা চেয়ে একটি চিঠি এলো এই বলে যে ইংলণ্ড খুব লজ্জিত, একটিও বিখ্যাত ছবি পাঠাতে পারলো না বলে, কারণ ইংলণ্ডে তখনও একটিও বিখ্যাত শিল্পী জন্মান নি। সে কী কথা! ইওরোপের মধ্যে একটি প্রধান দেশ—১৭০০ সালে প্রধানতম বললেও অত্যুক্তি হয় না—অথচ সেখানে নেই কোন বিখ্যাত শিল্পী! কি আপশোসের কথা! প্রদর্শনীতে একটা মস্ত ত্রুটি রয়ে গেলো যে! কিন্তু--

যদিও ১৭০০ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডে একটিও বড় শিল্পী জন্মান নি তবুও ইংলণ্ড খুব তাড়াতাড়ি ত্রুটি শুধরে নিলো। ১৭০০ সালে ইংলণ্ডের সর্বপ্রথম বিখ্যাত শিল্পী হোগার্থের বয়স মাত্র তিন বছর। বিলিয়ম হোগার্থ জন্মান ১৬৯৭ সালে, মারা যান ১৭৬৪ সালে। হোগার্থের পরপরই বহু ভাল ভাল শিল্পী ইংলণ্ডে জন্মালেন। আমাদের মনগড়া প্রদর্শনীটি যদি ১৭০০ সালে না করে আমরা ১৮০০ সালে করতুম তাহলে বহু প্রথম দরের ইংরেজ শিল্পীর ছবি থেকে আমরা বাছতে পারতুম।

হোগার্থ জীবন আরম্ভ করেন রুপোর উপর এন্‌গ্রেভিংএর কাজ করে। খানিকটা ডিউররের মত। তারপর তিনি তামার উপর

এন্‌গ্রেভিং করতে শিখলেন, আর তামার পাত থেকে ছবি ছাপাতে শিখলেন। এই সব ছাপা ছবি বা প্রিণ্ট খুব জনপ্রিয় হলো, আর তা বিক্রি করে হোগার্থের বেশ দু পয়সা হলো। কিন্তু এন্‌গ্রেভিং করে হোগার্থের মন উঠলো না, তাঁর একান্ত বাসনা তিনি চিত্রশিল্পী হবেন। তিনি ছবি আঁকতে শুরু করলেন, কিন্তু ছাপা ছবিতে তাঁর এত খ্যাতি ছিলো যে লোকে তাঁর সম্বন্ধে ঐ কথাই মনে রাখতো, চিত্রশিল্পী হিসেবে আমল দিতে নারাজ হতো। লোকে কিনতে চাইতো তাঁর প্রিণ্ট আর এন্‌গ্রেভিং। হোগার্থের মুশকিল হলো। তাঁর আঁকা ছবি কেউ কিনতে চায় না, কিন্তু তাঁর ছবি নকল করা প্রিণ্ট বা এন্‌-গ্রেভিংএর জন্যে খুব চাহিদা। আজকাল অবশ্য আমরা হোগার্থকে বড় চিত্রশিল্পী হিসেবে জানি—প্রথম মহৎ ইংরেজ শিল্পী বলে।

আজকাল খবরের কাগজের কৃপায় সবাই 'কমিক' পড়ে বা দেখে। অনেক কাগজেই কিছুদিন অন্তর পাঁচ-ছটা করে 'কমিক' ছবি বেরোয়। হোগার্থ প্রায় কতকটা এই প্রথার আশ্রয় নিয়ে ছবি আঁকেন। ছটা আটটা ছবি পরপর একই লোকের সম্বন্ধে এঁকে তিনি দেখাতেন তাদের দিনে দিনে কী হচ্ছে। কিন্তু হোগার্থ হাস্যকৌতুক বিতরণ করার জন্যে ছবি আঁকতেন না। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁর সময়ে ইংলণ্ডের কতগুলি ব্যাপার কত খারাপ ছিলো। ছবিতে হাস্যকৌতুক নিশ্চয় ছিলো। কিন্তু সে হাস্যকৌতুককে আমরা বলি শ্লেষ।

হোগার্থ পর পর কয়েকটি মিলিয়ে এক সেট ছবি এঁকে দেখান কি করে সে সময়ে একজন লোক পার্লামেণ্টের সভ্য হতো। একটা ছবিতে দেখালেন লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে। আরেকটা ছবিতে লোকটি গুণ্ডা ভাড়া করছে যারা ভয় দেখিয়ে তাকে ভোট দেওয়াবে। আরেকটাতে লোকটি ভোটারদের ঘুষ দিচ্ছে—অর্থাৎ তাকে ভোট দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে টাকা দিচ্ছে। প্রত্যেকটি ছবিই ছবি হিসেবে খুব ভাল, কিন্তু সবগুলি একসঙ্গে পর পর দেখানোই ছিলো উদ্দেশ্য, খবরের কাগজের 'কমিক' পৃষ্ঠার মত। ছবিগুলি হোগার্থের সময়ে ইংলণ্ডের লোকের মনে গভীর রেখাপাত করে। সম্ভবত ছবিগুলির দরুনই ইংলণ্ডের নির্বাচন-প্রথার অনেক উন্নতি হয়। অন্তত আজ-কাল ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট নির্বাচন অত্যন্ত সৎভাবে চালিত হয়।

হোগার্থ প্রতিকৃতিও আঁকতেন। ছোট্ট একটি কুকুর সঙ্গে করে নিজের একটা ছবি আঁকেন। 'চিংড়িমাছ বিক্রিওলী' বলে একটা ছবি আঁকেন। আজকাল বিলেতে চিংড়িমাছ কিনতে হলে দোকানে যেতে হয়, হোগার্থের সময়ে চিংড়ি-বিক্রি-করা-মেয়েরা মাথায় চিংড়ির ডালা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করে বেড়াতো।

চিংড়িমাছ বিক্রি করা মেয়েটিকে হোগার্থ এমনভাবে এঁকেছেন ঠিক যেমন হ্যাল্‌স্ তাঁর ছবিতে হাসি ধরে নিতেন—স্থির, নিশ্চিত তাড়াতাড়ি কয়েকটি তুলির টানে। যদি ছবিটা ডিউররের কোন ছবির পাশে রাখো তাহলে হোগার্থের ছবিকে অসম্পূর্ণ মনে হবে, শেষ-না-করা মনে হবে। তবুও ডিউররের ছবির প্রতিকৃতি হিসেবে যেসব গুণ সেসব গুণের কোন ব্যত্যয় হোগার্থে নেই।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি, হোগার্থ তখনও বেঁচে, তখনও ছবি আঁকছেন, দু জন ইংরেজ শিল্পী ক্রমশ ক্রমশ খ্যাতির চূড়ায় উঠলেন। একজন স্যর জশুয়া রেনল্‌ড্‌স্, অন্যজন টমাস গেন্‌স্‌বরা। দুইজনই খুব ভাল প্রতিকৃতি আঁকতে পারতেন, সেই হিসেবে তাঁদের খুব খ্যাতি ছিলো। স্যর জশুয়া রেনল্‌ড্‌স্ ছিলেন টমাস গেন্‌স্‌বরার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। তাই স্যর জশুয়া রেনল্‌ড্‌সের কথাই আগে বলি।

১৭১২ সালে রেনল্‌ড্‌স্ জন্মান। প্রথম বয়সে তিনি শিল্পী হাড্‌-সনের কাছে শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তী জীবনে নানা সম্মানে ভূষিত হয়ে ১৭৯২ সালে মারা যান।

ভূমধ্যসাগরে আরবদেশের একটি নৌবাহিনী ব্রিটিশ জাহাজ আটকাতে আরম্ভ করে ; ফলে ইংরেজ সরকার সেই নৌবাহিনীর সঙ্গে একটা চুক্তি করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি জাহাজ দিয়ে এক ইংরেজ সেনাপতি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

রেনল্‌ড্‌স্ ছিলেন এই সেনাপতির বন্ধু, তিনি তাঁকে তাঁর সঙ্গে জাহাজে যেতে বললেন। রেনল্‌ড্‌স্ নেমন্তন্ন নিলেন, আর বন্ধুর সঙ্গে ইতালি গিয়ে সেখানে রয়ে গেলেন। সেখানে বসে বসে মিকেলাঞ্জেলো, তিশান, করেজ্‌জো, র‍্যাফেইল প্রভৃতির ছবি দেখে শিখতে লাগলেন। সবচেয়ে ভাল লাগলো তাঁর মিকেলাঞ্জেলো। মিকেলাঞ্জেলো তাঁর এত ভাল লাগলো যে দেখতে দেখতে তিনি কালা হয়ে গেলেন। শুনতে

অবাক লাগে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। সিস্তিন চ্যাপেলে রেনলড্‌স্‌ বসে বসে মিকেলাঞ্জেলোর ছবি দেখতেন। এত তন্ময় হয়ে দেখতেন যে তিনি খেয়াল করেননি যে বিশ্রী হাওয়ার মধ্যে সারাক্ষণ বসে আছেন। সারাক্ষণ কন্‌কনে হাওয়ায় থেকে তাঁর কান অসাড় হয়ে গেলো। গির্জা ছেড়ে চলে যাবার পরেও কিছুদিন বুঝতে পারেননি। কিন্তু এর কিছুদিন পরে তিনি কালা হয়ে গেলেন। শেষে কানে চোঙ লাগিয়ে শুনতে হতো।

লণ্ডনে ফিরে গিয়ে রেনল্‌ড্‌স্‌ বিখ্যাত প্রতিকৃতি-শিল্পী হলেন। সেকালে ক্যামেরা ছিলো না তো, সুতরাং ছবি রাখতে গেলে কোন শিল্পীকে দিয়ে আঁকাতে হতো। গরীব লোকে তো আর রেনল্‌ড্‌স্‌কে দিয়ে ছবি আঁকাতে পারতো না, তাই রেনল্‌ড্‌স্‌ যাদের ছবি আঁকলেন তারা অধিকাংশই অত্যন্ত ধনী, লর্ড, তাঁদের পত্নী, বা ছেলেমেয়ে। ইংলণ্ডের রাজা তাঁকে নাইট উপাধি দিলেন। তিনি স্যর জশুয়া রেনল্‌ড্‌স্‌ হলেন।

স্যর জশুয়া অত্যধিক পরিশ্রম করতেন, সর্বদা চেষ্টা করতেন কি করে উত্তরোত্তর উন্নতি করা যায়। সবচেয়ে ভাল আঁকতেন স্ত্রীলোক আর ছোট ছেলেমেয়ে। "স্ট্রবেরি গার্ল", "মাস্টার হেয়ার" "এজ অভ্‌ ইনোসেন্স", "ডাচেস্‌ অভ ডেভনশিয়র আর তাঁর মেয়ে" এই সব ছবি রেনল্‌ড্‌সের শ্রেষ্ঠ ছবি বলা যায়।

রেনল্‌ড্‌স্‌ হরদম নতুন নতুন রঙ, নতুন নতুন তেল নিয়ে পরীক্ষা করতেন। তার ফল সবসময়ে মোটেই ভাল হতো না। তাঁর অনেক ছবিই সেইজন্যে এখন, হয় রঙ জ্বলে গেছে, না হয় ফেটে চটে গেছে। তার মধ্যে কতগুলির রঙ আবার আঁকার কিছু দিনের মধ্যেই জ্বলে যায়। কিন্তু তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা কিছু কমেনি। তাঁর এক বন্ধু বলতেন 'রেনল্‌ড্‌সের আঁকা একটা পুছে-যাওয়া ছবিও অন্য শিল্পীর আঁকা জ্বলজ্বলে ছবির চেয়ে শতগুণে ভাল।'

স্যর জশুয়ার আঁকা একটি ছবি আছে তার নাম 'এঞ্জেল হেড্‌স'। পাঁচটি দেবশিশুর মুখ, কিন্তু আসলে একটি শিশুরই মুখ পাঁচদিক থেকে পাঁচ ভঙ্গীতে আঁকা।

অন্য শিল্পীর নাম আগে করেছি। তাঁর নাম টমাস গেন্‌স্‌বরা। গেন্‌স্‌বরার জন্ম ১৭২৭ সালে। তিনি নিজেই নিজের গুরু ছিলেন,

অন্য কারুর কাছে শিক্ষা করেন নি। মারা যান ১৭৮৮ সালে। গেন্স্বরা শিল্পী-জীবন আরম্ভ করেন প্রতিকৃতি এঁকে, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য আকতে সবচেয়ে ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপ বিক্রি হতো না বলে তিনি সারাজীবন পোর্ট্রেট বা প্রতিকৃতি এঁকে গেছেন। খুবই ভাল আঁকতেন। যাদের আঁকতেন তাঁদের এত সুন্দর, নম্র, কমনীয় দেখাতেন যে তাঁকে দিয়ে ছবি আঁকাতে সকলে ব্যস্ত হতো। রেনল্ড্সের মত গেন্স্বরার রঙ তত উজ্জ্বল, জমকালো নয়, তাঁর রঙ বেশীর ভাগ রুপালি আর ধূসর।

গেন্স্বরার একটি ছবি জগদ্বিখ্যাত। তার নাম 'ব্লু বয়'। রেনল্ড্স্ নাকি একবার বলেছিলেন ছবিতে খুব নীল থাকলে ছবি সুন্দর হয় না। রেনল্ড্সের কথা অপ্রমাণ করার জন্য গেন্স্বরা এই ছবিটি আঁকেন। কি কারণে জানা নেই, গেন্স্বরা রেনল্ড্স্কে পছন্দ করতেন না, তাঁর সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করতেন। বোধহয় ঈর্ষা ছিলো। কিন্তু মারা যাবার আগে গেন্স্বরা রেনল্ড্সের কাছে মাফ চান এবং বলেন তিনি তাঁর কাজ কত পছন্দ করতেন!

গেন্স্বরা আর রেনল্ড্স্ দুজনে প্রায় একই লোকের প্রতিকৃতি এঁকেছেন। যেমন দুজনেই ডাচেস অভ্ ডেভনশিয়র আর মিসেস সিডন্সের ছবি আঁকেন। দুজনের মধ্যে কার আঁকা ভাল বলা শক্ত।

তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপের যা সমাদর হয়নি, মারা যাবার পর বিশেষ আজকাল, গেন্স্বরার ল্যাণ্ডস্কেপ খুবই সমাদর পেয়েছে। তাঁর পোর্ট্রেটের মত অত বিখ্যাত না হলেও, তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপ খুবই ভাল, এবং দুইএর জোরে গেন্স্বরা ইংরেজদের মধ্যে আজ প্রথম দরের শিল্পী।

আরো তিনজন ইংরেজ শিল্পী

তোমাদের ভূতের গল্প ভাল লাগে কি? ভূতুড়ে বাড়ী, রাত্তির বেলা ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো, কপাট খুলে গেলো, সাদা কাপড়-পরা লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে! কিন্তু এই ভূতটির কথা শুনেছো কি? যার নাম উকুনের ভূত! আরও মজা হচ্ছে যে উকুনের ভূত সম্বন্ধে

গল্প নেই, উকুনের ভূত কি রকম দেখতে তার ছবি আছে। সে ছবিটি আবার একটি বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা।

উকুনের ভূত ছবিটি যিনি আঁকেন তাঁর নাম বিলিয়ম ব্লেক। ১৭৫৭ সালে, অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের বছরে, ইংলণ্ডে তাঁর জন্ম। মারা যান ১৮২৭ সালে।

শিল্পী হিসেবে ব্লেক অন্যান্য শিল্পীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার একটা কারণ তিনি চিত্রশিল্পীও ছিলেন, আশ্চর্য ভাল কবিও ছিলেন। আরেকটা কারণ, ব্লেকের ছবি অন্যান্য শিল্পীদের ছবির মত মোটেই নয়। আরেকটা কারণ, ব্লেক তন্ময় হয়ে মনে মনে কি সব দেখতেন। ইংরেজীতে তাকে বলে ভিশন, ঠিক স্বপ্নও নয়, মানুষ জাগ্রত অবস্থায় পারিপার্শ্বিক ভুলে তাই দেখে। অনেকে বলে ব্লেকের মাথা একটু খারাপ ছিলো, হয়তো একটু ছিলো। হয়তো তিনি অন্য লোকদের থেকে শুধু একটু তফাত ছিলেন।

বরাবরই ব্লেকের শিল্পী হবার খুব ইচ্ছে। অনেক দিন ধরে তিনি এন্‌গ্রেভিং শেখেন, ফলে খুব সুদক্ষ এন্‌গ্রেভার হন। শেষে নিজে এন্‌গ্রেভিংএর ব্যবসা খোলেন, আর একই তামার পাতে নিজের কবিতা আর ছবি এন্‌গ্রেভ করা শুরু করেন। এই প্রথাটা তিনি নিজে প্রথম বার করেন। তার আগে হতো কি, বইয়ের ছবি ছাপা হতো তামার পাতের এন্‌গ্রেভিং থেকে, আর লেখা ছাপা হতো ছাপাখানার হরফ থেকে। ব্লেক একই প্লেটে ছবি আর কথা দুইই করলেন, যাতে ছবিটি লেখার অঙ্গ হয়ে যায়, আর লেখা ছবির অঙ্গ।

শুধুমাত্র নিজের লেখা বইয়ের জন্যেই ব্লেক ছবি এন্‌গ্রেভ করেন নি। আরও অনেক বইএর জন্যেই করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত যেগুলি সেগুলি তিনি বাইব্‌লের বুক অভ্‌ জোবের জন্যে আঁকেন। এই সব ছবিতে জোবের যন্ত্রণা একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। যখনই জোবের কথা ভাবি তখনই ব্লেকের ছবির কথা মনে পড়ে যায়।

ব্লেকের যে সমস্ত ছবি বইয়ে দেখা যায় সেগুলি নক্সা বা রেখার (ড্রয়িং) মত দেখায়। তার কারণ সেগুলি রেখা দিয়েই আঁকা। এন্‌গ্রেভিং রেখা দিয়েই করতে হয়। কিন্তু সাধারণত এন্‌গ্রেভিং করার আগে ব্লেক একটা পুরো ছবি রঙ দিয়ে এঁকে নিতেন, তাই দেখে এন্‌গ্রেভিং করতেন। সেই সব রঙীন ছবি থেকে বোঝা যায় যে ব্লেক রেখাতেও যেমন ছিলেন, রঙের হাত তাঁর ছিলো সেই রকম পাকা, দক্ষ।

ব্লেক চিত্রশিল্পে অনেক নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের কথা ভাবতেন। সেই সঙ্গে নতুন অনেক ইংরেজ শিল্পী ছবি আঁকতে লাগলেন যাঁরা নতুন পথের পথিক। কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট আলোচনা করা যাক।

বসন্তকালে কখনও কোন জীবন্ত গাছ দেখেছো কি যার পাতাগুলি সবুজ নয়, ব্রাউন? সকলেই জানে বসন্তকালে জ্যান্ত গাছের পাতার রঙ কখনও সবুজ ছাড়া অন্য কিছু হয় না। কিন্তু ব্লেকের সময়ে আঁকা ছবিতে যদি তুমি গাছ দেখো, তাহলে দেখে অবাক হবে যে তার পাতার রঙ ব্রাউন। আগেই বলেছি, গেন্‌স্‌বরার ল্যাণ্ডস্কেপ বিখ্যাত। কিন্তু তাঁর ছবিতে গাছের পাতার রঙ ব্রাউন শুনলে তোমাদের তাঁর উপর ভক্তি কমে যাবে না তো? এটা তো ঠিক যে গেন্‌স্‌বরা জানতেন গাছের পাতার আসল রঙ সবুজ! তবু ছবিতে ব্রাউন আঁকতেন কেন? নিশ্চয় তাঁরা মনে করতেন ছবিতে পাতার রঙ ব্রাউন হলে মানাবে ভাল, তার জন্যেই না?

গেন্‌স্‌বরার পরে ইংলণ্ডে এক শিল্পী জন্মালেন, তাঁর নাম জন্‌ কন্‌স্টেব্‌ল্‌। কন্‌স্টেব্‌ল্‌ ছবিতে গাছের পাতার রঙ বদলে দিলেন, তাঁর পর থেকে গাছের পাতা আর ব্রাউন হতো না। কারণ আসল প্রাকৃতিক দৃশ্যে যে রঙ দেখা যায় কন্‌স্টেব্‌ল্‌ তাঁর ছবিতে সেই রঙ আনতে চেষ্টা করলেন। একথাটা শুনতে যত সহজ কাজে মোটেই তত সহজ নয়। বর্ষার দিনে পাঁশুটে আকাশও যতখানি উজ্জ্বল থাকে ছবিতে ধবধবে সাদাও অত উজ্জ্বল দেখায় না। আর যদি ছবির আকাশ কখনও সত্যিকারের আকাশের মত উজ্জ্বল হতে না পারে, তাহলে অন্যান্য সত্যিকারের স্বাভাবিক রঙের চেয়ে ছবির রঙ অনুজ্জ্বল করতেই হবে, যাতে আকাশ যথেষ্ট উজ্জ্বল দেখায়। কারণ ছবির অনুজ্জ্বল জায়গাগুলো যত বেশী অনুজ্জ্বল দেখাবে, ততই ছবির উজ্জ্বল জায়গাগুলো তাদের পাশে আরো উজ্জ্বল দেখাবে।

অন্ধকার ছবি হলেই যে ছবি অসুন্দর হবে তা নয়, কিন্তু তাতে ছবি ঠিক সত্যিকারের ল্যাণ্ডস্কেপের মত দেখায় না। কাজে কাজেই এমন যদি একটা উপায় বার করা যেতো যাতে ছবির রঙ খুব উজ্জ্বল দেখায় তাহলে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি সত্যিই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মত দেখাতো। আর কন্‌স্টেব্‌ল্‌ ঠিক তাই করলেন। কি করলে রঙ উজ্জ্বল

দেখায় তাই তিনি উদ্ভাবন করলেন। রঙ মোলায়েম করে না লাগিয়ে, মসৃণ, সমান, করে না দিয়ে তিনি তুলির ডগা করে মোটা রঙের ছোট ছোট চাপ ক্যান্‌ভাসে লাগাতে আরম্ভ করলেন, যাতে ছবিতে হাত দিলে ছবির গাটা খসখসে মনে হয়।

কন্‌স্টেব্‌ল্ আবিষ্কার করলেন যে, তিনি যদি ছোট ছোট রঙের চাপ বা ফুটকি ব্যবহার করেন তাহলে সমস্ত ছবিটা অনেক বেশী উজ্জ্বল দেখায়। তাঁর আগে, সবুজ মাঠ আঁকতে গেলে 'শিল্পী করতেন কি সমস্ত জায়গাটা সমানভাবে সবুজ রঙ মসৃণ করে বুলিয়ে দিতেন। কন্‌স্টেব্‌ল্ নতুন রীতি দেখালেন, তিনি সারা জমিটা আলাদা আলাদা ছোট ছোট সবুজ, হলদে আর নীল রঙের ফোঁটা দিয়ে ভরিয়ে দিলেন। আর অবাক কাণ্ড, তাতে যতক্ষণ না ছবির খুব কাছে ঘেঁসে গিয়ে দেখছো, ততক্ষণ মাঠটা খুবই সবুজ দেখাবে। খুব কাছে গেলে আলাদা আলাদা রঙের ফোঁটাগুলি নজরে পড়বে, কিন্তু একটু দূর থেকে সমস্ত মাঠটা একটা রঙ দেখাবে—সবুজ রঙ সমান, মসৃণভাবে বুলিয়ে দিলে যত না সবুজ দেখাবে এতে তার চেয়ে অনেক বেশী সবুজ দেখাবে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝলে কিনা জানি না, যদি একবার পড়ে না বুঝে থাকো তাহলে আরেকবার পড়ে দেখো। কারণ এ ব্যাপারটা বুঝলে চিত্রশিল্পে পরবর্তীকালে যে বিরাট পরিবর্তন এলো তার প্রথম দু-এক ধাপ বুঝতে পারবে।

কন্‌স্টেব্‌ল্ জন্মেছিলেন ১৭৭৬ সালে, মারা যান ১৮৩৭ সালে। কন্‌স্টেব্‌লের নাম আমরা স্মরণ করি ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকায় দুটি রীতির বিশেষ উন্নতিসাধনের জন্যে। প্রথমত তিনি গাছের পাতা ব্রাউন না এঁকে সবুজ আঁকেন। দ্বিতীয়ত তিনি সমান, মসৃণভাবে রঙ না দিয়ে, ছোট ছোট রঙের ফোঁটা দিয়ে দিয়ে ছবি আঁকা আরম্ভ করলেন।

অনেকের মতে ইংলণ্ডের সবচেয়ে ভাল চিত্রশিল্পী হচ্ছেন, ল্যাণ্ডস্কেপ-শিল্পী টার্নার—যোসেফ ম্যালর্ড বিলিয়ম টার্নার। তিনি অন্য সব শিল্পীর চেয়ে ছবিতে প্রকৃতির আলো আর রঙের ঔজ্জ্বল্য বেশী আনতে পেরেছিলেন। এই গুণে তাঁর ছবি খুবই সার্থক। সূর্য আর সমুদ্র আঁকতে খুব ভালবাসতেন। টার্নার জন্মান ১৭৭৫ সালে, মারা যান ১৮৫১ সালে।

সূর্য এত বেশী উজ্জ্বল যে মানুষের সৃষ্ট কোন রঙই তার মত উজ্জ্বল দেখাতে পারে না। সে চোখ-ধাঁধানো আলো কোন্ রঙ থেকে আসতে পারে বলো! কিন্তু শিল্পী একটা কাজ করতে পারে, সে এমন কিছু আঁকতে পারে যাতে লোকের সেটি সূর্য বলে ধারণা হয়। এ বিষয়ে ক্লোদ লরেন মাঝে মাঝে যা করতেন, টার্নার তাই করলেন। তিনি "সূর্যের মধ্যে" আঁকলেন, অর্থাৎ সূর্যকে ঠিক পিছনে রেখে দৃশ্যটি আঁকলেন। সাধারণত তিনি মেঘ বা কুয়াশার পিছনে সূর্যকে আঁকতেন, কিংবা সূর্যাস্ত, যাতে সূর্যের ঔজ্জ্বল্য তিমিত দেখায়, অর্থাৎ খানিকটা এই সময়ের আসল সূর্যের মত দেখায়। কোন শিল্পীই অবশ্য প্রকৃত সূর্যাস্তের উজ্জ্বল ছটা ছবিতে দেখাতে পারেন না, কিন্তু যাঁরা টার্নারের সূর্যাস্তের ছবি দেখেছেন তাঁরা বলেন যে সে-সব ছবি অবিশ্বাস্য রকম উজ্জ্বল। বিশ্বাস হবার কথা নয়। তার কারণ, অবশ্য, লোকে যা বলে—অর্থাৎ অসম্ভব রকম উজ্জ্বল--তা নয়। তার কারণ সেগুলি যথেষ্ট উজ্জ্বল নয়।

সমুদ্রের ছবিও টার্নার আগের সকলের চেয়ে ভাল আঁকলেন। টার্নার ল্যাণ্ডস্কেপ আর সামুদ্রিক দৃশ্য বা সীস্কেপ সমান ভাল আঁকতেন। আঁকার আগে, তিনি ভাল করে বহুদিন ধরে সমুদ্র দেখতেন—শান্ত অবস্থায়, ঝড়তুফানে, রোদে, জলে কি রকম দেখায়। একবার তিনি ঝড়ে জলে সমুদ্র দেখার লোভে জাহাজের মাস্তুলে নিজেকে শক্ত করে বাঁধিয়ে নিলেন, যাতে ঝড়ে জাহাজ থেকে ভেসে না যান।

টার্নারের একটি খুব বিখ্যাত ছবির নাম "দা ফাইটিং টেমেরেয়ার"। বিখ্যাত মানোয়ারী জাহাজ টেমেরেয়ারের নামে ছবিটির নাম হয়। টেমেরেয়ার একেবারে পুরানো হয়ে গেছে, আর সমুদ্রে চলে না, একটা ধোঁয়া-ছাড়া জাহাজ-টানা টাগ্ দিয়ে টেনে, তাকে ভেঙে ফেলার জন্য ডকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঠিক সূর্যাস্ত, বন্দরের জলে আকাশের গভীর, জমকালো, জাফ্রানি আর হল্‌দে রঙ পড়েছে। দিনের শেষ, আর সেই সঙ্গে যে জাহাজ তার দেশকে এতকাল এত নির্ভয়ে রক্ষা করেছে, তারও শেষ।

এই ছবির রঙ ছাড়া সাদা-কালো ছাপা আছে, এমনকি সেই ছাপাতেও জমকালো সূর্যাস্তের আমেজ পাওয়া যায়।

নবম অধ্যায়

উনিশ শতকের শিল্পীরা

কয়েকজন অতি-গরীব শিল্পী

উনিশ শতকে কয়েকজন শিল্পী অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় জন্মেও আশ্চর্য প্রতিভা দেখান। বাস্তবিক পক্ষে উনিশ শতকে যেকোন ক্ষেত্রেই অধিকাংশ প্রতিভাশালী লোকই অত্যন্ত সামান্য অবস্থার মধ্যে জন্মেছিলেন। প্রথমেই নাম করতে হয় ফরাসী শিল্পী কোরোর। জঁা-বাপ্তিস্ত-কোরো জন্মান ১৭৯৬ সালে। মারা যান ১৮৭৫ সালে। প্রথম প্রথম কেউ তাঁর ছবি কিনতো না বলে তাঁর খুব কষ্টে চলতো। পঞ্চাশ বছর বয়সের আগে তাঁর একটি ছবিও বিক্রি হয়নি। একেবারে সংসার চলতো না, তা অবশ্য নয়, কারণ তাঁর বাবা তাঁকে বছরে একটা ভাতা দিতেন। ভাতা খুবই কম, তবুও একেবারে উপোস করতে হতো না।

স্কুল শেষ করার পর কোরোর ইচ্ছে হলো ছবি আঁকতে শিখবেন। কিন্তু বাবার ছিলো কাপড়ের দোকান, সুতরাং কাপড়ের দোকানে ঢুকতে হলো। তবুও তিনি আশা ছাড়েন না, শেষে বাবা তাঁকে কাপড়ের দোকান থেকে ছাড়িয়ে ছবি আঁকা শিখতে পাঠালেন। কোরো ইতালিতে গেলেন, সেখানে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকা শিখলেন। সেখান থেকে ফ্রান্সে ফিরে এলেন। অনেক সুন্দর সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকলেন, কিন্তু কেউ কিনতে চায় না।

এই সময়ে অনেক গরীব শিল্পী প্যারিস ছেড়ে বার্বিজঁ'তে গিয়ে বাস করতেন, কারণ প্যারিসের চেয়ে বার্বিজঁ' অনেক সস্তা জায়গা ছিলো। আরও একটা কারণ, বার্বিজঁ'র প্রাকৃতিক দৃশ্য ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকার পক্ষে খুব ভাল। সেখানে তাঁরা বন, নদী, মাঠ ইচ্ছেমত দেখে আঁকতে পারতেন। তাই গরীব শিল্পীরা একে একে বার্বিজঁ'তে গিয়ে ছোট ছোট বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন, আর সেখানে ছবি আঁকতেন। আমরা তাঁদের বলি বার্বিজঁ শিল্পী।

কোরো বার্বিজঁ'তে চলে গেলেন। ভোরবেলা, যখন ঘাসে শিশির শুকোয়নি, আর সবই কুয়াশাচ্ছন্ন, তখন বেরিয়ে গিয়ে কোরো গাছ, মাঠ দেখতেন। দেখতে দেখতে স্কেচ করতেন বা তাড়াতাড়ি আঁকতেন, বাড়ী ফিরে রঙ করতেন। গোধূলির আলো, চাঁদের আলোও তাঁর খুব ভাল লাগতো, তাই তিনি গোধূলি বা চাঁদের আলোয় অনেক ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকেন। তাঁর ছবিতে বিশেষ এক স্বপ্নের, ইন্দ্রজালের মায়া আছে যা তাঁর একান্ত নিজস্ব, আর যার জন্যে তিনি জগদ্বিখ্যাত।

বুড়ো বয়সে কোরোর ছবি বিক্রি হতে লাগলো। টাকা, খ্যাতি সবই আসতে লাগলো। বন্ধুদের সাহায্য করতে কোরো সদাই প্রস্তুত, তাই যখন টাকা পেতে লাগলেন, তখন অধিকাংশ অর্থই বন্ধুদের দিয়ে দিতেন।

কোরো সদাপ্রফুল্ল, সদাহাস্যময় ছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের খুব ভাল-বাসতেন। কিন্তু তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপগুলি স্বপ্ন আর বিষাদে ভরা। সবাই তাঁকে ভালবাসতো, 'কোরো-বাবা' বলে ডাকতো। শেষ বয়সে যে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন তা শুনে ভাল লাগে।

আরেকজন বার্বিজঁ' শিল্পী কোরোর চেয়ে অনেক গরীব ছিলেন। স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে তিনি শিল্পীদের মধ্যে প্রায় সর্বপ্রথম বার্বিজঁ'এ গিয়ে বাস আরম্ভ করেন। থাকতেন তিনটি ঘরের একটি মাটির মেঝেওলা বাড়ীতে। পরে তিনিই হন ফ্রান্সের বিরাট শিল্পী; নাম জঁা ফ্রাঁসোয়া মীলে।

মীলে জন্মান ১৮১৪ সালে, মারা যান ১৮৭৫ সালে। বরাবরই গরীব ছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষক, ছেলেবয়সে মীলে বাবার ক্ষেতে কাজ করতেন। একদিন একটা পুরানো বাইব্‌লে কতগুলি ছবি দেখে তিনি আঁকতে আরম্ভ করেন। দুপুরবেলা কিষাণরা যখন একটু গড়িয়ে ঘুমিয়ে নিতো, মীলে তখন বসে বসে আঁকতেন। শেষে তাঁর আঁকার হাত দেখে, তাঁর গ্রামের লোকে চাঁদা করে তাঁকে প্যারিস পাঠালো ছবি আঁকা শিখতে।

প্যারিসে গিয়ে মীলে ভীষণ বিপদে পড়লেন। ভয়ানক লাজুক ছিলেন, লোকের সঙ্গে একেবারেই মিশতে পারতেন না, তাই চালাতেই পারলেন না। ছোট ছোট ছবি এঁকে সেগুলি বিক্রি করে কোন রকমে দিন গুজরান করতেন। গরীব কৃষকদের ছবি, যাদের জীবন

তিনি খুব ভাল জানতেন, আঁকতে খুব ভালবাসতেন। শেষকালে যখন দিন তাঁর প্রায় উপোসেই কাটছে তখন একজন তাঁর একখানা কৃষকের ছবি কিনলেন। সেই টাকায় মীলে কোনমতে প্যারিস ছেড়ে বার্বিজঁতে চলে গেলেন, আর সেখানে বাকি জীবনটা 'কাটালেন।

কর্মরত কৃষকদের ছবি মীলে এক অদ্ভুতভাবে আঁকতেন। ক্ষেতে চলে যেতেন, সেখানে লোকজন মাটি খুঁড়ছে, নিড়েন দিচ্ছে, সার ছিটোচ্ছে, কাঠ চিরছে, মাখন তুলছে, কাপড় কাচছে, বীজ বুনছে, এই সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। তারপর বাড়ী এসে যা দেখেছেন তাই আঁকতে বসতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিলো অসাধারণ। আঁকার সময়ে মড্‌ল্ লাগতো না। মাঠে যা দেখতেন বাড়ীতে এসে প্রত্যেকটি লোকের ভঙ্গী, চলন, গতি, যথাযথভাবে আঁকতেন। নেহাত যখন মড্‌ল্ দরকার হতো তখন স্ত্রীকে বলতেন সেই ভঙ্গীতে দাঁড়াতে।

মীলের একটি ছবির নাম 'দা সোয়ার'। একটি লোক বীজ বুনছে। কখনও মাঠে বীজ ছিটিয়ে বুনতে দেখেছো কি? আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় বীজ যে ছিটোয় সে এক অদ্ভুত ধরনে পায়ের উপর ভর দিয়ে দুলে দুলে চলে। পায়ের সঙ্গে হাত তাল রাখে। মাঝে মাঝে হাতটা কোমরের কাছে বাঁধা বীজের পুঁটলির মধ্যে চলে যায়, তারপর পিছন দিকে বীজ ছিটোবার জন্মে দুলে যায়, আর হাতের এক এক পাখসাটে এক পা এক পা করে চাষী মাঠে এগিয়ে চলে। মীলের ছবিতে বোঝা যায় যে চাষীটির খুব পরিশ্রম হয়েছে, কিন্তু তবুও হাত আর পা সমানে তালে তালে দুলে দুলে চলছে, যন্ত্রের মত, ক্লান্তিহীন। শুধু তার মাথার ভঙ্গী থেকে বোঝা যায় সে কত ক্লান্ত।

বীজ বোনার ছবি মীলে একাধিক আঁকেন। সবগুলি প্রায় এক-রকম দেখতে।

বীজ বোনার ছবির মতই বিখ্যাত আরেকটি ছবি আছে তার নাম 'গ্লীনারস্'। মাঠ থেকে ফসল কেটে নিয়ে যাবার পর মাঠে সামান্য যা পড়ে থাকে বা আকাটা থাকে সেগুলি যে তুলে তুলে ঘরে নিয়ে যায়, তাকে ইংরেজীতে বলে গ্লীনার। যে দেশে খুব গরীব লোকের বাস, সেখানে এই ধরনের ধানের-শিষ-কুড়োনো লোকও থাকে, কারণ এক-আধ সেরও যদি কুড়োতে পারে তাও লাভ। মীলের সময়ে বার্বিজঁ' এত গরীব দেশ ছিলো যে এই ধরনের লোক মাঠে প্রায়ই দেখা যেতো।

মীলের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে এ কত হাড়ভাঙা নিতান্ত সর্ব-হারার কাজ! আর এ কাজ সব দেশেই করে, পুরুষেরা নয়, মেয়েরা।

মীলের আরেকটি ছবি খুবই বিখ্যাত, এর সস্তা, দামী, নানারকম ছবির কপি বাজারে পাওয়া যায়। তার নাম 'এঞ্জেলাস'। একটি ফরাসী চাষী আর তার বৌ সন্ধ্যাবেলা চাষের কাজ ফেলে হঠাৎ প্রার্থনা করতে দাঁড়িয়ে গেছে গ্রামের গির্জার ঘণ্টায় সন্ধ্যাবেলার 'এঞ্জেলাস্' বাজানো শুনে। খানিকটা আমাদের দেশের মুসলমানদের 'নামাজ' পড়ার মত।

কোরোর মত মীলেরও ঠিক মৃত্যুর আগে হঠাৎ অত্যন্ত সুনাম হলো। কিন্তু টাকার অভাব মিটলো না। মীলে মারা যাবার পর তাঁর বন্ধু কোরো মীলের বিধবাকে বরাবর ভাতা দিয়ে যেতেন।

বার্বিজঁর আরো অনেক শিল্পী পরে বিখ্যাত হন। তাঁরা সবাই মাঝে মাঝে একটা বড় গোলাঘরে নিজের নিজের ছবি নিয়ে জমায়েত হয়ে গোলাঘরের দেয়ালে সেগুলি টাঙিয়ে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, অন্যান্য বাদানুবাদ চলতো। তারপর যে যার বাড়ী ফিরে যেতেন, দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করে আরও ছবি আঁকতে। এঁদের অনেকের কথাই বলতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বই ক্রমশ লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

আর কোন শিল্পীর সম্বন্ধে বলার জায়গা নেই, কিন্তু একজনের কথা না বললেই নয়। তাঁর নাম ওনোরে দ্যমিয়ে।

দ্যমিয়ে ১৮০৮ সালে খুব গরীব পরিবারে জন্মান। বাবা জানালার শার্সি লাগাতেন। ছোটবেলায় প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মানুষ, শেষে লুভরে গিয়ে রেমব্রাণ্টের ছবি দেখে আঁকতে আরম্ভ করেন। রেমব্রাণ্ট দেখার পর মিকেলাঞ্জেলোর ভাস্কর্য আর অন্যান্য ইতালিয়ান শিল্পীদের ছবি দেখেন। চারপাশের লোক দেখে দেখে কখনও মাটিতে কখনও মোমে পুতুল গড়তে আরম্ভ করেন। একুশ বছরে তিনি কতগুলি রেখাচিত্র লিথো করে ছাপান, সে রকম জোরালো ড্রয়িং ফ্রান্সে আগে কখনও দেখা যায়নি।

লিথোগ্রাফ কাকে বলে এক কথায় বলি। ১৭৯৮ সালে প্রথম লিথোগ্রাফ আবিষ্কার হয়। তেলে জলে বা চর্বিতে জলে মেশানো, দুটি জিনিসের এই বিরোধের ভিত্তিতে লিথোগ্রাফের সৃষ্টি। একটা মসৃণ পাথরে অথবা দস্তা কিংবা অ্যালুমিনিয়মের পাতে তেলতেলে বা

চর্বি মেশানো কালি দিয়ে ছবিটি আঁকতে হয়। তারপর সবটা জলে ভেজাতে হয়। জলে ভেজানোর পর কালি লাগানো রোলার তার উপর চালিয়ে দিলে কালিটা চর্বি মেশানো কালি দিয়ে আঁকা ছবির রেখায় রেখায় লেগে থাকে, বাকিটা জলে ধুয়ে যায়। তখন পাতটা কাগজের উপর ছাপলেই লিথোগ্রাফ হয়ে গেলো।

ত্যমিয়ের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। কখনও মড্‌ল্ দেখে আঁকতেন না। খানিকটা মীলের মত। রাস্তায় লোকজন দেখে বাড়ীতে এসে কাদা দিয়ে তাদের পুতুল বা মড্‌ল্ করতেন। আর সেই মড্‌ল্ বা পুতুল থেকে লিথোগ্রাফ করতেন। তাঁর মত নক্সাবিদ বা ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান খুব কমই আছে। মানুষের অতর্কিত অবস্থায় মুখের যে ভাব হয় ত্যমিয়ে তাই আঁকায় ছিলেন অদ্বিতীয়। একুশ বছর বয়সে তিনি 'ক্যারিক্যাটিওর' বলে একটি কাগজে ব্যঙ্গচিত্র আঁকা আরম্ভ করেন। একবার রাজা লুই ফিলিপকে দেখালেন, গরীব লোকের কাছ থেকে অপহৃত ধনের বড় বড় থলি গপ্‌গপ্‌ করে খাচ্ছেন। ত্যমিয়ের জেল হয়ে গেলো। কাগজ বন্ধ হয়ে গেলো। আবার আরেকটা কাগজ বেরুলো। বিখ্যাত লেখক ব্যালজাক বললেন, 'ত্যমিয়ে'র মধ্যে মিকেলাঞ্জেলোর গুণ আছে।'

চল্লিশ বছর বয়সে ত্যমিয়ে তেলরঙে ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। ছবি দেখে শিল্পীদের তাক লেগে গেলো, কিন্তু বেশী দামে বিক্রী হলো না। 'দা গুড সামারিটান' বলে একটা বিখ্যাত ছবি আঁকলেন। কিন্তু তার প্রশংসা হলো না। আবার লিথোগ্রাফে মন দিলেন। এক এক দিন আটটা করে লিথোও এঁকেছেন, এই আশায় যে টাকা জমিয়ে তেল-রঙের ছবি আঁকায় মন দেবেন। কিন্তু টাকা জমলো না। পাঁচতলার চিলে কুঠ্‌রীতে কাজ করে করে চোখের দৃষ্টি প্রায় চলে গেলো, তবু ঘরে দুটো চেয়ার, টেবিলও হলো না। বন্ধুদের খুব কষ্ট হতো, তাঁদের মধ্যে অনেকের ছবি খুব দামে বিক্রী হতো, কিন্তু ত্যমিয়ের দুঃখ ছিলো না, তিনি বলতেন, 'টাকা না হোক, আমার আছে জনসাধারণ'। সত্যিই প্যারিসের জনসাধারণ তাঁর ছবি দেখার জন্যে পাগল হয়ে যেতো। বুড়োবয়সে ত্যমিয়ের খুব কষ্টে কেটেছে, দেখতে পেতেন না ভাল, খাটতেও খুব পারতেন না, অর্থ তো ছিলোই না। শেষ বয়সে কোরোর দেওয়া মফস্বলে একটি ছোট বাড়ীতে থাকতেন। বন্ধু-

বান্ধব মিলে তাঁকে রাজসম্মান, লিজন অফ অনার, দেওয়ালেন, তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। ১৮৭৮ সালে ভিক্তর হুগো তাঁর শিল্পের একটা প্রদর্শনী করলেন, কিন্তু প্রদর্শনীর খরচও উঠলো না। ১৮৭৯ সালে দ্যমিয়ে মারা গেলেন। মারা যাবার সময়ে তিনি অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, নির্বান্ধব, একা। কবর দেবার পয়সা নেই। সরকার থেকে কবর দেওয়া হয়।

দ্যমিয়ের ছবির এক নিজস্ব জাত আছে; তা অতুলনীয়। তাঁর রেখাচিত্র মানুষের রক্তমাংসের মত ভারী, নিটোল, গম্ভীরতাপূর্ণ। সমস্ত ওজন নিয়ে যেন রয়েছে। নিঃস্ব, সর্বহারা, বঞ্চিত মানুষের ছবি দ্যমিয়ের মত কেউ এঁকেছে কিনা সন্দেহ। ফরাসী শিল্পীদের মানবিকতার মধ্যেও তিনি একান্ত জনসাধারণের, আধুনিক যুগের দুঃখ-কষ্টের তিনি দ্রষ্টা; তাঁর ছবি দেখলেই মনে হয়, 'ইনি তো আমাদের একজন'।

সর্বপ্রধান লোক

এখন তোমাদের চোখ দুটি আমি রুমাল দিয়ে বেঁধে দেবো। বেঁধে দিয়ে ছবির দিকে তাকাতে বলবো না অবশ্য। চোখ বেঁধে গান শুনতে পারো, কিন্তু ছবি দেখা সম্ভব নয়। তবুও ধরা যাক তোমার চোখ সত্যিই বেঁধে দিয়েছি। বেঁধে দিয়ে তোমাকে ভোরবেলা একটা মাঠে নিয়ে গেলুম। সেখানে গিয়ে একটা খড়ের পালুইএর সমুখে তোমার চোখ খুলে দিয়ে বললুম, পাঁচ মিনিট ধরে এই খড়ের পালুইটা দেখো। তার পর আবার তোমার দুচোখ বেঁধে দিয়ে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম। মজার খেলা, নয়? খানিকটা কানামাছির মত।

আরেকবার এই খেলাটা খেলা যাক। প্রথমবার যখন তোমাকে খড়ের পালুইএর কাছে নিয়ে গিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্যে চোখ খুলে দিয়েছিলুম, তখন ধরো সকাল সাতটা। এইবার বিকেল পাঁচটার সময়ে আবার ঐ রকম ভাবে তোমাকে নিয়ে গিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্যে সেই খড়ের পালুইটা দেখাবো।

ব্যাপারটা কি হবে আন্দাজ করতে পারো? বেলা পাঁচটার সময়ে

খড়ের পালুইটা, সকাল সাতটার সময়ে যে রকম দেখিয়েছিলো, মোটেই সেই রকম দেখাবে না, অন্য রকম দেখাবে। আকার একই আছে, কিন্তু রঙ, আলো, ছায়া মিলিয়ে তোমার চোখে পালুইটার ছবি পাঁচটার সময়ে যে রকম দেখাবে, সেটা সাতটার সময়কার ছবির থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ। দিনের বেলা অল্প কিছুক্ষণ অন্তরই আলো বা রোদের সঙ্গে সঙ্গে পালুইটার ছবিও রঙের দিক থেকে, আলোর দিক থেকে বদলে যায়। সেইজন্য তোমাকে নিয়ে গিয়ে শুধু পাঁচ মিনিট ধরে দেখার কথা বলছিলুম—কারণ মাত্র পাঁচ মিনিটে আলো এমন বদলাবে না যাতে তোমার চোখে ঐ সময়ের মধ্যে দুটো ছবি আসে।

এখন আমি যদি বলি যে যদি কোন শিল্পী খড়ের পালুইটার ছবি ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন করে আঁকে তাহলে যতগুলি ছবি হবে তার প্রত্যেকটিই হবে একটা থেকে আরেকটা তফাৎ, তাহলে বোধহয় আমার কথাটা বিশ্বাস করবে।

ঠিক এই কাজটি মাত্র কিছু বছর আগে কয়েকজন ফরাসী শিল্পী করেছিলেন। এইভাবে ছবি এঁকে তাঁরা প্রথম ১৮৭৪ সালে একটি প্রদর্শনী করেন। একটা বড় ঘরের দেয়ালে তাঁরা নিজের নিজের ছবি টাঙালেন, যাতে লোকে এসে দেখে। দর্শকরা এসে দেখে এতদিন যেসব ছবি তারা দেখেছে এদের ছবি সেসব থেকে সম্পূর্ণ তফাৎ। এসব ছবি যেন একঝলকে দেখা খড়ের পালুইএর ছবির মত। যে দৃশ্য শিল্পী আঁকছেন তা যেন তিনি এক ঝলকে দেখে নিয়ে রঙ, আলো, ছায়া যেমনটি দেখেছেন তেমনটিই এঁকে বসিয়ে দিতে চান। এই একঝলকে দেখাকে বলা যায় চোখের ছাপ, ইংরেজিতে ইম্‌প্রেশন্। তাই এই সব শিল্পীদের নাম হয়ে গেলো ইম্‌প্রেশনিস্ট্‌স্।

আগেকার শিল্পীরা কখনও এধরনের ছবি আঁকার কথা কল্পনা করেননি। তাঁরা ছবিতে ঘোড়া আঁকতেন এক রঙে, খড়ের পালুই আঁকতেন আরেক রঙে, তা স্বাভাবিক আলোয় ঘোড়ার গায়ের রঙ বা খড়ের পালুইএর রঙ সবসময়ে একই রকম হোক, চাই নাই হোক। প্রকৃতপক্ষে কালো ঘোড়া বা হলদে পালুই সবসময়ে কালো বা হলদে দেখায় না। যখন যেমন ভাবে আলো পড়ে তার উপরে তার রঙ নির্ভর করে, সেই মত বদলায়। কালো ঘোড়ার উপর আলো চকচক করে পড়লে ঘোড়ার গা জায়গায় জায়গায় নীল দেখাতে পারে। কিন্তু

আমরা এত স্বতঃসিদ্ধভাবে জানি যে ঘোড়া দেখতে নীল হয় না, যে আমরা চোখ চেয়ে একবারও দেখি না যে এক এক সময়ে একভাবে আলো পড়লে ঘোড়া সত্যিই নীল দেখায়।

শিল্পীরা আগে ছায়াকে সবসময়ে ব্রাউন, বা ছাই রঙ, বা কালো আঁকতেন। কিন্তু কোন সময়ে সত্যিকারের ছায়াকে যদি ভাল করে দেখো তাহলে দেখবে সব সময়েই যে তা ব্রাউন বা ছাইরঙ বা কালো তা নয়। সবুজ, নীল, বেগ্‌নেটে লাল, বা অন্য রঙও হয়।

অবশ্য খোলামাঠে কোন জিনিস যে রকম উজ্জ্বল আর রঙীন দেখায়, সেরকম উজ্জ্বল আর রঙীন ছবিতে হওয়া অসম্ভব, কারণ ছবিতে যে রঙ ব্যবহার হয় তা প্রকৃতির স্বাভাবিক রঙের মত উজ্জ্বল হতেই পারে না। তবে কন্‌স্টেব্‌লের কথা আলোচনার সময়ে যা বলেছি তা যদি তোমাদের মনে থাকে তা হলে বুঝতে পারবে ইম্‌প্রেশনিস্টরা কি করে ছবির রঙ উজ্জ্বল দেখাতেন, কি করে সূর্যের আলো ছবিতে খানিকটা আনতে পারতেন। ছোট ছোট ফুটকি, ছোট ছোট আঁচড়ে তাঁরা রঙ দিতেন, চাপ চাপ করে। সমান মসৃণভাবে একটি রঙ মাখিয়ে দেয়ার চেয়ে এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ছোট ছোট ফুটকি আর আঁচড় দিয়ে ভরিয়ে রঙ দিলে ছবি অনেক উজ্জ্বল দেখায়। এমন ঝিকমিক করে মনে হয় যেন সত্যিকারের সূর্যের আলো পড়েছে। কিন্তু এভাবে ছবি আঁকলে বা রঙ দিলে ছবি আগেকার কালের ছবি থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে যায়, অর্থাৎ চিত্রশিল্পের ধারাই যেন বদলে যায়।

এই কারণে ফরাসী ইম্প্রেশনিস্ট্‌দের এই প্রদর্শনী লোকের কাছে এতই নতুন লাগলো যে কেউ বিশেষ খুশী হলো না। লোকে এক পদ্ধতিতে আঁকা ছবি এতকাল দেখে এসেছে ; তার জায়গায় নতুন রীতিটা এতই নতুন, পরিবর্তনটা এত বেশী, চোখ নতুন রীতিতে এত অনভ্যস্ত, যে পুরানো রীতিতে আঁকা ছবি দেখে অভ্যস্ত চোখে নতুন রীতি ভালো লাগা দুঃসাধ্য হলো।

কিন্তু আস্তে আস্তে চোখ অভ্যস্ত হলো, লোকে শ্লেষ উপহাস ছেড়ে সত্যি করে বোঝবার চেষ্টা করলো, ফলে ইম্‌প্রেশনিস্টদের গালাগাল দেয়া কমে গেলো। লোকে বুঝলো যে ইম্‌প্রেশনিস্টরা এক নতুন ধরনে ছবি আঁকার চেষ্টা করছেন, এর পিছনে সত্যিই

নতুন এক দর্শন আছে, আর তাঁদের চেষ্টার মধ্যে শাশ্বত গুণ থাকতেও পারে। এঁদের মধ্যে একজন, নাম ক্লোদ মনে, করতেন কি রোজ সকালবেলা একগাড়ী সাদা ক্যানভাস নিয়ে যেতেন, আর সারাদিন বসে বসে সেগুলিতে একই দৃশ্য আঁকতেন। প্রত্যেকবার আলো বদলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে যা আঁকছেন তার রঙ, আলো, ছায়া, সঙ্গে সঙ্গে আকারও, বদ্‌লে যাচ্ছে, আর তিনি একটি করে নতুন ক্যান্‌ভাস আঁকছেন। মনে জন্মান ১৮৪০ সালে, মারা যান ১৯২৬ সালে। তাঁকে ইম্‌প্রেশনিস্ট স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। সেসময়ে দেগা, মানে, সেজান, রেনোয়ার, সিস্‌লি ছিলেন তাঁর সতীর্থ। লোকে তাঁদের বলতো 'মুক্ত হাওয়ার শিল্পী', যাঁরা ঘরের বাইরে মাঠে গিয়ে ছবি আঁকেন, অর্থাৎ যাঁরা প্রাকৃতিক দৃশ্যে আলোর খেলা আঁকতে ব্যস্ত।

যেমন, মনে একবার একটা খড়ের পালুইএর পনেরোটা ছবি আঁকেন, প্রত্যেকটাতেই রঙ আর আলোর খেলা আলাদা। একই ফরাসী ক্যাথিড্রালের সমুখটার ছবি তিনি আঁকেন বিশখানা, দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলোয়। বিশখানা ছবিই হলো বিশরকম। একসঙ্গে বিশখানা ছবি সাজালে শিল্পী কি করতে চেয়েছেন চমৎকার বোঝা যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে কোন একখানা ছবি নিয়ে যদি খুঁটিয়ে দেখতে বসো তাহলে হয়তো একটু হতাশ হবে, কারণ তার আঁকার মধ্যে রেখার, গড়নের বা আকারের খুব বাহাদুরি বা পারিপাট্য তেমন নেই। কারণ মনে'র আগ্রহ বা উৎসাহ ছিলো রঙ আর আলো নিয়ে, গড়ন বা আকারে ততটা নয়।

মনে'র মত আরেকজন ইম্‌প্রেশনিস্ট ছিলেন, তাঁর নাম মনে'র সঙ্গে মাঝে মাঝে গোলমাল হয়ে যায়। তিনি মানে। সত্যি বলতে মানে'ই ইম্‌প্রেশনিস্‌ম্ শুরু করেন। এদুয়ার মানে জন্মান ১৮৩২ সালে, মারা যান ১৮৮৩ সালে। মনে'র মত মানে জ্বলজ্বলে রঙের বিন্দু বা ফুটকি দিয়ে ছবি গড়ে তুলতেন না। তবে তাঁর জীবনের শেষের বছর দশেক তিনি মনে'র মত মোটা মোটা রঙের ফোঁটা দিয়ে আঁকতে আরম্ভ করেন। গল্প আছে, মানেকে জিগ্‌গেস করা হয় তাঁর ইম্‌প্রেশনিস্ট ছবিতে সর্বপ্রধান লোক কে?

মানে উত্তর দেন, 'ছবিতে সর্বপ্রধান লোক হচ্ছে আলো।'

ইম্‌প্রেশনিস্টরা ছবিতে আলো ফুটিয়ে তোলার দিকেই মন দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী।

মানের একটি বিখ্যাত ছবি আছে 'ল বার ও ফোলি-বের্জের' ফোলি-বের্জেরে একটি মদ খাবার দোকান, টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে মদ ঢেলে বিক্রী করছে। ছবিটি জগদ্বিখ্যাত। চারদিকে খুব লোকের ভীড়, ফুর্তির আবহাওয়া। লোকজন ভীড়ে জমজমাট; তোমাদের ছবিটি বেশ ভাল লাগবে, কারণ "আলো সর্বপ্রধান লোক" হলেও ছবিতে লোকজন দেখতে বোধ হয় ভাল লাগে বেশী।

মনে'র কথা বলার সময়ে দেগার নাম করেছি, মনে আছে বোধ হয়। এদ্‌গার দেগা জন্মান ১৮৩৪ সালে, মারা যান ১৯১৭ সালে।

বড় হয়ে যখন খুব বেশী করে ইম্‌প্রেশনিস্ট ছবি দেখবে, আর তার সঙ্গে যদি চীন জাপানের ছবিও দেখার সমান সুযোগ পাও, তাহলে চীনে আর জাপানী ছাপা ছবির সঙ্গে ইম্‌প্রেশনিস্ট ছবির আশ্চর্য মিল বার করতে তোমাদের বেশী দেরি লাগবে না। স্থানাভাবে এ সম্বন্ধে দু-এক কথার বেশী বলা যাবে না। ১৮৫০ সালের পরে হঠাৎ ইওরোপ চীন আর জাপানের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে জানতে পারে। এই ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহ, উদ্যোগ ছিলো, ফরাসী জার্মান, ডাচ, আর রাশিয়ানদের। প্রথমে লোকের নজর পড়ে চীনে আর জাপানী পোর্সিলেনের নক্সার উপর, তার থেকে হঠাৎ শুরু হয় যেখানে যত ভাল কাগজ বা সিল্কের উপর ছাপা বা আঁকা চীনে, জাপানী ছবি আছে তার সংগ্রহ। ইওরোপের শিল্পীরা, বিশেষ করে ফ্রান্স আর প্যারিসের, যেন দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসা লোকের মত এইসব ছবির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চীনে ছবির আলো, রঙ, রেখার স্বল্পতা, একটি বিশেষ মুহূর্তের কল্পনা এক নতুন জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের চেতনা দৃঢ় করে, এবং সেই চেতনার যে মূল্য আছে সে সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্বাসও এনে দেয়। জাপানী ছবির রঙ, একই ফুজিয়ামার অজস্র ছবি, তাঁদের সেই চেতনা আর বিশ্বাস পাকা করে। সেই চেতনা আর বিশ্বাস হচ্ছে ইম্‌প্রেশনিজমের মূল কথা, যে এক মুহূর্তে দেখা রঙ, আলো, ছায়া, আকার, গড়নের ছবিতেও শাশ্বত রূপ ফুটিয়ে তোলা যায়। দেগার ছবিতে জাপানী প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। তিনি আঁকলেন সাধারণ দৈনন্দিন কাজে রত সাধারণ লোকের অতর্কিতভাবে দেখা ছবি, এসব

দেখাকে তিনি বলতেন 'ঘরের দরজায় তালার ফুটোর মধ্যে দিয়ে ঘর দেখা'। ঘর যদি বন্ধ থাকে তাহলে লোকে আপন মনে নিশ্চিন্তভাবে, কেউ দেখছে না মনে ক'রে, যেমন কাজ করে, এবং সেই দৃশ্য বাইরে থেকে দরজার ফুটো দিয়ে কেউ যদি দেখে, তাহলে সে যেমন ঘরের মধ্যে একান্ত নিভৃত চলাফেরা দেখবে, দেগা সেইভাবে দেখে ছবি আঁকা পছন্দ করতেন। যেমন, নাচুনী মেয়েরা প্র্যাক্‌টিস্ করছে, ধোবানী ইস্ত্রি করছে, মেয়েরা গা ধুচ্ছে, রেসের মাঠে জকীরা ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে। সুন্দরী মেয়ের ছবি আঁকতেন না, পাছে দর্শকের চোখে ছবির গুণাগুণ থেকে সুন্দরী মেয়ের মুখের দিকে চলে যায়। ছবিতে এত গতি, এত কর্মব্যস্ততা যে দেখে মনে হয় দেগা যেন খুব তাড়াতাড়ি আঁকতেন। আসলে তিনি আঁকতেন খুব ধীরে ধীরে, নক্সাবিদ বলে তাঁর খ্যাতি খুব বেশী, আর ধীরে ধীরে না আঁকলে ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান হওয়া যায় না। দেগা প্রায়ই প্যাস্টেল রঙ ব্যবহার করতেন। প্যাস্টেল হচ্ছে শুক্‌নো রঙ, নানারঙের গুড়ো গঁদের জল মিশিয়ে তাল করে শুকোনো—রঙীন পেন্সিল বা ক্রেয়ন হিসেবে বিক্রি হয়। প্যাস্টেল পছন্দ করতেন বলে তেলরঙ, জলরঙ, টেম্পেরা বা ফ্রেস্কো করতেন কম। প্যাস্টেল শুকনো রঙ, কোন জলীয় বা তরল পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করে না, সোজাসুজি কাগজে বা ক্যানভাসে শুকনোই ব্যবহার হয়। তার ফলে তরল জিনিসের সঙ্গে রঙ মেশালেই যেমন রঙের তেজ বা ধার কমে যায়, একটু ম্যাড়মেড়ে হয়ে যায়, প্যাস্টেলে তা হবার আশঙ্কা নেই, তৈরি ছবির রঙ, আঁকার সময়ে রঙ যেমন উজ্জ্বল থাকে, তেমনি তীব্র উজ্জ্বল থাকে। দেগার প্যাস্টেলে আঁকা ছবি জ্বলজ্বল, ঝকমক করে, ঠিক যেন দামী স্যাটিন। রঙের এই বাহাদুরির জন্যেই বিশেষ করে আমরা দেগাকে ইম্‌প্রেশনিস্ট বলি।

পিয়ের-অগুস্ত রেনোয়ারের সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা দরকার। রেনোয়ার জন্মান ১৮৪১ সালে, মারা যান ১৯২০ সালে। ইম্‌প্রেশনিজমের তিনি ছিলেন একজন দিকপাল, কিন্তু রঙের ছোট ছোট ফুটকি আর আঁচড় ছেড়ে দিয়ে, একসঙ্গে তুলির শত শত টানে রঙের জাল বোনার দিকে তিনি বেশী মন দেন। লোকে বলে প্রাণের প্রাচুর্য আর ঐশ্বর্য, জীবনের প্রতি, রক্তমাংস, মাটির প্রতি টান

রেনোয়ারের ছবিতে যেন উপচে পড়েছে। শেষ বয়সে হাতে পক্ষাঘাতের মত হওয়াতে তিনি ফিতে দিয়ে হাতে তুলি বাঁধিয়ে ছবি আঁকতেন। মানুষের, বিশেষত স্ত্রীলোকের, ত্বক বা চামড়া আর তার রঙ আঁকতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

ইম্‌প্রেশনিজমের পরে : পোস্ট ইম্‌প্রেশনিজম্

এঁদের ঠিক অব্যবহিত পরে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেও বলা যায়, যে যুগটি এলো তাকে বলা হয় পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিজমের যুগ। পোস্ট মানে গোল-পোস্ট অথবা পোস্ট-অফিসের ব্যাপার কিছু নয়, ল্যাটিন ভাষায় পোস্ট মানে পরে। সোজা কথায় ইম্‌প্রেশনিজমের পরে, অর্থাৎ ইম্‌প্রেশনিস্ট ছবি আঁকার ঠিক পরে চিত্রকলার যে যুগ বা রীতি এলো তাকে বলা হয় পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিজম্। ইম্‌প্রেশনিজমের আরম্ভ প্রায় মনে'কে দিয়ে, মনে আছে বোধ হয় যিনি বলেছিলেন, আলোই হচ্ছে ছবিতে সর্বপ্রধান ব্যক্তি!

পল্ সেজান্ পোস্ট-ইম্‌প্রেশনিজমের জনক। এই অধ্যায়ে যাঁদের কথাই পড়বে, তাঁরা সকলেই ফরাসী, উনিশ শতক ফরাসী শিল্পীর যুগ বললে কিছু ভুল বলা হয় না। মনে, মানে, দেগা, রেনোয়ারের বন্ধু সেজান প্রথমে ইম্‌প্রেশনিস্ট হিসেবে আরম্ভ করেন। জন্ম রোন নদীর ধারে এক্সে ১৮৩৯ সালে, সেখানেই মারা যান ১৯০৬ সালে। ১৮৭৪ সালে প্যারিসে যখন প্রথম ইম্‌প্রেশনিস্ট প্রদর্শনী হলো তখন সবচেয়ে বেশী বিদ্রূপ আর গালাগাল জুটলো সেজানের কপালে। সমালোচকরা বললো, মনে, মানে, রেনোয়ার দেখে ত স্পষ্ট বোঝা যায় যে বেচারীরা ভাল শিল্পী ছিলো কিন্তু নেহাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু এই সেজান্‌টা কে? এ যে তুলি ধরতে জানে না, একেবারে আহাম্মক, গাধার সেরা গাধা, লেজ দিয়ে এঁকেছে! সেই যে সেজান রাগে ক্ষোভে এক্সে ফিরে গেলেন, আর পারত পক্ষে অনেকদিন প্যারিসে আসেননি।

যখন প্রথম প্যারিসে বাইশ বছর বয়সে সেজান এলেন তখন দেখেই মনে হতো গাঁয়ের ছেলে, কথায় বেশ গেঁয়ো টান, খিটখিটে স্বভাব,

ব্যবহার কায়দাদুরস্ত নয়। তার উপরে বেজায় লাজুক; লোকে কিন্তু দেখে মনে করতো দাম্ভিক। একটা সুবিধা ছিলো, বাবার কিছু পয়সা ছিলো, বরাবর সেজানকে তিনি সাহায্য করে যান। দশ বছর কাজ শেখার পরেও তিনি একাই নিজের মনে ছবি এঁকে চললেন, মনে নিজের প্রতি ভীষণ অসন্তোষ। নিজের ছবি যাচাইএর জন্যে একাডেমির সালঁ'তে পাঠালেন। সালঁ'র কর্তৃপক্ষ ছবি নিলোই না। সেজান রেগেই খুন, তাঁর ছবি নেয়নি বলে নয়, অন্যের ছবি যা নেয়া হয়েছে, সেগুলি অত বিশ্রী বলে। স্ত্রীলোককে বড় ভয়। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিলো, যে সব মেয়েই ওৎ পেতে বসে আছে, ওঁকে ধরবে। 'ওদের কেবল আমাকে গাঁথবার চেষ্টা, বুঝেছো', বন্ধুদের বলতেন; বন্ধুরা বুঝতো কিনা জানি না। শিল্পীদের ছবির এক প্রধান বিষয়, নগ্ন স্ত্রীলোক। কিন্তু যাঁর স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই এত ভয়, তিনি আবার নগ্ন স্ত্রীলোক সমুখে বসিয়ে আঁকবেন কি? ফলে নগ্ন স্ত্রীলোক সেজানের ভালমত কখনও আঁকাই হলো না। যা দু-একটা এঁকেছেন তা স্মৃতি-শক্তির উপরে নির্ভর করে। ফলে সেগুলি হয়েছে সেজানের স্বভাবসিদ্ধ জ্যামিতির চূড়ান্ত। শেষে দেশেরই একটি বোকাসোকা ভালমানুষ দেখে মহিলাকে বিয়ে করলেন। সেজানকে বিয়ে করার জন্যে তাঁকে কম ভুগতে হয়নি, চিরটা কাল কাঠের পুতুলের মত, নড়াচড়া নেই, চুপ করে নড়্‌বড়ে চৌকির উপরে বিপজ্জনক করে রাখা চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসেই জীবনটা কাটাতে হয়েছে। কারণ? না, তিনি সেজানের মড্‌ল্‌। সেজান এত আস্তে কাজ করতেন যে অন্য কোন স্ত্রীলোক হলে বোধ হয় পাগল হয়ে যেতো।

১৮৭৪ সালের কিছুদিন পরেই সেজান ইম্‌প্রেশনিস্ট রীতিতে আঁকা ছেড়ে দিলেন। বললেন ইম্‌প্রেশনিজমের চেয়ে আরও গভীর, আরো শাশ্বত, আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু আঁকতে হবে, আগেকার কালের মহান শিল্পীদের মত। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর ছবির গড়ন বদলে গেলো, ছবির মধ্যে অপূর্ব গভীরত্ব, নিটোল ভাব এলো। কি করে এলো একটু বলা দরকার।

সেজান বললেন, ইম্‌প্রেশনিস্টরা ছবির পোশাকী দিকটা অর্থাৎ বাহ্যাড়ম্বরের উপর বড় বেশী নজর দিচ্ছেন, ছবির গভীরত্ব, ওজন, অস্থিমজ্জা বা কঙ্কালের কথা ভাবছেন না। কঙ্কাল, অস্থিমজ্জার কথা

যদি মনে না থাকে তাহলে শুধু চামড়ার উপর রঙ মাখিয়ে কি হবে? সে শুধু শূন্যতা ঢাকার চেষ্টা বই তো নয়? সেজানের একথা মনে রেখে যদি তাঁর ছবি দেখি তাহলে মনে হবে যে সত্যিই তাঁর ছবির জমির তলায় যেন অনেক কিছু আছে, এবং সেটাই আসল (যদিও অবশ্য ছবির জমির তলায় আমরা সত্যিই কিছু দেখতে পাই না)। সেজানের যে কোন ল্যাণ্ডস্কেপ দেখলে মনে হবে যেন ছবির গাছপালা, ঘাসের তলায় তিনি পৃথিবীর বুকের নিচের পাথরও এঁকেছেন, ছবির রঙের উপরের পর্দাটা তুললেই যা দেখা যাবে। সেজানের যেকোন পোর্ট্রেট দেখলেও তেমনি মনে হবে, মুখের চামড়ার তলায় আছে রক্তমাংস, তার তলায় হাড়ের শক্ত খুলি। সেজানের যে কোন স্টিল-লাইফ দেখলে মনে হবে যেন আপেল ফলগুলি মাটির রসে অসম্ভব ভারী, পৃথিবীর গুণ যেন তার মধ্যে। এইসবের জন্যে তাঁর ছবিতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা তিনটি গুণই এসেছে, যেটা সেজানের একান্ত নিজস্ব। তাঁর ছবি শুধু সমান, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে সম্পূর্ণ, ক্যান্‌ভাসের জমি নয়। আস্তে আস্তে রঙের পর রঙ মিলিয়ে একের পর এক সমতল বা স্তর বা প্লেন তাঁর ছবিতে পিছিয়ে পিছিয়ে গেছে (মনে হয় যেন ধাপে ধাপে নানা আকারের নানা গড়নের, নানা রঙের, রঙের চাপ ছবির পিছন দিকে চলে গেছে)। ছবির পরস্পেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষিত থেকে এ রীতি তফাৎ। সেজানের ল্যাণ্ডস্কেপ দেখে মনে হয় যেন ছবির মধ্যে ঢুকে আমরা তার মাঠে, ঘাটে, পাহাড়ে বেড়িয়ে বেড়াতে পারি, সর্বদাই পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাবো। সেজানের ছবিতে এই দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরতা, তিনগুণ থাকার ফলেই হয় পরবর্তী যুগের কিউবিজমের জন্ম। পল্ সেজান কিউবিজমের প্রকৃত জনক। সেজান বলতেন প্রকৃতিতে যা কিছু চোখে দেখতে পাই তার মূল গড়ন বা আকার জ্যামিতির তিনটি আকারের একটি না একটি হতেই হবে—সেটি হয় সিলিণ্ডার বা গোল চোঙা, না হয় স্ফিয়র বা গোলক, না হয় কোন বা শঙ্কু। যেমন আপেল আঁকতে গিয়ে সেজান আপেলের খোসার উপর আলোটা ছোট ছোট টুকরো বা স্তরে ভেঙে দিলেন। প্রত্যেকটি স্তর আঁকলেন অদ্ভুত উজ্জ্বল রঙে। সে রঙকে ভেঙে দিলেন আবার নানান রঙে। সেইসঙ্গে ছবির মধ্যে সব রঙ আর স্তরগুলিকে রাখলেন পরস্পরের মধ্যে একসঙ্গে বেঁধে, যাতে সমস্ত ছবিটা গভীর, ভারী, পার্থিব দেখায়।

এধরনের অসম্ভব জটিল ছবি আঁকতে গিয়ে সেজান যেন জীবনমরণ ভুলে গেলেন। অতগুলি স্তর বা সমতলকে ছবিতে একসঙ্গে গাঁথা যে-কোন বিষয়কে অতগুলি বিভিন্ন রঙে ভেঙে ফেলা প্রকৃতিতে হয়তো সম্ভব, মানুষের প্রায় অসাধ্য। সেজান যেন সেই অসাধ্য সাধন করলেন। নিজের একটা প্রতিকৃতি আঁকলেন, তাতে রঙের চাপ আর বিভিন্ন স্তর মিলে হলো এক অপূর্ব সৃষ্টি, জ্যামিতির মধ্যে জন্ম নিয়ে যা গেলো জ্যামিতিকে ছাড়িয়ে কোথায় পিছনে ফেলে। হলো একটি মানুষের মাথা, যার মহত্ত্ব আর শক্তি মনে করিয়ে দেয় রেম্‌ব্রাণ্টকে, আর যার রঙের প্রাচুর্য শুধু সেজানের পক্ষেই সম্ভব।

সেজানের কথা ফুরলো। এবার বলবো আরেকজন পোস্টইম্প্রেশনিস্টের কথা, যিনি সেজানের থেকে বয়সে অনেক ছোট। তিনি ভ্যাঁস ভান গখ। হল্যাণ্ডে ১৮৫৩ সালে জন্ম। মারা যান ১৮৯০ সালে। মাত্র ৩৭ বছর বেঁচেছিলেন। জীবন আরম্ভ করেন এক ছবির দোকানে। কেউ ছবি কিনতে এসে যদি বাজে ছবি কিনতে চাইতো, এমন লম্বা ধমক দিতেন যে লোকে পালাতো, দোকানের বদ্‌নাম হতো। দোকান ছাড়তে হলো। কিছুদিন স্কুলমাস্টারি করলেন, কিন্তু এত বদমেজাজি লোক মাস্টারি করবেন কেমন করে? সুতরাং সে চাকরিও গেলো। তারপর ঠিক করলেন পাদ্রী হবেন। তাও হলো না, কারণ পাদ্রীর কলেজে ভর্তি হয়ে কিছু দিন পর আর ভালো লাগলো না। শেষে মিশনারি হয়ে বেল্‌জিয়মে খনির মজুরদের মধ্যে চলে গেলেন। সেখানে মজুরদের অবস্থা দেখে এত কষ্ট হলো যে যা সামান্য টাকাকড়ি ছিলো, সব বিলিয়ে দিয়ে নিজে উপোস করতে লাগলেন। এই সময়ে ছবি আঁকা আরম্ভ করলেন, তাদের ছবি যাঁদের তিনি টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন।

তাঁর ভাই, তেও কিছু টাকা পাঠালেন। তেও'র কথায় তিনি প্যারিসে গেলেন ছবি আঁকা শিখতে। সেখান থেকে ভান গখ দক্ষিণ ফ্রান্সে আর্ল বলে একটি ছোট শহরে গিয়ে বাস করলেন। এখানে তিনি অনেক ছবি আঁকেন।

ইম্প্রেশনিস্টরা ছবি আঁকতেন রঙের ফুটকি আর আঁচড় দিয়ে। ভান গখ আঁকলেন আঁকাবাঁকা লম্বা লম্বা সুতোর মত রঙের রেখা দিয়ে। তাঁর এক বন্ধু একবার দুঃখ করে বলেন, 'ভান গখ এমন দৈত্যে

ভয় করার মত হয়ে আঁকেন, যে দেখলে ভয় করে, আতঙ্ক হয়।' ভান গথের ছবি দেখলে বোঝা যায় কি ভয়ানক একাগ্রতার সঙ্গে তিনি আঁকতেন।

ভান গথের সমস্ত ছবি যেন সূর্যের আলোয় ভরা। চিত্রকলার ইতিহাসে এত সূর্যের আলো কখনও দেখা যায় নি। সমস্ত কিছুই যেন সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে। আর্লে তাঁর আঁকা নিজের শোবার ঘরের একটা ছবি আছে। সেই ছবি সম্বন্ধে তিনি এক চিঠি লেখেন। চিঠির খানিকটার অনুবাদ দিলুম—

"এবার স্রেফ আমার শোবার ঘর, তবে এবার রঙই সব কাজ করবে······(রঙই) আভাস দেবে বিশ্রামের কিংবা ঘুমের। এক কথায় ছবির দিকে তাকালেই মগজটা বা কল্পনা বিশ্রাম পাবে।"

"দেয়ালগুলি ফিকে বেগ্‌নে। মেঝেটা লাল টালির।"

"খাটের আর দেয়ালগুলোর কাঠের রঙ টাটকা মাখনের মত হল্‌দে, চাদর আর বালিশ খুব হাল্কা সবুজ-হল্‌দে।"

"বিছানা-ঢাকাটা টকটকে লাল। জানালা সবুজ।"

"মুখ ধোবার টেবিলটা কমলা রঙের, মুখ ধোবার পাত্রটা নীল। দরজাগুলি লাইল্যাক রঙের।"

"এই হলো—খড়খড়ি-বন্ধ-করা ঘরে আর কিছু নেই।

"আসবাবপত্রের মোটা মোটা রেখা শুধুমাত্র বোঝাবে নিটোল অনির্বচনীয় বিশ্রাম। দেয়ালে পোর্ট্রেট, একটা আয়না, একটা তোয়ালে, আর কিছু কাপড়।

"ছবিতে যখন কোন সাদা নেই, ফ্রেম হবে সাদা······

"এখন বুঝতে পারছো কত সহজভাবে ছবিটা এঁকেছি। ছায়াগুলো, আর জিনিসগুলো যেসব ছায়া ফেলেছে, সেগুলো হবে চাপা, উজ্জ্বল নয়। সবটা হবে ঝরঝরে সমান ওয়াশে আঁকা, জাপানী ছাপা ছবির মত।"

ভান গথের ছবি সময়ে সময়ে মনে হয় যেন রঙ দিয়ে আঁকা নয়, তাল তাল রঙ দিয়ে মড্‌ল্ করা। চাপ চাপ রঙ অনেকখানি জায়গা জুড়ে লাগানো, সেগুলি সমান, মসৃণ করে লাগানোর জন্যে কোন চেষ্টাই যেন নেই। ক্যান্‌ভাসে রঙ পড়ে আছে, উঁচু-নীচু, পাহাড়ের কর্কশ গায়ের মত, তার শত শত ছোট ছোট গা থেকে যেন আলো

ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে, তার সঙ্গে ছবির গায়েই ছোট ছোট ছায়াও পড়ছে।

ভান গখের জীবনের খুব বিষাদের গল্প একটা বলি। শেষের দিকে তিনি উন্মাদের মত হয়ে গেছলেন। একদিন কফি খেতে দোকানে গেছেন, সেখানে তাঁর চেনা একটি পরিচারিকা—বন্ধুও বলা যায়—তাঁর কাছে একটা উপহার চান। তার পরে রহস্য করে মেয়েটি বলেন—'আচ্ছা, আর কিছু না দিতে পারো, তোমার বড় বড় দুটো কানের একটা তো আমাকে দিতে পারো?'

ঠিক বড়দিনের আগে মেয়েটি একটি উপহারের বাক্স পেলেন। ভাবলেন বড়দিনের কোন উপহার হবে। বাক্সটি যখন খুললেন, একটা জিনিস গড়িয়ে পড়লো। একটা রক্তমাখা মানুষের কাটা কান! মেয়েটি তো আতঙ্কে আধমরা। বেচারী ভান গখকে পাওয়া গেল বিছানায়, সম্পূর্ণ উন্মাদ! ক্ষুর দিয়ে একটা কান কেটে ফেলেছেন।

তাঁকে উন্মাদ-আশ্রমে নিয়ে গেলো। সেখানে কিছুটা ভাল হয়ে আরো কতকগুলি বিশ্ববিখ্যাত ছবি আঁকেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই উন্মাদ অবস্থা ফিরে আসতো। শেষে ১৮৯০ সালে বন্দুকের গুলিতে ভান গখ আত্মহত্যা করলেন।

আরেকজন পোস্টইম্প্রেশনিস্টের কথা বলে শেষ করবো। তাঁর নাম পল গোগ্যাঁ। য়োজেন অঁরি পল গোগ্যাঁ জন্মান ১৮৪৮ সালে। মারা যান ১৯০৩ সালে। গোগ্যাঁ ফরাসী। সেজান্, ভান গখ, গোগ্যাঁ, তিনজনে তিনরকম, যদিও ভান গখের সঙ্গে গোগ্যাঁর অনেক মিল ছিলো।

গোগ্যাঁ অদ্ভুতভাবে জীবন আরম্ভ করেন। খুব ছেলেমানুষ থাকতে বাড়ী থেকে পালিয়ে জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দেন। খালাসী হয়ে পৃথিবীর অনেক যায়গায় ঘোরেন। শেষে প্যারিসে ফিরে ব্যবসা আরম্ভ করেন।

ছেলেবেলায় সমুদ্রে না পালালে গোগ্যাঁ বোধ হয় কখনও শিল্পী হতেন না। একদিন রাস্তায় যেতে যেতে একটা দোকানের জানালায় দেখেন প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপের ছবি, রঙ আর আলোয় উজ্জ্বল। তাঁর স্মৃতিতে ছবিগুলি এত আঘাত দিলো যে তিনি জিজ্ঞেস করলেন এসব ছবি এঁকেছে কারা। এই করে পোস্ট ইম্প্রেশনিস্টদের

সঙ্গে আলাপ হলো। গোগ্যাঁও ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন। ভান গখের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো, কিছুদিন তাঁর সঙ্গে আর্লে থাকলেনও। কিন্তু দুজনে ঝগড়া করলেন। একদিন ভান গখ্ ক্ষুর হাতে গোগ্যাঁকে রাস্তা পর্যন্ত তাড়া করলেন, শেষে বন্ধুর গায়ে ক্ষুর না বসিয়ে বাড়ী ফিরে নিজেকেই গুরুতরভাবে জখম করলেন। তখন ১৮৮৮ সাল। তার পর গোগ্যাঁ ভান গখকে ছেড়ে চলে গেলেন।

কিন্তু ছোটবেলায় দেখা প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট ছোট দ্বীপ তাঁকে টানতে লাগলো। একদিন কথাবার্তা নেই, জিনিসপত্র বেঁধে টাহিটি যাবার এক জাহাজে উঠে বসলেন। টাহিটিতে গিয়ে অজস্র ছবি আঁকলেন! সেখানে টাহিটিবাসীদের একজন হয়ে, তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে, বাস করতে লাগলেন, আর ভাল ভাল ছবি আঁকলেন।

এইসব ছবি গরম দেশের রঙ আর আলোয় ভরপুর। দ্বীপবাসীদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের খেলা, কাজ, বিশ্রাম, গোগ্যাঁ এঁকে দেখালেন। এইসব ছবি গোগ্যাঁকে জগদ্বিখ্যাত করেছে।

দশম অধ্যায়

বিশ শতকের শিল্পীরা

কিউবিজম

ছবি ছেড়ে সাহিত্যের কথা পাড়ছি দেখে হয়তো একটু অবাক হবে। কিন্তু বিশ শতকের ছবি, বিশেষত সেজান বা তাঁর পরের যুগের ছবি, বুঝতে গেলে সাহিত্যের এবং অন্যান্য শিল্পের সমস্যা মোটামুটি না বুঝলে চলবে না, কারণ এ-যুগে সাহিত্য, ছবি, ভাস্কর্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রতিযুগেই এইভাবে জড়িত, যেমন ছিলো অ্যারিস্টট্‌লের যুগে, লেঅনার্দো দা ভিঞ্চির যুগে, বা মিকেলাঞ্জেলোর যুগে। এভাবে বললে কথাটা খুবই সহজ আর ঠিক শোনায়, যদিও আমরা ঠিক কথাটা যে ঠিক, তা প্রায়ই ভুলে যাই।

১৯২১ সালে টমাস স্টর্নস্ এলিয়ট বলে এক বিখ্যাত ইংরেজ কবি সতেরো শতকের কয়েকজন দার্শনিক কবি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেন :

"তাঁরা (অর্থাৎ ডান্ প্রভৃতি কবিরা) কাব্যে দুটি তিনটি পরস্পর-বিরোধী ছবি একের মধ্যে অন্যটি ঢুকিয়ে নানাভাব একসঙ্গে বেঁধে, খুব জোরালো আভাসের সৃষ্টি করতেন। আর এই রীতিই ছিলো তাঁদের ভাষার প্রাণশক্তির অন্যতম উৎস। নানা ধরণের, এমনকি পরস্পর-বিরোধী বিষয় বা ছবিও, কবির মনে জড়ো হয়ে, সেখানে পরিবর্তিত হয়ে কবিতার সৃষ্টি করে। জনসন বা চ্যাপম্যানের মত কবির কবিতায় তাঁদের পাণ্ডিত্য অনুভূতিতে পুনর্জন্ম নিতো। চ্যাপম্যান চিন্তাকে যেন অনুভব করতেন, চিন্তাকে ভাব আবেগ অনুভূতিতে দেহান্তর করাতেন। শেলী বা কীটসেরও কিছু কিছু কাব্যে এইরকম চিন্তার আর অনুভূতির সমৈক্য দেখা যায়। আমাদের যুগের সভ্যতায় কবিদের কবিতা দুরূহ, বা কঠিন হতে বাধ্য। আমাদের সভ্যতায় এত বৈচিত্র্য, এত জটিলতা এসেছে, আর এই বৈচিত্র্য

আর জটিলতা মার্জিত মনে আর রুচিতে এত বিচিত্র, জটিল ভাব আর অনুভূতির সৃষ্টি করে, যে কাব্য কঠিন হবেই। কবির মনের ব্যাপ্তি অনেক বেড়ে যেতে বাধ্য, তাঁকে সংক্ষেপে বহু কথা ইঙ্গিতে বলতে হবে, আরো বেশী ঘুরিয়ে বলতে হবে (সোজা করে বলা সব সময়ে সম্ভব হবে না), সামান্য কথায় একটি পুরো জগতের রেশ থাকবে, এবং এইভাবে তিনি ভাষাকে তাঁর বক্তব্য বইতে বাধ্য করবেন, দরকার হলে ভাষাকে ভেঙে, দুমড়েও দেবেন।"

কথাগুলি পড়তে পড়তে তোমাদের, সেজান সম্বন্ধে একটু আগে যা বলেছি তা হয়তো মনে পড়বে। সেজান একটুকরো চট বা কাগজে যা করতে চেয়েছিলেন, এলিয়টের মতে, আধুনিক কবিরও প্রায় সেই লক্ষ্য, অবশ্য তাঁর উপকরণ ভাষা।

ঠিক এইখানেই আধুনিক যুগের কিউবিজমের উৎপত্তি, সেজান যার জনক, ব্রাক্ যার জন্ম দেন। প্রথমেই মন থেকে মুছে ফেলা দরকার, যে কিউবিজম্ অদ্ভুতকিমাকার একটা কিছু। কিউবিজম্ প্রথম প্রথম অদ্ভুত লাগে তার কারণ কিউবিজমেই প্রথম ছবি, চট, রঙ, রেখা তার আপন, নিজস্ব সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হলো, শুধু চোখে-যা-দেখছি তাই আঁকার জেলখানা বা অত্যাচার থেকে মুক্ত হলো। ছবির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ, রঙ, রেখার মধ্যে মনের গভীরত্ব কায়েম হয়ে বসলো।

জর্জ ব্রাক্ জন্মান ১৮৮১ সালে, এখনও বেঁচে আছেন। ব্রাকের স্টিল-লাইফ দেখলেই বোঝা যায় সেজানের কাছে তিনি কত ঋণী। সেজানের চোখ, মন আর হাত ধার করে শুরু না করলে ব্রাক্ শিল্পী হতে পারতেন না। কিন্তু ব্রাকের কথা বেশী করে বলার সময় নেই। এখন বলবো মাতিস আর পিকাসোর কথা।

অঁরি মাতিস ১৮৬৯ সালে জন্মান। মারা গেছেন ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে। তাঁকে যদিও কিউবিস্ট বলা চলে না, তবুও তার প্রসঙ্গ এখানেই করতে হয়। মাতিস সম্বন্ধে দুটি খুব ভাল বই আছে, একটি লিখেছেন বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক রজার ফ্রাই, দ্বিতীয়টি সোভিয়েত সমালোচক আলেকজাণ্ডার রম। শেষের বইটি মস্কো থেকে ১৯৩৭ সালে ছাপা হয়, বাজারে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু আধুনিক শিল্প বুঝতে গেলে বইটি পড়া নিতান্ত দরকার।

প্রথম বয়সে মাতিস পোস্ট ইম্প্রেশনিস্টদের প্রদর্শনীতে সেজান আর ভান গখের সঙ্গে ছবি দেন। পরে তিনি পারসী পাণ্ডুলিপিচিত্রে খুব মেতে যান।

ছোট ছেলেমেয়ের আঁকা ছবি নিশ্চয় দেখেছো। আজকাল তাদের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর খুব রেওয়াজ হয়েছে। ছোট ছেলেমেয়েরা বড় বড় পুরস্কারও পায়। তাদের এঁচড়ে পাকিয়ে, ভবিষ্যৎটি নষ্ট করার এ একটি প্রকৃষ্ট উপায়। শিশুকে প্রলুব্ধ করে নষ্ট করা খুব হীন কাজ। এদের মধ্যে যাদের বিশ্ববিখ্যাত হবার লোভ ঠিকমত জাগেনি তারা অপূর্ব সাহসে রঙ লাগিয়ে চলে, কোন্ জিনিসের স্বাভাবিক রঙ কি, বিন্দু-মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে। ছাবতে নিজেদের অজান্তে তারা একটা ছন্দ আনে, নক্সা আনে, এদিকে একটা গাছ বা পাহাড়, ওদিকে একটা বেড়াল, এটা মুছে, ওটা কেটে, সেটা আবার লাগিয়ে দিয়ে, যতক্ষণ না মনের মত নক্সা হয় কিছুতেই খুশী হয় না। এটা ভাবে না যে গাছ বা মুখের রেখা স্বাভাবিক গাছ বা মুখ থেকে কত তফাৎ হলো, রঙই বা হলো কত অদ্ভুত। মাতিসের চেষ্টা হলো কি করে শিশুর অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে ছবি আঁকবেন। কিন্তু তিনি তো তা পারেন না, কারণ তিনি যে মহাপণ্ডিত, জ্ঞানীগুণী শিল্পী, তাঁর যে চিত্রশিল্পশাস্ত্রের সব কিছুই জানা, তাঁর নক্সা, রেখা, রঙের হাত যে অসম্ভব পাকা! তিনি ইচ্ছে করলেই তো এসব জিনিস, যা এত কষ্ট করে বুঝেছেন, শিখেছেন, তা একমুহূর্তে ভুলে যেতে পারেন না! কিন্তু বহু সাধনা বহু পরিশ্রম করে তিনি এমন এক শিল্পের সৃষ্টি করলেন যা হলো একধারে ভেবে চিন্তে, অত্যন্ত খেটেখুটে, অনেক পরীক্ষা করে নিখুঁত নক্সার ফল, অন্য-ধারে শিশুর দৃষ্টিতে অভিসিক্ত।

মাতিস চোখে দেখার আকৃতি আঁকেন না, স্বাভাবিক রঙও লাগান না। চোখে যা দেখছেন তাও ঠিক আঁকেন না। তাঁর ছবিকে এক কথায় বলা যায়, রঙীন আকার (ইংরেজিতে কলরড্ শেপ্স্)। কোন বস্তুর এক অঙ্গের সঙ্গে অন্য অঙ্গের যা আনুপাতিক মাপ হওয়া উচিত তা বদলে, গায়ের যে রেখা হওয়া উচিত তা বদলে স্বাভাবিক গড়ন ইচ্ছেমত বাড়িয়ে কমিয়ে, এমনভাবে মাতিস্ রেখা আর নক্সা আঁকলেন, যার নিয়ম স্বাভাবিক জগতের নিয়মের সঙ্গে মেলে না, অথচ যা নিজের আইনকানুনের নিয়মে সুন্দর আর সার্থক। ধরা যাক কার্পেটের উপর

বসা অবস্থায় একটি মহিলার ছবি তিনি আঁকছেন। মাতিস মহিলাটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাপ বদলে দেবেন, এমনকি একটা হয়তো এমন লম্বা বা বেঁটে বা মোটা বা রোগা করবেন যা নিতান্ত অস্বাভাবিক, অথচ মহিলার সেই অস্বাভাবিক প্রতিকৃতিকেই তিনি ছবির অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে এক বিশেষ নিয়মে মিলিয়ে দেবেন। এই হিসেবে, তাঁর কাজ সেজানের পথ বেয়ে গেছে। ছবির ক্যান্‌ভাসটা, পর্দা, কার্পেট, দেয়াল, স্বাভাবিক-জীবন্ত-আকারের-থেকে-ভিন্ন-আকারের মহিলাটি, সব মিলিয়ে এমন এক নক্সার সৃষ্টি করবে যার জন্যে মহিলাটির অদ্ভুত গড়ন আর চোখে আঘাত করবে না। মাতিস সর্বশ্রেষ্ঠ আল্‌পনা-শিল্পী বা ডেক-রেটিভ শিল্পী, আর আধুনিকদের মধ্যে রঙের রাজা। তাঁর ছবিগুলি চ্যাপ্‌টা ; দৈর্ঘ্যপ্রস্থে সম্পূর্ণ, নক্সা ; প্রতিটি ক্ষুদ্র জিনিস অদ্ভুতভাবে ছবিটি ধরে রাখে ; অথচ কি মনোরম আর উল্লাসময় !

চিত্রশিল্পে সেজানের নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের পর, আধুনিক শিল্পীরা জানতে ব্যস্ত হলেন, কি করে ছবি তৈরি হয়, অর্থাৎ নানা জিনিস এক-সঙ্গে মিলিয়ে একটুকরো চটে ধরে রাখে। এটা অবশ্য প্রত্যেক শিল্পীরই মূল প্রশ্ন, কি করে ছবি তৈরি হয়, অর্থাৎ গড়ে ওঠে, ইংরেজিতে যাকে বলে কম্পোজিশন্। কি করে আঁকতে হয়, রঙ দিতে হয়, একই ছবির মধ্যে নানা জিনিস একসঙ্গে ধরে রাখতে হয়, যাতে সমস্ত জিনিসটা রসোত্তীর্ণ হয়, দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু এ তো হলো গোড়ার কথা। ছবির মধ্যে দুটো আলাদা আলাদা ব্যাপার আছেঃ প্রথমত ছবিটা কি দিয়ে গাঁথবে, কি দিয়ে ভরাবে ? দ্বিতীয়ত কি করে গাঁথবে, কি করে ভরাবে। প্রথমটি দরকার এই হিসেবে যে শিল্পী এমন জিনিস বাছবেন যা তিনি জানেন, বোঝেন, নিজের জীবনের সঙ্গে যার নাড়ীর টান আছে, গভীর সমবেদনা আছে, গভীর আগ্রহ আছে যার জোরে তিনি ছবি আঁকতে চাইছেন। দ্বিতীয়টি দরকার এই হিসেবে যে শিল্পী, জনসাধারণ বা দর্শকের জন্যেই আঁকেন, মাত্র দু-একটি ওস্তাদ-পণ্ডিতের জন্য আঁকেন না, সুতরাং নিজেকে বোধগম্য করতেই হবে। যেমন সেজান যখন অসংখ্য স্তর বা প্লেন, আর অসংখ্য রঙের টুকরো নিয়ে প্রাণপাত চেষ্টা করছিলেন কি করে ছবি তৈরি করা যায়, তখন প্রায়ই অকৃতকার্য হয়ে তাঁর আকৃতিগুলো বেঁকেচুরে, দুমড়ে যেতো ; ছবির আপেল, কমলা, নাসপাতি চটের সীমা পেরিয়ে গড়িয়ে পড়ে যেতো, প্রতিকৃতিগুলি

হতো তাল তাল রঙের বিকৃত স্তূপ।

সেজান আধুনিক চিত্রের সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি করলেন। ফলে অনেক শিল্পী চিন্তাভাবনায় পাগল হয়ে বলে উঠলেন "কি আঁকছো তাতে কিছু যায় আসে না। কেমন করে, কি করে আঁকছো সেটাই হচ্ছে আসল কথা।"

এই প্রশ্নকণ্টকিত যুগে ভেলাস্কেথ, গোইয়া, এল্‌গ্রেকোর দেশের এক শিল্পী এলেন, তাঁর নাম পাব্‌লো পিকাসো।

পিকাসো স্পেনের মালাগায় ১৮৮১ সালে জন্মান। পুরো নাম আগেকার যুগের কোন সম্রাটের নামের চেয়ে বড়—পাব্‌লো দিয়েগোয়োমে ফ্রান্‌থিসকো দি পল য়ুয়ান নেপোমুথেনো ক্রিস্‌প্যাঁ ক্রিস্‌পিয়ানো দি লা সান্তিসিমা ত্রিনিদাদ রুইথ্‌ ঈ পিকাসো। বাইশ বছর বয়সে প্যারিসে যান, সেখানেই এখন পর্যন্ত বাস করছেন। এখন বয়স ৭৩।

প্রথম বয়সে অবস্থা খারাপ ছিলো, কিন্তু প্যারিসে আসার কিছুদিনের মধ্যেই শিল্পজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। বারো বছর বয়সে আঁকা তাঁর যেসব পোর্ট্রেট আছে তা বিশ্ববিখ্যাত পোর্ট্রেট শিল্পীর কাজের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। ঘুরে ফিরে নানা বয়সে, মাঝে মাঝেই, লোককে তাক লাগানোর জন্যে, ঐতিহ্যসিদ্ধ রীতিতে এমন ছবি এঁকেছেন, যা র‍্যাফেইল, লেঅনার্দো, রেম্‌ব্রাণ্টের পাশে অনায়াসে সসম্মানে রাখা যায়। অনেকে পিকাসো বলতে শুধুই কিউবিজম বা বস্তুবিচ্ছিন্ন ছবির কথা মনে করেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, পুরানো পদ্ধতিতে অতি অল্পবয়সে পিকাসো এত সহজ অবিসংবাদিত দক্ষতা আয়ত্তে এনেছিলেন বলেই তিনি অবহেলায় সেগুলি হাতে ঠেলে নিরাসক্ত মনে তাঁর মনের মত করে ছবি আঁকতে পারলেন। তিন বছর আগে কলকাতায় যে আন্তর্জাতিক চিত্রকলা প্রদর্শনী হয়েছিলো তাতে পিকাসো আর মাতিসের ছবি ছিলো, দেখেছো নিশ্চয়।

তাঁর মত বিখ্যাত শিল্পী পৃথিবীতে এখন আর নেই। তাঁর খ্যাতি হলো এমন এক শিল্পরীতির প্রবর্তন ক'রে, যা তাঁর আগে কেউ ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙায়নি। ইওরোপীয় চিত্রশিল্পের বিরাট ইতিহাসে তাঁর মত প্রতিভাবান শিল্পী বিরল। অসীম কার্যক্ষমতা, সব রকম

চারুশিল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, প্রতিটি চারুশিল্পের রীতিনীতিতে অদ্ভুত দখল, সব কিছুই যেন তিনি করতে পারেন, যা-কিছুতে হাত দেবেন তাই সোনা হয়ে যাবে, অথচ এই বিরাট প্রতিভাবান স্প্যানিয়ার্ডটি তাঁর সমস্ত কিছু প্রতিভা, ছবির শুধু একটা দিকের ব্যাপার নিয়েই কাটালেন কি করে ছবি তৈরি হয়, কি করে তা গেঁথে ওঠে। তাঁর সম্বন্ধে এই কথাটি যদি মনে রাখো, তাহলে তাঁর ছবি—প্রত্যেকের যা এত দুর্বোধ্য লাগে—সেই ছবি বোঝার দিকে অন্তত প্রথম ধাপ এগোলে।

এই বইএর প্রথম দিকে বলেছি দৃঢ় বিশ্বাস, প্রতীতি বা আশা কি করে মহান শিল্পীদের মনে ছবি আঁকার প্রেরণা জুগিয়েছে—জত্তো ধর্ম-বিষয়ক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতেন, রেমব্রান্ট হতেন সাধারণের দুঃখকষ্টে, গোইয়া হতেন যুদ্ধের কুৎসিত ভয়াবহতায়। কিন্তু পিকাসো যেন জাগতিক ঘটনায় নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত, তাঁর জগৎ যেন শুধু ছবি আর তার নিয়মকানুন। নেশাখোর, মাতাল, পতিতাদের ছবি আঁকতে গিয়ে পিকাসো রক্তমাংসের মানুষগুলির প্রতি কোন উৎসাহ, উত্তেজনা যেন বোধ করলেন না, শুধু ব্যস্ত হলেন ছবি হিসেবে তারা কি রকম দেখাচ্ছে। স্বাভাবিক চোখে-দেখা দৃশ্যকে তিনি ভেঙে, ছিঁড়ে, আবার নতুন ক'রে গড়লেন। আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক প্রকৃতির সঙ্গে কিছুটা মিল রইলো বটে, কিন্তু ছবিটা এমন হলো যা আগে কখনও কেউ আঁকেনি। তাঁর নেশাখোর, বুড়ী পতিতাদের, নেশাখোর বা পতিতা বলে চেনা গেলো অবশ্য, কিন্তু তারা হোগার্থ, গোইয়া বা ড্যমিয়ের ছবির মত চোখের চেনা হলো না। কারণ তাদের চেনা-চেনা করার দিকে পিকাসোর বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিলো না। তাঁর উৎসাহ আর উদ্দেশ্য ছিলো সেগুলিকে পরীক্ষা হিসেবে নেয়া, চিত্রশিল্পশাস্ত্রের আইনকানুন বিচার করা, কম্পোজিশনে বা ছবিতে গাঁথা, স্বাভাবিক আকৃতি ভেঙে নতুন ক'রে গড়া। এসব হলো তাঁর শিল্পের বস্তুদের আকার, রেখা, রঙের মধ্যে নানা সম্বন্ধপাত নিয়ে পরীক্ষা, ছবির মধ্যে নানা জিনিস কি করে গাঁথবেন, তাই নিয়ে চেষ্টা।

এই শিল্পী, ওই শিল্পী, গ্রীক ভাস্‌শিল্পী, র‍্যাফেইল, অ্যাঙ্গ্‌র্, কোরো, এল্‌গ্রেকো, সেজান, গোগ্যাঁ, ভান গখ্, সবাইকে একবার করে ধরেন, আর তাঁদের ছবি আঁকার পদ্ধতি অস্ত্রচিকিৎসকের মত করে কেটে ছিঁড়ে দেখে, ফেলে না দিয়ে প্রত্যেকবার নতুন এক জিনিস তৈরী

করেন। জীবন থেকে নয়, অন্যদের ছবি নিয়ে তার থেকে নতুন ছবির সৃষ্টি তিনি করতে লাগলেন, যার জন্যে স্বাভাবিক জগতের জিনিসপত্র হলো উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁর মন নৈয়ায়িকের মন, বৈজ্ঞানিকের মন। এইভাবে ১৯০৭ সালে, ২৬ বছর বয়সে তিনি যা করলেন চিত্রশিল্পের ইতিহাসে তা কখনও হয়নি।

জীবনের অভিজ্ঞতাকে বাদ দিলেন, বিষয়বস্তুকে বাদ দিলেন। নিলেন রেখা, বস্তুর ব্যাপ্তি আর ঘনত্ব, নানান রীতি—যেসব উপকরণে ছবি গাঁথা হয়—আর তাই হাতে নিয়ে স্বাভাবিক প্রাকৃত রূপকে ত্যাগ করলেন। মানুষের শরীর বলে চেনা যায় এমন ছবি শুধুমাত্র না এঁকে তিনি রেখা, রঙের স্তর, ব্যাপ্তি আর ঘনত্বের সাহায্যে ফিগর আঁকলেন। এটা হলো পরিপাটি চিন্তার ফল; তাতে সাহায্য পেলেন নিগ্রো ভাস্কর্যের—আফ্রিকা মহাদেশের নিগ্রোদের কাঠের পুতুল থেকে—আর পেলেন সেজানের ছবির অসংখ্য সমতল বা স্তর থেকে, যেসব স্তর জুড়ে জুড়ে সেজান ছবিতে দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সঙ্গে গভীরত্ব আনতেন।

কিন্তু এই ব্যাপারে পিকাসো সেজানের ছোট ছোট সমতল বা স্তর নিয়ে সন্তুষ্ট রইলেন না; স্তরগুলিকে অনেক বড় করে আঁকলেন। ফল হলো অদ্ভুত। প্রায় ভয়াবহ। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, মানুষের মাথা আঁকতে গিয়ে তার নাকটা বদলে করলেন প্রিজ্‌ম্, চোখ দুটোকে করলেন ত্রিকোণ, গাল দুটো করলেন দুটি রঙের তাল, তাতে ছোট বড় অনেক সমতল। মানুষের মাথা ব'লে কোনমতে চেনা গেলেও আসলে সেটা হলো নানা জ্যামিতিক আকারের সমন্বয়। তারপর আরো অদ্ভুত কাণ্ড ঘটলো। করলেন কি, মাথাটা কয়েক ভাগে বা সেক্‌শনে ফালি-ফালি ক'রে চিরে ফেল্লেন, ফেলে ভাগগুলো উল্টেপাল্টে বসালেন, এখানে একটা চোখ, সেখানে নাক, ছবির কোথায় কোণ ঘেঁসে মুখ, দেখা যায় কি না যায়। আগের কোন ছবিতে এরকম মাথা কেউ দেখেনি। শেষকালে মুখের সঙ্গে শেষ সাদৃশ্যটুকুও গেলো। কিছুই রইলো না, রইলো কেবল কতগুলি স্তর আর রঙের টুকরো, সোজা সোজা রেখা দিয়ে বাঁধা; খাড়া করা চটের উপর একটা চ্যাপ্‌টা নক্সা।

এই রীতিকে বলা হলো কিউবিজম, কারণ; প্রথমত, এর সৃষ্টি হলো কিউবিক (বা ঘনকের) গড়নে, আর দ্বিতীয়ত, এই রীতি সব প্রাকৃত, স্বাভাবিক বস্তুকে জ্যামিতিক সমতল আর কোণে টুকরো

টুকরো করে ফেললো। এর থেকে শুরু হলো আধুনিক যুগের অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট চিত্ররীতি. প্রাকৃত রূপ আর গড়ন বর্জন করে জ্যামিতিক রূপ আর গড়নের উপর আশ্রয়, যে চিত্ররীতি স্বাভাবিক দৃশ্য বা বস্তু আঁকা দিলো ছেড়ে, প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যকে করলো ত্যাগ।

খুব অল্প কথায় পিকাসো সম্বন্ধে যা বললুম তাতে যদি মনে হয় যে পিকাসো ছবিতে প্রাণ, আবেগ, নিছক সৌন্দর্য বর্জন করেছেন তাহলে খুব ভুল হবে, অন্যায়ও হবে। তাঁর মহত্ত্বের মূল কথাই হচ্ছে যে চিত্র-শিল্পের বিজ্ঞান নিয়ে মেতে থাকলেও তাঁর ছবি কোন সময়েই আবেগ-বর্জিত নয়। তাঁর 'ব্লু' পিরিয়ড, 'রোজ' পিরিয়ডের ছবিতে মলিন শতচ্ছিন্ন-পোশাক-পরা ভিখারী, নেশাখোর বুড়ো, ছোট ছেলেমেয়ে, স্ত্রী-পুরুষ আমাদের যুগের এক একটি ছবি। স্পেনের অন্তর্যুদ্ধের সময়ে আঁকা 'গোয়েনিকা' ছবি যুদ্ধের ভয়াবহতা, মানুষের নীচতার যে কাহিনী দেখিয়েছে তা গোইয়ার চেয়ে কোন অংশে দুর্বল নয়। ড্যমিয়ের চেয়ে তাঁর ছবিতে মানবিকতা কম ফোটেনি। আর ঠিক এইখানেই তাঁর শিল্পের মহত্ত্ব। কম্পোজিশনের নানা সমস্যার নির্লিপ্ততার মধ্যে, পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা সম্বন্ধে আগ্রহশীল, ভবিষ্যতে আস্থাবান, অগ্রগামী রাজনীতিতে বিশ্বাসী পিকাসোকে চিনতে একটুও দেরি হয় না। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে এই মানবিক আবেগের অভাব প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু তাঁর ছবিতে জীবন আর পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ প্রায় সব সময়েই স্পষ্ট।

কিউবিজম্ বা অ্যাব্‌স্ট্যাকট আর্টকে শুধুই শিল্পীদের চট, রঙ, তুলি নিয়ে পরীক্ষা বলে উড়িয়ে দেয়া চলে না। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে এলিয়টের কথা, যা এই অধ্যায়ের প্রথমে তুলে দিয়েছি। ঐ রচনাটির আরেক জায়গায় এলিয়ট বলেছেন, "কাব্য দুরূহ হয়ে গেলে অনেকে উপদেশ দেন, 'হৃদয়ের ভিতরে চেয়ে লেখো'। কিন্তু সেরকম দেখাও যথেষ্ট গভীরভাবে দেখা নয়; রাসীন্ বা ডান্ হৃদয় ছাড়াও আরো অনেক কিছু ভাল ক'রে দেখে লিখতেন। মগজের সেরিব্রাল কর্টেক্স, শরীরের স্নায়ুপ্রণালী, পেটের পরিপাক প্রণালীও ভাল করে দেখা দরকার"। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এই যন্ত্রযুগে আমরা প্রত্যহ যে সব যন্ত্রের সংস্পর্শে আসি, তাদের রূপ, আকার, গড়ন, অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট বা জ্যামিতিক,—যেমন মোটরকার, এঞ্জিন, জাহাজ,

এরোপ্লেন, জেট্ প্লেন, আধুনিক বাড়ী। সেসব দেখে দেখে আমাদের চোখ, অভিজ্ঞতা সবই বদলে যাচ্ছে। প্রাকৃত অপ্রাকৃত রূপ, গড়ন বা আকারের প্রভেদ রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। তা ছাড়া আমাদের পূর্বপুরুষরা নিত্য যত জিনিস চোখে দেখ্তেন, তার চেয়ে আমাদের অনেক বেশী জিনিস রোজ দেখতে হয়।

পিকাসোর চিত্ররীতি থেকে আরেক রীতির উদ্ভব হলো। তার নাম সুর্‌রিয়ালিজম। এই রীতির প্রথম প্রবর্তন করেন বিখ্যাত সুইস্ শিল্পী পল্ ক্লে আর মাক্স এর্ন্স্ট। পল্ ক্লে জন্মান ১৮৭৯ সালে, মারা যান ১৯৪০ সালে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো চিত্রে অবচেতন মনের ছবি তুলে ধরবেন, কারণ ঠিক এই সময়ে ফ্রয়েড, ইউঙ্গ আর অ্যাড্লারের যুগান্তকারী আবিষ্কার বেরোয়। তাঁরা চেষ্টা করলেন স্বপ্নে আর দুঃস্বপ্নে দেখা ঘুমের ছবি ক্যান্‌ভাসে আঁকতে। এই ব্যাপার নিয়ে অনেকে চাতুরিও শুরু করলেন, শিল্পের নামে আরম্ভ হলো যাবতীয় সৃষ্টিছাড়া উদ্ভট জিনিষ আঁকা।

চিত্রশিল্পের পথে চলতে চলতে জগতের অন্য ঘটনার সঙ্গে যোগ হারিয়ে, অনেক শিল্পীই বাস্তব জগৎ থেকে সরে গিয়ে স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন আঁকড়ে দিন কাটান। কোন শিল্পী যদি শুধু নিজের জন্যই আঁকেন, অথবা নিছক শিল্পের দোহাই দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেন, যদি তিনি দৈনন্দিন জীবন থেকে, রোদ, ঘাম, দুঃখ, কষ্ট, সুখ থেকে খুব দূরে স'রে যান, তাহলে তাঁর সৃষ্টি ক্রমশ মূল্যহীন হয়ে যেতে বাধ্য। এসব শিল্পীদের সম্বন্ধে আমরা বলি, তাঁরা গজদন্তের মিনারে থাকেন। আমাদের যুগেও অনেক শিল্পী গজদন্তের মিনারে বাস করেন; তার ফলে তাঁদের চরিত্র যায় নষ্ট হয়ে। কোনও প্রকৃত শিল্পী শুধুমাত্র নিজের জন্যে আঁকেন না। যাঁরা বলেন যে শুধু নিজের জন্যে আঁকেন তাঁরা ব্যর্থ, পরাজিত, তাঁদের ও ছাড়া আর বলার মত কিছু নেই। চিত্রশিল্প একরকম ভাষা; আর কোনও প্রকৃতিস্থ মানুষ শুধু নিজের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ভাষা শেখে না। শিল্পীর গুণই হচ্ছে তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী দেখতে পান, আরো ভাল করে দেখতে পান; আর তিনি এমন ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করেন, যা এত জোরালো আর কবিত্বময়, এত জমকালো, সরল আর আবেগময়, যা চেষ্টা করলেই লোকে বুঝতে পারবে, এড়িয়ে যেতে চাইবে না, পারবে না।

প্রধান প্রধান ইওরোপীয় চিত্রশিল্পীদের জন্মমৃত্যুর তারিখ

১। খ্রীষ্টীয় তেরো থেকে চোদ্দ শতক

ইতালিয়ান—চীমাবুয়ে, জভান্নি (Giovanni Cimabue) (১২৪০—১৩০২)
দুচ্চো, দি বুয়োনিনসেঞা (Duccio di Buoninsegna) (১২৬০—১৩২০)
জত্তো, দি বন্দনে (Giotto, Di Bondone Ambrogiotto) (১২৬৬—১৩৩৭)

২। চোদ্দ থেকে পনেরো শতক

ইতালিয়ান—মনাকো, লরেঞ্জো (Lorenzo Monaco) (১৩৭০?—১৪২৫ ?)
ফ্রা আঞ্জেলিকো (Fra Angelico) (১৩৮৭—১৪৫৫)
উচ্চেল্লো (Uccello) (১৩৯৭—১৪৭৫)
পিজানেল্লো (Pisanello) (১৩৯৭।৯—১৪৫৫)

ফ্লেমিশ— ভান আইক, হিউবার্ট (Hubert Van Eyck) (১৩৬৬—১৪২৬)
কাম্প্যাঁ (Campin) (১৩৭৫—১৪৪৪)
ভান আইক, ইয়ান (Jan Van Eyck) (১৩৮৫—১৪৪১)

৩। পনেরো থেকে ষোল শতক

ইতালিয়ান—মাজাচ্চো (Masaccio) (১৪০১—১৪২৮ ?)
ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পি (Fra Filippo Lippi) (১৪০৬—১৪৬৯)
ফ্রাঞ্চেস্কা, পিয়েরো দেল্লা (Piero Della Francesca) (১৪১৬—১৪৯২)
গজ্জোলি, বেনোজ্জো (Benozzo Gozzoli) (১৪২০—১৪৯৮)
বল্‌দোভিনেত্তি, এ্যালেস্‌সো (Alessio Baldovinetti) (১৪২৭—১৪৯৯)
মেস্‌সিনা, আন্তোনেল্লো দা (Antonello da Messina) (১৪৩০—১৪৭৯)
তুরা, কজিমো (Cosimo Tura) (১৪৩০—১৪৯৫)
বেল্লিনি, জভান্নি (Giovanni Bellini) (১৪৩০—১৫১৬)
মান্তেঞা, আন্দ্রেয়া (Andrea Mantegna) (১৪৩১—১৫০৬)
জর্জো, ফ্রাঞ্চেস্কো দি (Francesco di Giorgio) (১৪৩৯—১৫০২)

বতিচেল্লি, আলেসান্দ্রো দি মারিআনো (Alessandro di Mariano Botticelli) (১৪৪৪—১৫১০)

পেরুজীনো, পিয়েত্রো ভান্নুচ্চি (Pietro Vanucci Perugino) (১৪৪৬—১৫২৩)

গিয়ারলান্দায়ো, দমেনিকো দেল (Domenico del Ghirlandajo) (১৪৪৯—১৪৯৪)

লেওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci) (১৪৫২—১৫১৯)

কার্পাচ্চো, ভিত্তোরে (Vittore Carpaccio) (১৪৫৫—১৫২৪)

লূইনী, বের্ণাদিনো (Bernardino Luini) (১৪৬০—১৫৪৫)

মিকেলাঞ্জেলো, বুয়োনারোত্তি (Buonarroti Michaelangelo) (১৪৭৫—১৫৬৪)

তিশান (তিৎসিয়ানো) ভেচেল্লো (Vecellio Tiziano) (১৪৭৭—১৫৭৬)

জর্জনে, জর্জো দা কাস্তেলফ্রাঙ্কো (Giorgio da Castel-franco Giorgione) (১৪৭৮—১৫১০)

র‍্যাফেইল (রাফাইল্লো) সানৎজিও (Sanzio Raffaello) (১৪৮৩—১৫২০)

করেজ্‌জো, আন্তোনিয়ো আলেগ্রি (Antonio Allegri Correggio) (১৪৯৪—১৫৩৪)

ফ্লেমিশ— ভাইড্‌ন্ ভান ডার (Van der Weyden) (১৪০০?—১৪৬৪)

মেম্‌লিঙ্ (Memling) (১৪৩০?—১৪৯৪)

মাবুস্ (Mabuse) (১৪৭২?—১৫৩৫)

পাতিনির (Patinir) (১৪৮৫—১৫২৪)

ডাচ্— বশ্, হিয়েরোনিমাস ভান অয়েকেন (Heronymus Van Aeken Bosch) (১৪৬০—১৫১৬)

জার্মান— লখ্‌নার, স্টিভ্‌ন্ (Stephen Lochner) (১৪০০?—১৪৫১)

ডিউরর, অ্যাল্‌ব্রেক্ট (Albrecht Durer) (১৪৭১—১৫২৮)

ক্রানাখ্, লিউকস্ (Lucas Cranach) (১৪৭২—১৫৫৩)

হোল্‌বাইন, হানস্, ছোট (Hans Holbein, Junior) (১৪৯৭—১৫৪৩)

ফরাসী— ফুকে, জঁ। (Jean Fouquet) (১৪২০?—১৪৮১?)

বাল্‌ডুঙ, হান্‌স্ (Hans Baldung) (১৪৮০—১৫৪৫)

৪। ষোল থেকে সতেরো শতক

ইতালিয়ান—ব্রন্‌ৎজিনো, অ্যাঞ্জেলো দি কজিমো (Angelo di Cosimo Bronzino) (১৫৩০—১৫৭২)

তিন্তোরেত্তো, জাকোপো (Jacopo Tintoretto) (১৫১৮—১৫৯৪)

ভেরোনেজে, পল (Paul Veronese) (১৫২৮—১৫৮৮)

বাসানো, ফ্রাঞ্চেস্কো (Francesco Bassano) (১৫৪৯—১৫৯২)

ফ্লেমিশ— ব্রখেল (ব্রুগাল) পীটর (Pieter Brueghel) (১৫২৫—১৫৬৯)

ব্রখেল, ইয়ান (Jan Brueghel) (১৫৬৮—১৬২৫)

রুবেন্স, পীটর পল (Peter Paul Rubens) (১৫৭৭—১৬৪০)

ভান ডাইক, আন্টন (Anton Van Dyck) (১৫৯৯—১৬৪১)

ডাচ— হাল্‌স্, ফ্রাঞ্জ (Franz Hals) (১৫৮০?—১৬৬৬)

জার্মান— বিহাম, বার্টেল (Barthel Beham) (১৫০২—১৫৪২)

ফরাসী— ক্লুয়ে, ফ্রাঁসোয়া (Franfois Clouet) (১৫১৬—১৫৭২)

পুস্যাঁ, নিকোলাস (Nicholas Poussin) (১৫৯৪—১৬৬৫)

স্প্যানিশ— এল্‌ গ্রেকো ডমেনিকো থিয়োটোকপুলি (El Greco Domenico Theotocopuli) (১৫৪৫—১৬১৪)

রিবেরা, ইউসেপে (Jusepe Ribera) (১৫৮৮—১৬৫২)

থুরবারান, ফ্রান্থিস্‌কো দি (Francisco de Zurbaran) (১৫৯৮—১৬৬২)

ভেলাস্‌কেথ দিয়েগো রড্‌রিগেথ দি (Diego Rodriguez de Velasquez) (১৫৯৯—১৬৬০)

ব্রিটিশ— হিলিয়ার্ড, নিকোলাস (Nicholas Hillyard) (১৫৪৭?—১৬১৯)

৫। সতেরো থেকে আঠারো শতক

ইতালিয়ান—কানালেত্তো, জভান্নি আন্তোনিও কানাল (Giovanni Antonio Canale Canaletto) (১৬৯৭—১৭৬৮)

ডাচ— রেমব্রান্ট, হারমেন্‌জ ভান রাইন (Harmenz Van Rijn Rembrandt) (১৬০৬—১৬৬৯)

ডি হুখ, পীটর (Pieter De Hooch) (১৬২৯—১৬৮৩?)

ভের্‌মেয়ার, ইয়ান (Jan Vermeer) (১৬৩২—১৬৭৫)

হবেমা, মাইনডার্ট (Meindert Hobbema) (১৬৩৮—১৭০৯)

ফরাসী— ক্লোদ (Claude) (১৬০০—১৬৮২)
ওয়াতো, আঁতোয়ান (Antoine Watteau) (১৬৮৪—১৭২১)
পতের, জঁ।-বাপ্তীস্ত (Jean-Baptist Pater) (১৬৯৫—১৭৩৬)
শার্দাঁ, জঁ।-বাপ্তীস্ত সিমেয় (Jean-Baptist Simeon Chardin) (১৬৯৯—১৭৭৯)
স্প্যানিশ— মুরীল্লো বার্তোলোমে (Bartolome Murillo) (১৬১৭-১৬৮২)
বৃটিশ— হোগার্থ, বিলিয়ম (William Hogarth) (১৬৯৭-১৭৬৪)
হাইমোর, জোসেফ (Joseph Highmore) (১৬৯৭-১৭৮০)

৬। আঠারো থেকে উনিশ শতক

ইতালিয়ান- গার্দি, ফ্রাঞ্চেস্কো (Francesco Guardi) (১৭১২—১৭৯৩)
ফরাসী— বুশের, ফ্রঁাসোয়া (Francois Boucher) (১৭০৩—১৭৭০)
ফ্রাগোনার, জঁ। ওনোরে (Jean Honore Fragonard) (১৭৩২—১৮০৬)
দাভিদ, জাক লুই (Jacques Louis David) (১৭৪৮—১৮২৫)
এ্যাঙ্গর্, জঁ। অগস্ত দমিনিক (Jean Auguste Dominique Ingres) (১৭৮০—১৮৬৭)
কোরো, জঁ। বাপ্তীস্ত কামীল (Jean Baptiste Camille Corot) (১৭৯৬—১৮৭৯)
দেলাক্রোয়া ফের্দিনঁ। ভিক্তর ইউজেন (Ferdinand Victor Engene Delacroix) (১৭৯৮—১৮৬৩)
স্প্যানিশ- গোইয়া, ফ্রান্সিসকো দি (Francisco de Goya) (১৭৪৬—১৮২৮)
বৃটিশ— রেনল্ড্‌স, জশুয়া (Joshua Reynolds) (১৭২৩—১৭৯২)
গেন্‌স্‌বরো, টমাস (Thomas Gainsborough) (১৭২৭—১৭৯২)
রম্‌নি, জর্জ (George Romney) (১৭৩৪—১৮০২)
ব্লেক, বিলিয়ম (William Blake) (১৭৫৭—১৮২৭)
হপনার, জন্ (John Hoppner) (১৭৫৮—১৮১০)
ক্রোম, জন্ (John Crome) (১৭৬৮—১৮২১)
লরেন্স, টমাস (Thomas Lawrence) (১৭৬৯—১৮৩০)

টার্ণার, বিলিয়ম (William Turner) (১৭৭৫—১৮৫১)
কন্‌স্টেবল্, জন (John Constable) (১৭৭৬—১৮৩৭)
কট্‌ম্যান, জন্ সেল (John Sell Cotman) (১৭৮২—১৮৪১)

৭। উনিশ থেকে বিশ শতক

ডাচ্— ভান গখ্, ভঁ্যাসঁ' (Vincent Van Gogh) (১৮৫৩—১৮৯০)
ফরাসী— দমিয়ে, ওনোরে (Honore Daumier) (১৮০৮—১৮৭৯)
দ্যবিঞি, শার্ল ফ্রঁাসোয়া (Charles Francois Daubigny) (১৮১৭—১৮৭৮)
কোর্বে, গুস্তাভ (Gustave Courbet) (১৮১৯—১৮৭৭)
পিসারো, কামীল (Camille Pissarro) (১৮৩১—১৯০৩)
মানে, এদুয়ার (Edouard Manet) (১৮৩২—১৮৮৩)
দেগা, এদ্‌গার (Edgar Degas) (১৮৩৪—১৯১৭)
সিস্‌লি, অ্যাল্‌ফ্রেড (Alfred Sisley) (১৮৩৯—১৮৯৯)
সেজান্, পল্ (Paul Cezanne) (১৮৩৯—১৯০৬)
মনে, ক্লোদ (Claud Monet) (১৮৪০—১৯২৬)
রুস্‌সো, অঁরি (Henri Rousseau) (১৮৪৪—১৯১০)
রেনোয়ার, অগস্ত (Auguste Renoir) (১৮৪১—১৯১৯)
গোগ্যাঁ, য়োজেন অঁরি পল (Engene Henri Paul Gauguin) (১৮৪৮—১৯০৩)
মাইয়ল, অরিস্তিদ (Aristide Maillol) (১৮৬১—১৯৪৪)
তুলোজ-লত্রেক, অঁরি দি (Henri de Toulouse-Lautrec) (১৮৬৪—১৯০১)
বোনার, পিয়ের (Pierre Bonnard) (১৮৬৭—১৯৪৭)
মাতিস্, অঁরি (Henri Matisse) (১৮৬৯—১৯৫৪)
রুয়াল্ট, জর্জ (Georges Roualt) (১৮৭১—)
ভ্‌লামিঙ্ক, মরিস দি (Maurice de Vlaminck) (১৮৭৬—)
দুফি, রাওল (Raoul Dufy) (১৮৭৭—)
দেরায়ঁা, আঁদ্রে (André Derain) (১৮৮০—১৯৫৪)
ব্রাক্, জর্জ (Georges Braque) (১৮৮১—)
স্প্যানিশ- পিকাসো, পাব্‌লো (Pablo Picasso) (১৮৮১—)
বৃটিশ— জন্, অগাস্টাস (Augustus John) (১৮৭৮—১৯৫৩)
স্পেন্সর, স্ট্যান্‌লি (Stanley Spencer) (১৮৯২—)
মুর, হেন্‌রি স্পেন্সর (Henry Spencer Moore) (১৮৯৮—)

জার্মান— মার্ক, ফ্রাঞ্জ (Franz Marc) (১৮৮০—১৯১৬)
রাশিয়ান— শাগাল্, মার্ক (Marc Chagall) (১৮৮৭—)
কান্দিনস্কি, ভাসিলি (Wassily Kandinsky)
(১৮৬৬—১৯৪৪)
সুইস্— ক্লে, পল (Paul Klee) (১৮৭৯—১৯৪০)
ইতালিয়ান—মদিলিয়ানি, আমেদেো (Amedeo Modigliani)
(১৮৮৪—১৯২০)
ডাচ্— মণ্ড্রিয়ান, পীট (Pict Mondrian) (১৮৭২—১৯৪৪)

চিত্রসূচী

গুহাচিত্র : বাইসন ৬৫
গুহাচিত্র : বল্গাহরিণ
গুহাচিত্র : শিকার
জত্তো : সেণ্ট ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে শোক ৬৬
ফ্রা আঞ্জেলিকো : সেণ্ট নিকোলাসের ঐশী মহিমা
বতিচেল্লি : দা ম্যাগ্‌নিফিকাট বা মাদোনা অভ দা করোনেশন ৬৭
বতিচেল্লি : প্রিমাভেরা (অংশ) ৬৮
পেরুজীনো : খৃষ্টের চার জন শিষ্য দাঁড়িয়ে আছেন ৬৯
র‍্যাফেইল : বেদানা হাতে মাদোনা ৭০
র‍্যাফেইল : দা ট্রান্‌স্‌ফিগরেশন ৭১
মিকেলাঞ্জেলো : নরকস্থ আত্মার মাথা ৭২
মিকেলাঞ্জেলো : সিস্তিন চ্যাপেলের অংশ (জেরিমায়া) ৭৩
মিকেলাঞ্জেলো : পূত পরিবার ৭৪
মিকেলাঞ্জেলো : অ্যাডামের সৃষ্টি (সিস্তিন চ্যাপেল) ৭৫
লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি : খৃষ্টের মাথা ৭৬
লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি : মোনা লিসা
লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি : ভর্জিন অভ দা রক্‌স্‌ ৭৭
লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি : একটি যুবতীর মাথা ৭৮
লেঅনার্দো দা ভিঞ্চি : মেরি, যীশু, সেণ্ট এলিজাবেথ ও সেণ্ট জন ৭৯
জর্জনে : খৃষ্ট ক্রস বইছেন (ছবির অংশ) ৮০
তিশান : দস্তানা হাতে লোক
তিশান : অশ্বপৃষ্ঠে সম্রাট পঞ্চম চার্লস ৮১
তিন্তোরেত্তো : তীরন্দাজ ৮২
তিন্তোরেত্তো : সেণ্ট মার্কের দেহ আবিষ্কার ৮৩
আন্দ্রেয়া দেল সার্তো : মাদোনা অভ দা হার্পিজ ৮৪
করেজ্‌জো : পবিত্র রজনী ৮৫
ইয়ান ভ্যান আইক : জভান্নি আর্মল্‌ফিনি আর তাঁর স্ত্রী
পীটর ব্রখেল : গাঁয়ের বিয়েতে ভোজ ৮৬
রুবেন্স : শিশু খৃষ্টের মাথা ৮৭
রুবেন্স : সুজান ফুর্‌মে ৮৮
রুবেন্স : রুবেন্স আর তাঁর স্ত্রী ৮৯
ভ্যান ডাইক : ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্ল্‌স্‌
ফ্রান্‌জ হাল্‌স্‌ : মাল্‌বাব্‌, বা হার্লেমের ডাইনী ৯০
রেম্‌ব্রাণ্ট : সিংহ ৯১
রেম্‌ব্রাণ্ট : জুইশ নবপরিণীতা

রেম্‌ব্রাণ্ট : দা স্টালমীস্টাস ৯২
রেম্‌ব্রাণ্ট : রাতের পাহারা
ডিউরর : শিশু খৃষ্টকে সেণ্ট ৯৩
ক্রীস্টোফর নিয়ে যাচ্ছেন (এচিং)
ডিউরর : দুটি কাঠবেড়ালী
ডিউরর : নিজের ছবি ৯৪
হান্‌স্‌ হোলবাইন : জর্জ গীজ ৯৫
ভেরমেয়ার : ভর্জিনালের পাশে ৯৬
দাঁড়ানো মহিলা
এল্‌গ্রেকো : লাওকুন ৯৭
ভেলাস্কেথ : একটি বামন ৯৮
ভেলাস্কেথ : মেড্‌স্‌ অভ অনার
মুরীল্লো : তরমুজ খাওয়া ৯৯
গোইয়া : মাদ্রিদে ১৮০৮ সালের ১০০
৩রা মে বিদ্রোহীদের
মৃত্যুদণ্ড বহাল
গোইয়া : বরফের ঝড়
ক্লোদ লরেন : প্রাকৃতিক দৃশ্য, ১০১
সমুখে গাছ
ওয়াতো : একটি নিগ্রো মাথার ১০২
তিনটি ছবি
ওয়াতো : একজন নট
শারদাঁ : খাবার আগে প্রার্থনা ১০৩
দাভিদ : মাদাম রেকামিয়ে ১০৪
দেলাক্রোয়া : স্কিয়সের হত্যাকাণ্ড ১০৫
হোগার্থ : গ্রেহাম পরিবারের ১০৬
ছেলেমেয়ে
গেন্‌স্‌বরা : ব্লু বয় ১০৭
টার্নার : দা ফাইটিং টেমেরেয়ার ১০৮
কন্‌স্টেব্‌ল্‌ : ফ্ল্যাটফোর্ড মিল ১০৯
কোরো : ঝিল
মীলে : মাদাম সাঁসিয়ে ১১০
মীলে : খেতকুড়োনী
রুমিয়ে : সুরুয়া খাওয়া ১১১
রুমিয়ে : তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী
ক্লোদ মনে : রুয়েঁ। ক্যাথিড্রাল ১১২
মানে : একটি মহিলা আর টিয়াপাখি
দেগা : রঙ্গমঞ্চে বালে নর্তকী ১১৩
দেগা : মাদাম হের্তেল
রেনোয়ার : মুলঁ্যা দ্য লা গালেত ১১৪
পল সেজান : তাস খেলা ১১৫
পল সেজান : স্টিল-লাইফ ১১৬
ভান গখ : প্রতিকৃতি
গোগ্যাঁ : তাহিতির মেয়ে ১১৭
আঁরি মাতিস্‌ : ছবি ১১৮
পাব্‌লো পিকাসো : মাদোনা ১১৯
পাব্‌লো পিকাসো : আয়নার ১২০
সমুখে ছোট মেয়ে